

ঐতিহাসিক সিরিজ উপন্যাস

সুলতান মাহমুদ গজনবীর

ভাৰত অভিযান



## ভারত অভিযান-৩

# ভারত অভিযান

(তৃতীয় খণ্ড)

## এনায়েতুল্লাহ

অনুবাদ

### শহীদুল ইসলাম

গবেষক, সম্পাদক, একাড়ামি



আকিক পাবলিকেশন্স ! এন্দারায়ে কুরআন

১১/১ ইসলামী টাওয়ার, বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

ফোন : ৭১৭০৬১৪, ০১৭২৪ ৬০৪১৩৬

**প্রথম প্রকাশ : সেপ্টেম্বর ২০০৭ ঈ., পঞ্চম প্রকাশ : জানুয়ারি ২০১৩ ঈ.**

**ভারত অভিযান-৩**

**প্রকাশক : মোহাম্মদ জসিম উদ্দিন**

**স্বত্ত্ব : প্রকাশক**

**কম্পোজ : এম. ইক কম্পিউটার্স**

**মুদ্রণ : সুবর্ণ প্রিন্টার্স, ৩/ক-খ পাটুয়াটুলী লেন, ঢাকা ১১০০**

**প্রচ্ছদ : নাজমুল হায়দার**

**মূল্য : ১৮০ টাকা মাত্র**

**ISBN : 984-70109-0000-3**

## উৎসর্গ

এক ঝাঁক আলোকিত মানুষ যারা হলেন হ্যরত সাহাবায়ে  
কেবাম রাখিআপ্তাহ্ত তাআলা আনহ। হাদীস শরীকে যাদেরকে  
হেদায়াতের উত্তম নমূনা আখ্যায়িত করা হয়েছে।

কবির ভাষায়—

‘ইসলাম সে তো পরশ মানিক তাকেই মোরা বুঝি,  
পরশে তাহার শোনা হ'ল যারা তাদেরই মোরা বুঝি।’

## ଆମାଦେର ଆରଯ

‘ମାହମୂଦ ଗଜନବୀର ଭାରତ ଅଭିଯାନ’ ସିରିଜେର ଏଟି ତୃତୀୟ ଖଣ୍ଡ । ଉପମହାଦେଶେର ଇତିହାସେ ସୁଲତାନ ମାହମୂଦ ଗଜନବୀ ସତେର ବାର ଭାରତ ଅଭିଯାନ ପରିଚାଳନାକାରୀ ମହାନାୟକ ହିସେବେ ଥାଏ । ସୁଲତାନ ମାହମୂଦକେ ଆରୋ ସ୍ୱାତି ଦିଯେଛେ ପୌତ୍ରିକ ଭାରତେର ଅନ୍ୟତମ ଦୁ’ ଐତିହାସିକ ମନ୍ଦିର ସୋମନାଥ ଓ ଥାନେଷ୍ଠରୀତେ ଆକ୍ରମଣକାରୀ ହିସେବେ । ଏସବ ମନ୍ଦିରର ମୂର୍ତ୍ତିଗୁଲୋକେ ଭେଙେ ଧୂଲିସାଂ କରେ ଦିଯେଛିଲେନ ମାହମୂଦ । କିନ୍ତୁ ଉପମହାଦେଶେର ପାଠ୍ୟପୁତ୍ରକେ ଏବଂ ଇତିହାସେ ମାହମୂଦେର କୀର୍ତ୍ତିର ଚେଯେ ଦୁଃଖତିର ଚିତ୍ରାଇ ବେଶୀ ଲିଖିତ ହେଁବେ । ହିନ୍ଦୁ ଓ ଇଂରେଜଦେର ରଚିତ ଏସବ ଇତିହାସେ ଏଇ ମହାନାୟକେର ଚରିତ ଯେଭାବେ ଚିତ୍ରିତ ହେଁବେ ତାତେ ତାଁର ସୁର୍ଯ୍ୟାତି ଚାପା ପଡ଼େ ଗେଛେ । ମୁସଲିମ ବିଦେଶେ ଭାବାଦର୍ଶେ ରଚିତ ଇତିହାସ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀତେ ସେଇସବ ଅପିତ୍ତିହାସେର ଭିନ୍ନିତେ ପ୍ରଣିତ ମୁସଲିମ ଲେଖକରାଓ ମାହମୂଦେର ଜୀବନକର୍ମ ଯେଭାବେ ଉପ୍ଲବ୍ଦି କରେଛେ ତା ଥେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓ ଭବିଷ୍ୟ ପ୍ରଜନ୍ମେର ବୋବାର ଉପାୟ ନେଇ, ତିନି ଯେ ପ୍ରକୃତାଇ ଏକଜନ ନିବେଦିତପ୍ରାଣ ଇସଲାମେର ସୈନିକ ଛିଲେନ, ଇସଲାମେର ବିଧି-ବିଧାନ ତିନି ଅକ୍ଷରେ ଅକ୍ଷରେ ମେନେ ଚଲାତେନ । ଜାତିଶକ୍ରଦେର ପ୍ରତିହତ କରେ ଝାଟି ଇସଲାମୀ ଶାସନବ୍ୟବରସ୍ତ୍ରା ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ଓ ଦୃଢ଼କରଣେର ଜନ୍ୟେଇ ନିବେଦିତ ଛିଲ ତାର ସକଳ ପ୍ରଯାସ । ଅପଲେଖକଦେର ରଚିତ ଇତିହାସ ପଡ଼ିଲେ ମନେ ହେଁ, ସୁଲତାନ ମାହମୂଦ ଛିଲେନ ଲୁଟୋରା, ଆଗ୍ରାସୀ ଓ ହିନ୍ଦ୍ର । ବାରବାର ତିନି ଭାରତେର ମନ୍ଦିରଗୁଲୋକେ ଆକ୍ରମଣ କରେ ସୋନା-ଦାନା, ମଣି-ମୁଖୀ ଲୁଟ କରେ ଗଜନୀ ନିଯେ ଯେତେନ । ଭାରତେର ମାନୁଷେର ଉନ୍ନତି କିଂବା ଭାରତକେନ୍ଦ୍ରିକ ମୁସଲିମ ସାଲତାନାତ ପ୍ରତିଷ୍ଠାର ଇଚ୍ଛା ତାର କଥନେ ଛିଲ ନା । ଯଦି ତୃତୀୟ ଭାରତେର ନିର୍ଯ୍ୟାତିତ ମୁସଲମାନଦେର ସାହାଯ୍ୟ କରା ଏବଂ ପୌତ୍ରିକତା ଦୂର କରେ ଇସଲାମେର ଆଲୋ ଛଡ଼ିଯେ ଦେଯାର ଏକାନ୍ତାଇ ଇଚ୍ଛା ତାଁର ଥାକତୋ, ତବେ ତିନି କେନ ଯୋଗଲଦେର ମତୋ ଭାରତେ ବସନ୍ତ ଗେଡ଼େ ଇସଲାମୀ ଶାସନବ୍ୟବରସ୍ତ୍ରା ଗଡ଼େ ତୁଳଲେନ ନା? ଇତ୍ୟାକାର ବହୁ କଲକ ଏଂଟେ ତାର ଚରିତକେ କଲୁଷିତ କରା ହେଁବେ ।

ମାହମୂଦ କେନ ବାର ବାର ଭାରତେ ଅଭିଯାନ ଚାଲାତେନ? ମନ୍ଦିରଗୁଲୋ କେନ ତାର ଟାର୍ଫେଟ ଛିଲ? ସଫଳ ବିଜୟର ପରାପର କେନ ତାକେ ବାର ବାର ଫିରେ ଯେତେ ହତୋ ଗଜନୀ? ଇତ୍ୟାଦି ବହୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଜୀବାବ; ଇସଲାମେର ଜନ୍ୟ ନିବେଦିତପ୍ରାଣ ସୈନିକ ସୁଲତାନ ମାହମୂଦକେ ତୁଲେ ଧରାର ଜନ୍ୟେ ଆୟାର ଏହି ପ୍ରଯାସ । ନିର୍ଭର୍ଯୋଗ୍ୟ ଦଲିଲାଦି ଓ ବିଶ୍ଵକ ଇତିହାସ ସେଠି ଆୟି ଏହି ବିଷୟେ ମାହମୂଦେର ପ୍ରକୃତ ଜୀବନଚିତ୍ର ତୁଲେ ଧରାର ଚେଷ୍ଟା କରେଛି । ପ୍ରକୃତପକ୍ଷେ ସାଲାହ ଉଦ୍ଦିନ ଆଇମୁବୀର ମତୋଇ ମାହମୂଦକେବେ ସ୍ଵଜାତିର ଗାନ୍ଧାରି ଏବଂ ବିଧରୀ ପୌତ୍ରିକଦେର ବିରକ୍ତେ ଏକଇ ସାଥେ ଲଡ଼ାଇ କରତେ ହେଁବେ । ଯତୋ ବାର ତିନି ଭାରତ ଅଭିଯାନ ଚାଲିଯାଇଲେ, ଅଭିଯାନ ଶେଷ ହତେ ନା ହତେଇ ବସର ଆସତୋ, ସୁଯୋଗସନ୍ଧାନୀ ସାତ୍ରାଜ୍ୟଲୋଭୀ ପ୍ରତିବେଶୀ ମୁସଲିମ ଶାସକରା ଗଜନୀ ଆକ୍ରମଣ କରେଛେ । କେନ୍ଦ୍ରେର ଅନ୍ତିତ୍ର ରକ୍ଷାର୍ଥେ ବାଧ୍ୟ ହେଁଇ ମାହମୂଦକେ ଗଜନୀ ଫିରେ ଯେତେ ହତୋ । ଏକପେଶେ ଇତିହାସେ ଲେଖା ହେଁବେ, ସୁଲତାନ ମାହମୂଦ ସତେର ବାର ଭାରତ

অভিযান চালিয়েছিলেন, কিন্তু এ কথা বলা হয়নি, হিন্দু রাজা-মহারাজারা মাহমুদকে উৎখাত করার জন্যে কত শত বার গজনীর দিকে আগ্রাসন চালিয়েছিলেন।

সুলতান মাহমুদের বারবার ভারত অভিযান ছিল মূলত শক্রদের দখিয়ে রাখার এক কৌশল। তিনি যদি এদের দখিয়ে রাখতে ব্যর্থ হতেন, তবে হিন্দুস্তানের পৌরণিকতাবাদ সাগর পাড়ি দিয়ে আরব পর্যন্ত বিস্তৃত হতো।

মাহমুদের পিতা সুবঙ্গীন তাকে অসীমত করে নিয়েছিলেন, ‘বেটা! ভারতের রাজাদের কখনও স্বত্ত্বতে থাকতে দিবে না। এরা গজনী সালতানাতকে উৎখাত করে পৌরণিকতার সয়লাবে কাবাকেও তাসাতে চায়। মুহাম্মদ বিন কাসিমের সময়ের মতো ভারতীয় মুসলমানদেরকে হিন্দুরা জ্ঞার জবরদস্তি হিন্দু বানাছে। এদের ইমান রক্ষার্থে তোমাকে পৌরণিকতার দুর্গ উড়িয়ে দিতে হবে। ভারতের অগণিত নির্বাতিত বনি আদমকে আধাদ করতে হবে, তাদের কাছে ইসলামের দাওয়াত পৌছাতে হবে।’

আলবিরুল্লী, ফারিশ্তা, গারদিজী, উত্তী, বাইহাকীর মতো বিখ্যাত ও নির্ভরযোগ্য ইতিহাসবিদগণ লিখেছেন, সুলতান মাহমুদ তৎকালীন সবচেয়ে বড় বুরুণ ও ওলী শাইখ আবুল হাসান কিরখানীর মুরীদ ছিলেন। তিনি বিজিত এলাকায় তার হেদায়েত মতো পুরোপুরি ইসলামী শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

তিনি নিজে কিরখানীর দরবারে যেতেন। কখনও তিনি তাঁর পীরকে তাঁর দরবারে ডেকে পাঠাননি। উপরন্তু তিনি ছান্নবেশে পীর সাহেবের দরবারে নিয়ে ইসলাহ ও পরামর্শ গ্রহণ করতেন। তিনি আত্মপরিচয় গোপন করে কখনও নিজেকে সুলতানের দৃত হিসেবে পরিচয় দিতেন। একবার তো আবুল হাসান কিরখানী মজলিসে বলেই ফেললেন, ‘আমার এ কথা ভাবতে ভালো লাগে যে, গজনীর সুলতানের দৃত সুলতান নিজেই হয়ে থাকেন। এটা প্রকৃত মুসলমানেরই আলামত।’

মাহমুদ কুরআন, হাদীস ও দীনি ইলম প্রচারে খুবই যত্নবান ছিলেন। তাঁর দরবারে আলেমদের যথাযথ মর্যাদা ছিল। সবসময় তার বাহিনীতে শক্রপক্ষের চেয়ে সৈন্যবল কম হতো, কিন্তু তিনি সব সময়ই বিজয়ী হতেন। বহুবার এমন হয়েছে যে, তাঁর পরাজয় প্রায় নিচিত। তখন তিনি ঘোড়া থেকে নেমে ময়দানে দুর্বাকাত নামায আদায় করে মোনাজাত করতেন এবং চিৎকার করে বলতেন, ‘আমি বিজয়ের আশ্বাস পেয়েছি, বিজয় আমাদেরই হবে।’ বাস্তবেও তাই হয়েছে।

অনেকেই সালাহ উদ্দীন আইয়ুবী আর সুলতান মাহমুদকে একই চরিত্র ও বৈশিষ্ট্যের বীরসেনানী মনে করেন। অবশ্য তাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য একই ছিল। তাদের মাঝে শুধু ক্ষেত্র ও প্রতিপক্ষের পার্থক্য ছিল। আইয়ুবীর প্রতিপক্ষ ছিল ইহুদী ও খ্রিস্টশক্তি আর মাহমুদের প্রধান প্রতিপক্ষ ছিল হিন্দু পৌরণিক রাজন্যবর্গ। ইহুদী ও খ্রিস্টানরা সালাহ উদ্দীন আইয়ুবীর সেনাদের ঘায়েল করতো প্রশিক্ষিত

সুন্দরী রঘুণী ব্যবহার করে নারী গোয়েন্দা দিয়ে, আর এর বিপরীতে সুলতান মাহমুদের বিরুক্তে এরা ব্যবহার করতো শয়তানী যাদু। তবে ইহুদী-প্রিস্টানদের চেয়ে হিন্দুদের গোয়েন্দা তৎপরতা ছিল দুর্বল, কিন্তু সুলতানের গোয়েন্দারা ছিল তৎপর ও চৌকস।

তবে এ কথা বলতেই হবে, সালাহ উদ্দীন আইয়ুবীর গোয়েন্দারা যেমন দৃঢ়চিত্ত ও শক্ষ অর্জনে অবিচল ছিল, মাহমুদের গোয়েন্দারা ছিল নেতৃত্ব দিক দিয়ে ততটাই দুর্বল। এদের অনেকেই হিন্দু নারী ও যাদুর ফাঁদে আটকে যেতো। অথবা হিন্দুস্তানের মুসলিম নামের কুলাসাররা এদের ধরিয়ে দিতো। তারপরও সালাহ উদ্দীন আইয়ুবীর চেয়ে সুলতান মাহমুদের গোয়েন্দা কার্যক্রম ছিল বেশি ফলদায়ক।

ইতিহাসকে পাঠকের কাছে সুখপাঠ্য, বিশেষ করে তরুণদের কাছে হৃদয়ঝাহী করে পরিবেশনের জন্যে গঞ্জের যতো করে রচনা করা হয়েছে এই গ্রন্থ। বাস্তবে এর সবটুকুই সত্যিকার ইতিহাসের নির্যাস। আশা করি আমাদের নতুন প্রজন্ম ও তরুণরা এই সিরিজ পড়ে শক্ত-মিত্রের পার্থক্য, এদের আচরণ ও স্বত্বাব জেনে এবং আন্তরিকভাবে বলীয়ান হয়ে পূর্বসূরিদের পথে চলার দিশা পাবে।

এনায়েতুল্লাহ  
লাহোর

## প্রসঙ্গ কথা

আলহামদুলিল্লাহ! বর্তমানে এদেশে উর্দুভাষী উপন্যাসিক এনায়েতুল্লাহ'র পরিচয় দেয়া নিশ্চিয়োজন, তদুপ বিশিষ্ট লেখক গবেষক ও অনুবাদক শহীদুল ইসলাম-এরও বিশেষ পরিচয় দেয়ার প্রয়োজন নেই।

ইসলামী উপন্যাসের রূচিবান পাঠকমাত্রাই তাঁর অনুবাদ ও লেখার সাথে পরিচিত। কালজয়ী উপন্যাসিক এনায়েতুল্লাহ-এর অন্যতম কীর্তি সুলতান মাহমুদ গজনবীর ভারত অভিযান সিরিজ এবং এটি তৃতীয় খণ্ড। পাঠকের হাতে তুলে দিতে পেরে নিজেকে ধন্য মনে করছি।

সুলতান মাহমুদ গজনবীর 'ভারত অভিযান' সিরিজের প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম খণ্ডটি 'আকিক পাবলিকেশন' থেকে নতুন প্রচ্ছন্দ ও রিভাইজড এডিশনে পাঠকের হাতে তুলে দিতে পেরে মহান আল্লাহর দরবারে তুকরিয়া আদায় করছি। মেট পাঁচটি খণ্ডে বিস্তৃত এ সিরিজটি পূর্ব থেকেই 'এদারায়ে কুরআন' কর্তৃক সুনামের সাথে পাঠকমহলে সমাদৃত হয়ে আসছে। আমরা নতুনভাবে সিরিজটির পরিমার্জিত সংস্করণ পাঠকমঙ্গলীকে সরবরাহ করতে পেরেছি- এজন পাঠকমহলকে জানাচ্ছি আজ্ঞারিক অভিনন্দন।

আল্লাহর অশেষ মেহেরবানীতে প্রথম থেকে পঞ্চম পর্যন্ত সিরিজটির সবগুলো খণ্ড বাজারে সহজে প্রাপ্তি ও নিয়মিত সরবরাহের জন্য 'আকিক পাবলিকেশন' দৃঢ় প্রতিষ্ঠা।

নানাবিধ সীমাবদ্ধতার পরও আমরা এ খণ্ডটি যথাযথ ও সুন্দর করার চেষ্ট করেছি। তবুও মুদ্রণ প্রমাদ থাকা স্বাভাবিক। বিজ্ঞমহলের কাছে যে কোনো খণ্ড সম্পর্কে আমাদেরকে অবহিত করার বিনীত অনুরোধ রইল।

তৃতীয় খণ্ডটি পাঠক-পাঠিকা মহলে আদৃত হলে মহান আল্লাহর কাছে আমরা এর উন্নত বদলা প্রাপ্তি হব বলে আশা করতে পারি। -প্রকাশক



## বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

প্রতিবেশী মুসলিম শাসকদের মধ্যে এলিখ খান ছিলো সুলতানের জয়ন্তম শক্তি। সুলতানের অনুপস্থিতির সুযোগে একবার সে গজনী দখলের উদ্দেশে সৈন্য-সামন্ত নিয়ে আগ্রাসন চালিয়েছিলো। কিন্তু তাকে গজনী বাহিনীর কাছে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়ে জীবন নিয়ে পালাতে হয়েছিলো। হিন্দুস্তান থেকে সংবাদ পেয়ে বিদ্যুদাতিতে গজনী ফিরে এসে সুলতান নিজে এলিখ খানকে প্রতিরোধ করেছিলেন। এলিখ খান সুলতানের শাসনাধীন খোরাসান অঞ্চল দখল করে নিতে তৎপর ছিলো।

“মাননীয় সুলতান! এলিখ খান একটি বিষধর সাপ। ও যতোদিন বেঁচে থাকবে, ততোদিন সুযোগ পেলেই আমাদের দংশন করতে থাকবে।” বলছিলেন সুলতান মাহমুদের কাছে আগত দুই গোয়েন্দা কর্মকর্তার একজন। এদের একজন সুলতানের নির্দেশে এলিখ খানের সেনাবাহিনীর মধ্যেই কাজ করতো। তারা জানালো, এবার আপনার অনুপস্থিতিতে এলিখ খান তার ভাই তোগা খান ও কাদের খানকে প্ররোচিত করছিলো তারা যেনে আপনার বিরুদ্ধে সামরিক সংঘাতে তাকে সহযোগিতা করে। তারা তিনজন যিলে ঐক্যবন্ধভাবে সকল সেনাবাহিনী নিয়ে গজনী আক্রমণ করে দখল করে নিতে চাচ্ছিলো। কিন্তু তোগা ও কাদের খান আপনার ভয়ে এলিখ খানের সহযোগী হতে অসীকৃতি জানায়। এতে ক্ষিণ্ঠ হয়ে এলিখ খান তার ভাই তোগা খানের বাদশাহী দখল করার জন্য সেনা অভিযান চালায়। কিন্তু উজগন্দ নামক হ্রানে পৌছার পর তাদের উপর প্রচণ্ড তুষারপাত ও ঝড়োবৃষ্টি শুরু হয়। ফলে এলিখ খানের সৈন্যদের জীবন ঝুকিপূর্ণ হয়ে পড়ে। বিপুলসংখ্যক সওয়ারী ও সৈন্য প্রচণ্ড তুষারপাতের কবলে পড়ে মারা যায়। প্রাকৃতিক প্রতিরোধের মুখে বড় ধরনের ক্ষতি সাধিত হয়। বাধ্য হয়েই এলিখ খান সেনাভিযান পরিহার করে আপন রাজধানীতে ফিরে আসে।

“তোগা খান কী করতে চায়?” জানতে চাইলেন সুলতান।

“তিনি আপনার সহযোগী। আমাদের যে সহকর্মী তোগা খানের সেনাবাহিনীতে কর্মরত, সে খবর দিয়েছে, এলিখ খানের অভিযান প্রাকৃতিক দুর্ঘটণা ব্যর্থ হওয়ার পর তাকে ছেঁশিয়ার করে পয়গাম পাঠায়, যদি পুনর্বার সে তার রাজ্যের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান চালায়, তাহলে তিনি সুলতানের সাথে মৈত্রী গড়ে তুলবেন।”

“তোগা খানকে কি বিশ্বাস করা যায়?”

“মাননীয় সুলতান! কারো মনের কথা তো আর বলা যায় না। কিন্তু বাহ্যিক দৃষ্টিতে যা বোঝা যায়, তাতে তোগা খান আপনার সাথে মৈত্রী স্থাপনে আগ্রহী।”

“এর অর্থ হলো, এলিখ খানের মতো একজন হিংসুটে ক্ষমতালিঙ্গু আঘাসীর দৃষ্টি থেকে নিজের রাজ্য ও শাসনের নিরাপত্তার জন্য তোগা খান আমাদের সাথে মৈত্রী গড়তে আগ্রহী।” ব্যাখ্যা করলেন সুলতান। “ঠিক আছে, আমি তার সাথে মৈত্রী স্থাপনে অঙ্গীকৃতি জানাবো না। তবে তোগা খানের সাথে আমার একবার সাক্ষাৎ হওয়া দরকার। এসব ক্ষমতালোভী মুসলিম শাসক আমাদের জন্য পায়ের বেড়িতে পরিণত হয়েছে।... তোমরা তোগা খানকে খুবই গোপনে একথা জানিয়ে দাও যে, আমি শীঘ্ৰই তার সাথে সাক্ষাৎ করতে চাছি। সাক্ষাতের জন্য তাকে আমার কাছে আসতে হবে না, আমিও তার কাছে যাবো না। গজনীর বাইরে যতো দূরেই হোক সেখানে চলে আসলে আমি নিজে গিয়ে সেখানে তার সাথে সাক্ষাৎ করবো।”

এসব কারণে বিজয়ের উল্লাসে শরীক হতে পারেননি সুলতান। অভ্যন্তরীণ হিংসা আর ব্রজাতির ক্ষমতালিঙ্গু শাসকদের প্রতিহিংসায় গৃহযুদ্ধের খড়গ সবসময় সুলতানের মাথার উপর ঝুলত ছিলো। তিনি এ পর্যায়ে এসে অনুভব করলেন, ঘরের ভেতরের এই বিষধর সাপগুলোর মাথা পিষে ফেলা এখন অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। অত্যন্ত সংগোপনে সুলতানের গোয়েন্দারা তোগা খানের কাছে তাঁর পয়গাম নিয়ে গেলে সাক্ষাতের ব্যাপারে তিনি কোন আপত্তি করেননি। তিনি গজনী থেকে নিরাপদ দূরত্বে একটি জায়গার কথা বলে দিলেন। চারদিন পর সেই জায়গায় দুই শাসকের সাক্ষাতের সময় নির্ধারিত হলো।

সময়মতো ঠিক জায়গায় তোগা খান পৌছে গেলো। জায়গাটি ছিলো প্রাকৃতিক নিসর্গে ভরপুর মনোরম। একটি খরস্ত্রোতা নদীর পাশে ঘন গাছগাছালী আর বনফুলের সমাহারে সবুজ-শ্যামল জায়গায় তোগা খান ও সুলতানের সাক্ষাৎ হলো। সুলতান তোগা খানকে বুকে জড়িয়ে নিলেন।

“এ কথা কি সত্য যে, আপনি আমার সাথে মৈত্রী স্থাপন করতে চানঃ আমি আপনার কাছে পয়গাম দিয়ে দৃত পাঠানোর কথা ভাবছিলাম, ঠিক সেই সময় আপনার পয়গাম পেয়ে আপনার ডাকে সাড়া দিলাম। আমি আপনার সাথে মৈত্রী চুক্তি করতে আগ্রহী।” বললেন তোগা খান।

“আপনার এই মৈত্রী স্থাপনের উদ্দেশ্য কি আপনার রাজত্বের নিরাপত্তার জন্য, নাকি মুসলমানরা পরম্পর মিলেমিশে থাকা আল্লাহর নির্দেশ— এ জন্যঃ আপনি যদি রাজত্বের নিরাপত্তার জন্য মৈত্রী স্থাপনে আগ্রহী হয়ে থাকেন, তাহলে সেই মৈত্রীতে আমার কোন আগ্রহ নেই। আমি শুধু বাগদাদ খেলাফতের অধীনে মৈত্রী স্থাপন করতে পারি। আমি চাই স্বাধীন মুসলিম রাজ্যগুলোর অস্তিত্ব ধারুক, সবাই খেলাফতে বাগদাদকেই মুসলমানদের কেন্দ্র বলে স্বীকার করে নিক। ইসলামকে বিজয়ী শক্তি হিসেবে অঙ্কুণ্ড রাখতে হলো সকল মুসলিম শাসকের খেলাফতের অধীনে এক্যবন্ধ হওয়ার বিকল্প নেই।” সুলতান বললেন।

সুলতান মাহমুদের কথা শুনে তোগা খানের ঠোঁটের কোণে একটা বিরক্তিকর হাসির ভাব ফুটে উঠলো। তিনি বললেন, “সুলতান মাহমুদকে আমি শুবই দূরদর্শী ও জ্ঞানী মনে করতাম। কিন্তু বুঝতে পারছি, আপনার মধ্যে রণকৌশল ও যুদ্ধজয়ের যেমন পারদর্শিতা আছে।... বোবা যাচ্ছে, আপনার মধ্যে ধর্মীয় ভাবাবেগ প্রবল। বলা চলে আপনি ধর্মের ব্যাপারে অতি মাত্রায় আবেগপ্রবণ।”

“আপনি কী বোবাতে চাচ্ছেন পরিষ্কার করে বলুন।” সুলতান বললেন।

“আপনি যে খলীফাকে ইসলামের সেবক ও কেন্দ্রীয় মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করে রেখেছেন, তিনি এতোটাই ক্ষমতা ও সাম্রাজ্যালঙ্কু, যেমনটা ক্ষমতালঙ্কু আমার ভাই ও আপনার প্রতিবেশী মুসলিম শাসকবৃন্দ। এরা আপনার কাছ থেকে গজনী ও খোরাসান ছিনিয়ে নেয়ার জন্য সবসময়ই চক্রান্তে লিঙ্গ রয়েছে।” তোগা খান বললেন।

“আপনি কি বাগদাদের খলীফা কাদের বিল্লাহ আববাসীর কথা বলছেন?”  
জিজ্ঞেস করলেন সুলতান।

“আমি জানি, আমার কথা আপনার কাছে বিশ্বাসযোগ্য মনে হবে না।”  
বললেন তোগা ধান। “বেশ কিছুদিন আগেই এ ব্যাপারে আমি আপনাকে  
অবহিত করতে চাইলাম। কিন্তু আমার ভাই এলিখ খানের কারণে আমি  
বিড়ম্বনা বাঢ়াতে চাইনি। সেই সাথে আমার মধ্যে এই আশংকাও বিরাজ  
করছিলো যে, আপনার কাছে আমার কথা বিশ্বাসযোগ্য মনে হবে না। আপনি  
আমার ব্যাপারে বেশি সন্দেহপ্রায়ণ হয়ে যেতে পারেন। আমিও আপনার  
মতোই কেন্দ্রীয় খেলাফতের প্রত্যাশী। কিন্তু সেই খলিফাকে আমি কেন্দ্রীয়  
নেতৃত্বের আসনে অধিষ্ঠিত ভাবতে রাখি নই, যে একটি এলাকার শাসক  
হওয়ার পরও নিজের রাজ্যবিস্তারে চক্রান্তের আশ্রয় নেয়।”

“তোগা ধান! ক্ষমতাসীন খলিফার বিরুদ্ধে অপপ্রচারের আগে ভেবে নাও—  
যদি এ অভিযোগ মিথ্যা প্রমাণিত হয়, তাহলে আমি সেনা অভিযান পরিচালনা  
করে তোমার রাজ্যত্বের সাথে মিটিয়ে দেবো।” রাগে-ক্ষেত্রে ফুসে উঠলেন  
সুলতান।

হাসলেন তোগা ধান। সেই হাসিতে কিছুটা রহস্যময়তা এনে বললেন,  
“মানুষের মধ্যে যখন শক্তির অহংকার দেখা দেয়, তখন নিজের ভুলগুলোকেও  
দূরদর্শিতা মনে করে এবং নিজের উপলক্ষের ব্যতিক্রম কোন কথা শনতে পছন্দ  
করে না। সুলতান নিজেকে সামরিক শক্তির গর্ব থেকে মুক্ত করুন। আমি  
খলিফার বিরুদ্ধাচরণ করে আপনার কাছ থেকে কী সার্থ অর্জন করতে পারবো?  
বাস্তবতা অনুধাবন করতে চেষ্টা করুন। দেখুন, আপনার বিরুদ্ধে এ অস্তিত্বের  
এমন কোন শাসক নেই, যে চক্রান্তে শরীক হয়নি। শুধু আমি আর কাদের ধান  
ছাড়া আর সবাই আপনার বিরুদ্ধে সামরিক অভিযানও করেছে। আপনার  
বিরুদ্ধে আমাদের অভিযানে শরীক না হওয়ার অর্থ এই নয় যে, আমরা  
সামরিক দিক থেকে দুর্বল ছিলাম। আমরা এক্যবিক্রিয়াবে আপনার বিরুদ্ধে  
মহাশক্তি হয়ে দাঁড়াতে পারতাম। কিন্তু আমি ও কাদের ধান সবসময় গৃহ্যকৃতের  
বিপক্ষে ছিলাম এবং আপনার ভারত অভিযান সাফল্য লাভের প্রত্যাশী ছিলাম।  
আপনার হয়তো জানা নেই, এলিখ ধান আমাকে আপনার বিরুদ্ধে যুদ্ধে শরীক  
হওয়ার জন্য শুধু উক্ফানিই দেয়নি, তার কথায় সাড়া না দেয়ার অপরাধে আমার  
বিরুদ্ধে...।”

“আপনার বিরুদ্ধে সেনাভিয়ানও করেছে।”... তোগা খানের মুখের অনুচ্ছারিত কথা পূর্ণ করে দিলেন সুলতান। “কুদুরতি তুফান ও তুষারপাত তার সেই অভিযান ব্যর্থ করে দেয়। এ ছাড়াও আপনার নিজের ব্যাপারেও কোন কথা জানতে চাইলে আমাকে জিজ্ঞেস করতে পারেন তোগা খান।

“আমার ব্যক্তিগত ব্যাপারে যদি আপনার কাছে খবর থেকে থাকে, তাহলে আমার ইচ্ছা ও বলার মধ্যে আপনার কোন ধরনের সংশয় থাকা উচিত নয়। তারপরও যদি আমার ব্যাপারে আপনার সংশয় দূর না হয়, তাহলে বুঝতে হবে আমার এখানে নিয়োজিত আপনার গোয়েন্দা কোন কাজই করছে না। শুধু শুধুই বেতন-ভাতা নিছে।” বললেন তোগা খান।

“বলুন, কী বলতে চান আপনি?” তোগা খানের উদ্দেশে বললেন সুলতান।

“বর্তমান খলীফা কাদের বিল্লাহ আবরাসী ক্ষমতালিঙ্গ এবং সাম্রাজ্য বিস্তারে প্রয়াসী।” বললেন তোগা খান। “আপনি কি লক্ষ্য করেছেন, খোরাসানের অর্ধেকটা শাসন করছেন খলীফা আর অর্ধেকটা আপনার নিয়ন্ত্রণে।... খলীফা আপনার শাসনাধীন অংশও কজা করতে উদ্যোব। এ লক্ষ্যে তিনি ক্ষমতালিঙ্গ এলিখ খানকে ব্যবহার করছেন। খলীফা এলিখ খানকে প্রতিশ্রূতি দিয়েছেন, সে যদি আপনার বিরুদ্ধে সেনাভিয়ান চালায়, তাহলে তিনি সৈন্যবল দিয়ে প্রকাশ্য সহযোগিতা না করলেও গোপনে পরিবহন, অন্তর্শস্ত্র ও আর্থিক সুবিধা দিয়ে সহযোগিতা করবেন। খলীফা যদি মুসলমানদের এক্য, সংহতি ও এককেন্দ্রিকতার প্রত্যাশী হতেন তাহলে তো তার উচিত ছিলো, বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী এলিখ খানের বিরুদ্ধে তিনি সেনাভিয়ান করতেন। তিনি দৃশ্যত হিন্দুস্তান অভিযানে আপনাকে বাহবা দিচ্ছেন আর পর্দার অন্তরালে চাচ্ছেন আপনি যেনো হিন্দুস্তানে ব্যস্ত থাকেন। আর ওখানে আপনার সামরিক শক্তি ক্ষয় হতে থাকুক, যাতে আপনি সামরিক দিক থেকে দুর্বল হয়ে পড়েন। খলীফা সেই দিনের প্রত্যাশায় প্রহর শুণছেন, যেদিন তিনি খবর পাবেন আপনি হিন্দুস্তানে পরাজিত হয়েছেন, নয়তো সম্মুখসমরে মারা গেছেন। আমীর আবুল মুলক, দারা বিন কাবুস, আবুল কাসেমকে আপনার বিরুদ্ধে এক্যবন্ধ করেছেন খলীফা কাদের বিল্লাহ আবরাসী। এই অঞ্চলে গৃহযুদ্ধের পেছনে খলীফার ট্রেনাস্ত সক্রিয় ভূমিকা রাখছে।”

তোগা খানের কথা শুনে ক্ষোভে-দৃঢ়খে সুলতানের চোখ লাল হয়ে যায়। তিনি যে খলীফাকে মুসলিম বিশ্বের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের পবিত্র আসনে সমাচীন ভাবতেন, আজ তাকেই তার শক্রতার ভূমিকায় অবর্তীর্ণ হওয়ার কথা শুনে তিনি হতবাক হয়ে পড়েন।

“আপনি এসব কথার প্রমাণ চাইলে আমি আপনাকে প্রমাণ দেখাবো।”  
বললেন তোগা খান। “সবচেয়ে বড় প্রমাণ হলো, আমি আপনার সহযোগী, প্রয়োজনে আমার সৈন্যরা আপনার সহযোগিতা করবে, আমার দৃত যাবে আপনার কাছে। আমার সামরিক শক্তি কম হতে পারে, তবে ঈমানের দিক থেকে আমি দুর্বল নই। এলিখ খান যখন আমার বিরুদ্ধে আগ্রাসন চালাতে এসেছিলো, তখন খোদায়ী তুষারপাত ও ঝড় তাকে বিপুল ক্ষয়ক্ষতি স্থীকার করে পিছু হটতে বাধ্য করেছিলো। সে একজন ঈমান বিক্রেতা।”

“যে জাতির কেন্দ্রীয় নেতা ঈমান বিক্রেতা হয়ে যায়, সেই জাতি সর্বাংশেই লুটেরো আর ডাকাতদের আখড়ায় পরিণত হয়।” দৃঢ়খ ভারাক্রান্ত কষ্টে বললেন সুলতান।

খ্যাতিমান ঐতিহাসিক কাসিম ফারিশ্তা ও আলবিরুনী লিখেছেন, সুলতান মাহমুদকে কখনো এমন বিমর্শ হতে দেখা যায়নি। তোগা খানের সাথে সাক্ষাতের পর তিনি যখন গজনীতে ফিরে এলেন, তখন তার চেহারা ছিলো বিস্মিত। তিনি কোনো কথাই বলতে পারছিলেন না। অস্ত্রিভায় তার দৃঢ়ত নিসপিশ করছিলো। উজির তাকে জিজ্ঞেস করলেও তোগা খানের সাথে কী কথা হয়েছিলো, তা বলেননি।

সুলতান মাহমুদ ছিলেন সমকালীন বিখ্যাত বুর্জু আবুল হাসান খিরকানীর ভাবশিষ্য। খিরকানী গজনী থেকে প্রায় দু'দিনের দূরত্বে বসবাস করতেন। সুলতান মাহমুদ মাঝে-মধ্যে আধ্যাত্মিক গুরু আবুল হাসান খিরকানীর সান্নিধ্যে যেতেন। গুরুর কাছে গেলে তিনি মানসিক প্রশান্তি অনুভব করতেন। তার মনের বোৰা খিরকানীর সাথে যে কোনো সমস্যা নিয়ে আলাপের দ্বারা হাঙ্কা হয়ে যেতো।

তোগা খানের সাথে সাক্ষাতের পর বাগদাদের খলীফা সম্পর্কে অনাকাঙ্খিত খবরাখবর শুনে তিনি এতোটাই কষ্ট পেলেন যে, তার চিন্তাশক্তি হ্রাসের হয়ে গেলো। কারণ, খলীফাকে তিনি বিশ্বের ইসলামী চেতনার কেন্দ্রবিন্দু

মনে করতেন। তিনি ভাবতেন, বাগদাদই ইসলাম ও মুসলমানদের ইঙ্গত, মর্যাদা ও উজ্জীবনের প্রাণশক্তি। কিন্তু খলীফা কাদের বিল্লাহ আববাসী ছিলো ইসলামী সালতানাতের কলশ। তিনি মনে মনে কখনো তোগা খানের প্রতি শুরু হচ্ছিলেন, আবার কখনো খলীফার প্রতি তার ক্ষোভ-ঘৃণা সৃষ্টি আগ্রহের প্রতি ফেটে বেরিয়ে পড়তে চাহিলো। তার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছিলো যে, তোগা খান তাকে বিভাস করতে অসত্য কোনো তথ্য দেয়নি। এ খবর তার চিন্তাকে অস্থির করে তুলেছিলো। এমতাবস্থায় বারবার তার আধ্যাত্মিক শুরু আবুল হাসান খিরকানীর কথা মনে পড়েছিলো।

সেই দিনই তিনি আবুল হাসান খিরকানীর সাথে সাক্ষাতের জন্য রওনা হলেন। ভোরে রওনা হয়ে পরদিন সক্ষ্যাত্তি তিনি গন্তব্যে পৌছে গেলেন। শুরুর সকাশে পৌছে তাঁর হাতে তুম দিয়ে সুলতান মাহমুদ বললেন, “আমার বিশ্বাসের পরিপন্থী একটা সংবাদ আমাকে মানসিকভাবে চরম হতাশাপ্রত করে ফেলেছে। দারণ যন্ত্রণায় দঞ্চ হচ্ছি আমি। আমাকে স্বত্ত্বির কোনো পথ বাতলে দিন শুরু।”

“কী হয়েছে? হিন্দুস্তান থেকে কি পরাজিত হয়ে এসেছো?” জিজ্ঞেস করলেন খিরকানী।

“আপনাদের দুআয় হিন্দুস্তানের মুশারিকদের কাছে আমি কখনো পরাজিত হবো না। বিজয়ী কোনো সুলতান তখনই পরাজিত হয় যখন স্বজাতীয় কোন ভাই তার পিঠে আঘাত হানে।” সুলতান বললেন।

“আমি সেইসব আঘাতী ভাইদের ব্যাপারে মোটেও বেখবর নই সুলতান। কিন্তু ভুলে যেও না আল্লাহ সত্যের পক্ষে আছেন। আল্লাহ তোমাকে মদদ করবেন, তোমার হতাশ হওয়ার কোনোই কারণ নেই।” বললেন খিরকানী।

“আপনি হয়তো জানেন। কিন্তু এ কথাও কি আপনার কাছে বিশ্বাসযোগ্য মনে হবে যে, খলীফা আল-কাদের বিল্লাহ আমার বিরুদ্ধে গৃহযুদ্ধে প্ররোচনা দিচ্ছে। আমাকে একথা বলেছে এলিখ খানের ভাই তোগা খান।” সুলতান বললেন।

খিরকানী স্থিত হেসে বললেন, “আমি এটাও জানি। খলীফার অসৎ ধারণা সম্পর্কে আমি যখন প্রথম জানতে পারি, তখন তুমি হিন্দুস্তানে। তুমি আজ না আসলে আমিই তোমাকে এ ব্যাপারে অবহিত করতে খবর পাঠাতাম।”

“তাহলে কি আমি তোগা খানের সংবাদকে সত্য বলেই বিশ্বাস করবো? আমি কি এতোদিন আঘ্যন্বঞ্চানায় ছিলাম যে খলীফাতুল মুসলিমীন আঘ্যাহর রসূলের প্রতিনিধি?” সুলতান বললেন।

“যারা সত্যিকার অর্থে রাসূলের প্রতিনিধি ছিলেন, তারা গত হয়ে গেছেন।” বললেন খিরকানী। “তাদের পর যারা এসেছে এবং ভবিষ্যতে যারা আসবে, তারা প্রবৃত্তির পূজারী খলীফা হবে। বর্তমান খলীফা একটি রাজ্য শাসন করে। সমরকন্দের শাসকও তিনি। তিনি যে কোনো মূল্যে তার মসনদে অঁকড়ে থাকতে তৎপর। রাজত্বে তার কাছে বেশি শুরুত্বপূর্ণ। খেলাফতের সকল রীতি পদদলিত করে বর্তমান খলীফা তার প্রত্যক্ষ রাজত্বের পরিধিকে সম্প্রসারিত করতে শক্তিশালী ও দুর্নীতিপরায়ণ শাসকদের সাথে সখ্যতা গড়ে তুলেছেন। তুমি কি জানো না, তোমার পিতার শাসনামলে কারামাতীদের সাথে বর্তমান খলীফা কাদের বিল্লাহ আবাসী গোপনে মৈত্রী গড়ে তুলেছিলেন? আর তখন কারামাতীরা অজেয় শক্তিতে পরিণত হয়েছিলো। এরপর তুমি যখন আপসহীনভাবে নিজের দৃঢ়তা ও সাহসিকতার উপর ভর করে সামরিক শক্তিতে বলীয়ান হয়ে হিন্দুদের দু'টি গজনী আক্রমণ প্রতিহত করে ওদের দেশের ভেতরে গিয়ে হিন্দুদের পরাজিত করে হিন্দু অঞ্চল নিজের কজায় আনতে শুরু করলে এবং কারামাতীদেরকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করে ওদের ভণ্ডামী ও ভষ্টামী নির্মূল করতে সক্ষম হলে, তখনই খলীফা তোমাকে ‘আমীমূল মিল্লাত ও যামীনুন্দোলা’ বেতাবে ভূষিত করেন। তোমাকে তার বিশ্বস্ত ও অনুগত করে নেন। হিন্দুস্তানে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে পৌন্ডলিকতা দূর করে সেখানে ইসলামের সত্ত্বের বাণী প্রচার করা আর বিন কাসিমের বিজিত রাজ্যগুলোর নিগৃহীত মুসলমানদেরকে ব্রাহ্মণ্যবাদীদের নাগপাশ থেকে মুক্তির ব্যাপারে তার কোনো আগ্রহ নেই। বরং তোমার ক্রমবর্ধমান শক্তিতে সে শংকিত। এ আশংকা থেকেই তিনি প্রকাশ্যে তোমাকে বাহবা দিচ্ছেন আর নেপথ্যে তোমার শক্তিদেরকে উক্ফনি দিয়ে তোমার শক্তি খর্ব করতে তৎপর রয়েছেন।”

“একজন কেন্দ্রীয় খলীফার এ ধরনের তৎপরতায় লিঙ্গ হওয়া কি সমীচীন?” বললেন সুলতান।

“তুমি তাকে খলীফাতুল মুসলিমীন বলছো? আমি তাকে কখনো মুসলিম বিশ্বের অভিভাবক মনে করি না। শরীয়তের দৃষ্টিতে তার খলীফার মসনদে

আসীন হওয়ার কোনোই যোগ্যতা নেই। খলীফা হওয়ার জন্য তাকওয়া ও ইসলামী আদর্শের অনুসরী হওয়া অপরিহার্য। সেই সাথে মুসলমানদের মধ্যে বিরোধ ও বিশৃঙ্খলার পরিবর্তে ঐক্য ও সংহতি স্থাপন তার একান্ত কর্তব্য। তার মধ্যে কোনো ধরনের বৈষম্যক লালসা থাকা মোটেই উচিত নয়। এসব বিচারে সে মোটেও খলীফা হওয়ার উপযুক্ত নয়। যে খলীফা প্রত্যক্ষ রাজ্য শাসন করে, সে দুর্নীতিমুক্ত থাকতে পারে না।” খিরকানী বললেন।

“আমরা কি এমন খলীফাকে ক্ষমতাচ্যুত করতে পারি না?” বললেন সুলতান মাহমুদ।

“না। কারণ, খেলাফত এখন পারিবারিক ও গোষ্ঠীগত সশ্পদে পরিণত হয়েছে। খেলাফত এখন ইসলামের প্রতীক হওয়ার পরিবর্তে ব্যক্তি ও গোষ্ঠীগত ক্ষমতার মসনদে পরিণত হয়েছে। মুসলিম উস্মাহর মধ্যে অনৈক্য ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির প্রধান কারণ খেলাফতের বিকৃতি সাধন। খেলাফত এখন শক্তি, ক্ষমতা ও ব্যক্তি শাসনের প্রতীকে পরিণত হয়েছে। এখন যাকেই খলীফা বানানো হোক, সে-ই এমন হবে। ধীরে ধীরে মুসলিম উস্মাহ আরো বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে। উস্মাহর ঐক্য, সংহতি, সশ্বান ও মর্যাদা ধূলিসাং হয়ে যাবে। টুকরো টুকরো হয়ে পড়বে মুসলিম সালতানাত। ভবিষ্যতে এমন হবে যে, হাতে কুরআন শরীফ নিয়ে খলীফারা নিজেদেরকে ইসলামের সেবক ঘোষণা করবে; কিন্তু ইসলামের শক্তদেরকে বন্ধু আর বন্ধুদের শক্ত বানাবে। তারা হবে মুসলিম উস্মাহর জন্য জলজ্যান্ত ধোঁকা। তারা নিজেদের চারপাশে তোষামোদকারী ও অনুগত ভৃত্যের জাল তৈরি করবে। মুসলিম উস্মাহ আরবী, আজমী, মিশরী, তুর্কি নানা আঞ্চলিকভাব ভিত্তিতে বিভক্ত হয়ে যাবে। ইসলামের ব্যাপারে মুসলমানদের মধ্যেই সৃষ্টি হবে সংশয়। শাসন ক্ষমতায় যারাই অধিষ্ঠিত হবে, তারা হবে সৈরাচারী।” খিরকানী বললেন।

“এ প্রেক্ষিতে আমার কী করা উচিত?” বললেন সুলতান। “আমি খলীফাকে তোষামোদ করতে পারবো না।”

“খলীফাকে তুমি বুঝিয়ে দাও, তার চক্রান্তের ব্যাপারে তুমি অবগত।” বললেন খিরকানী। “মাহমুদ! মুসলমান যখন ঈমান নিয়ে বাণিজ্য করে, তখন বস্তুনিষ্ঠতার অধিকারী সত্যপন্থী ঈমানদানদের বোকা ও মিথ্যাবাদী ঘনে করতে থাকে। তুমি হিন্দুস্তানে যেসব লোকের হাতে ঐসব এলাকার শাসনভার ন্যস্ত

করেছো, আমার ভয় হয়, ওরা না আবার প্রবৃত্তির ধোকায় পড়ে যায়। মুসলমানদেরকে দু'টি জিনিস বড় বেশী ঘায়েল করে ফেলে— একটি প্রবৃত্তির ঘায়েশ আর অপরটি সম্পদ ও ক্ষমতার মোহ। হিন্দুতান ধোকা ও প্রতারণার উর্বর ভূমি। তোমার নিয়ন্ত্র শাসকরা ঝীমান বিক্রেতা হয়ে যায় কিনা এ বিষয়টি আমাকে খুব ভাবায়। ভবিষ্যতে তোমার সমৃহ বিপদ ও কঠিন পরীক্ষা অপেক্ষা করছে, তাতে তুমি ঘাবড়ে যেয়ো না।”

“তাহলে কি আমি খলীফাকে বিষয়টি জানিয়ে দেবো?” সুলতান বললেন।

“সত্য কথা বলতে দিধা করা উচিত নয়। আমিও খলীফাকে বিষয়টি জানাতে চেষ্টা করবো।” খিরকানী বললেন।

আধ্যাত্মিক গুরু আবুল হাসান খিরকানীর সান্নিধ্য থেকে গজনী ফিরে সুলতান মাহমুদ বাগদাদের খলীফা কাদের বিল্লাহ আক্রাসীর কাছে এই বলে পয়গাম পাঠালেন যে— “গজনী সালতানাতের অন্তর্ভুক্ত খোরাসানের অধিকাংশ এলাকা আপনি দখল করে রেখেছেন। আপনাকে আমি আমাদের রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত এলাকার একটি মানচিত্র এঁকে দিছি। যেসব এলাকা আমি চিহ্নিত করে দেবো, সেসব অঞ্চল থেকে আপনি আপনার আমলা ও সেনাদের প্রত্যাহার করে নিবেন। খলীফার কোনো এলাকারই প্রত্যক্ষ শাসক হওয়া উচিত নয়। কিন্তু আমি জানি, আপনি আমার প্রস্তাব মানতে সম্মত হবেন না। এতোদিন আমি খেলাফতের সম্মানে নীরব ছিলাম; কিন্তু আমার আজীবন লালিত ধারণা এখন ভুল প্রয়াণিত হয়েছে। আশা করি, আপনি নির্বিবাদে আমার চিহ্নিত এলাকাগুলো আমাদের ফেরত দেবেন। আশা করি, নিজের মর্যাদা ও সম্মানের দিকে লক্ষ্য রেখে আপনি কোনো ধরনের প্রতারণার আশ্রয় না নিয়ে আমার আবেদনে সাড়া দেবেন।”

ঐতিহাসিক ফারিশতা, আলবিরুনী ও গরদিজী প্রমুখ লিখেছেন, সুলতান মাহমুদের সামরিক শক্তি সম্পর্কে খলীফা কাদের বিল্লাহ পুরোপুরি জ্ঞাত ছিলেন। তিনি এটাও জানতেন যে, সুলতান যা ইচ্ছা করেন এবং বলেন, তা বাস্তবে প্রতিফলন না ঘটিয়ে ক্ষান্ত হন না। খলীফা এটাও জানতেন, গজনী অঞ্চলের সকল অধিবাসী সুলতানের অনুগত। তাই সুলতানের পয়গাম পাওয়ার পর কোনো ধরনের টালবাহানা না করে খোরাসান রাজ্যের যে অংশটুকু গজনী সালতানাতের অংশ ছিলো, তা থেকে সেনাবাহিনী ও আমলাদের প্রত্যাহার করে সুলতানের নিয়ন্ত্রণে হস্তান্তর করলেন।

খলীফার এই কাজে সুলতান আরো ক্ষুক হলেন। তিনি বুঝতে পারলেন, এতো তাড়াতাড়ি খলীফার রণেভঙ্গ দেয়ার অর্থ হলো তার মধ্যে আসলে ধর্মীয় চেতনা অনুপস্থিত। সে ক্ষমতালিঙ্গ ও ধূরঙ্গর। এরপর সুলতান মাহমুদ এই বলে আবার বাগদাদে দৃত পাঠালেন যে, সমরকন্দের উপর আপনার দখলদারিত্ব বৈধ নয়। এই শহরটিও আমার অধীনে হস্তান্তর করুন। সুলতানের সমরকন্দ চাওয়ার পয়গামের জবাবে খলীফা এই বলে তার এক বিশেষ দৃতকে সুলতানের কাছে পাঠালেন যে, “খলীফা কোনো অবস্থাতেই সমরকন্দের দখল হস্তান্তর করবেন না। খলীফা এও বলেছেন, আপনি যদি এই দাবী আদায়ে শক্তি প্রয়োগ করেন, তাহলে খলীফা গোটা জাতির সম্মুখে আপনাকে অপমানিত করবেন।”

জবাবে সুলতান মাহমুদ দৃতকে বললেন, “তুমি বাগদাদে গিয়ে খলীফাকে জিজ্ঞেস করো, সে কী চায়। আমি এক হাজার জঙ্গী হস্তি নিয়ে বাগদাদ আসবো।” রাগে-ক্ষোভে অগ্নিশর্মা হয়ে বললেন, “খলীফাকে বলবে, আমাকে যদি বাগদাদ আসতেই হয়, তাহলে আমি বাগদাদের রাজপ্রাসাদের প্রতিটি ইট খুলে ফেলবো আর প্রাসাদের ভগ্নাবশেষ হাতির পিঠে বোঝাই করে গজনী নিয়ে আসবো।”

এক ইংরেজ ঐতিহাসিক এইচ এইচ হোয়ার্থ অন্যান্য মুসলিম ঐতিহাসিকদের উদ্ধৃত করে লিখেছেন, সুলতান মাহমুদের এই হৃষকিতে খলীফা কাদের বিল্লাহ আবাসী রীতিমতো ভড়কে যান। তিনি এমন এক মহান মর্যাদায় অধিষ্ঠিত ছিলেন যে, ইচ্ছা করে নিজের পদকে অবলম্বন করে তিনি সুলতান মাহমুদকে ক্ষমা প্রার্থনার নির্দেশ দিতে পারতেন। কিন্তু তার ব্যক্তিগত জীবনচার এতোই কদর্য ছিলো যে, তিনি নিজ অবস্থানের চেয়ে অত্যন্ত নমনীয়ভাবে সুলতান মাহমুদের ক্ষোভের জবাব দিলেন। যার ফলে সুলতান মাহমুদ সেনাভিয়ান পরিচালনা করে সমরকন্দকে নিজের শাসনের অন্তর্ভুক্ত করে নিলেন।

এক হাজার বারো খৃষ্টাব্দের প্রায় অর্ধেক বছর চলে গেছে। সুলতান মাহমুদ ভারতের বিজিত রাজ্যগুলোর ব্যাপারে অনেকটা নিশ্চিতই ছিলেন। পাঁবের রাজা আনন্দ পাল তখনো জীবিত থাকলেও তার শক্তি-সামর্থ নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিলো। তিনি সুলতান মাহমুদের আনুগত্য স্বীকার করে নিয়েছিলেন।

গোয়েন্দাদের মাধ্যমে হিন্দুস্তানের রাজা-মহারাজাদের তৎপরতার খবরাখবর তিনি গীতিমতো পাঞ্চলিন। তার কাছে একদিন খবর এলো, রাজা আনন্দ পাল মারা গেছেন। তার ছেলে তরুণ চন্দ্রপাল এখন পিতার স্থলাভিষিক্ত হয়েছে।

থানেশ্বর মন্দিরের সর্বপ্রাচীন ও সর্ববৃহৎ বিষ্ণুদেবীর মূর্তি সুলতান মাহমুদ গজনী নিয়ে গিয়েছিলেন এবং সেখানে নিয়ে বিষ্ণুমূর্তিকে খুবই অপমানজনকভাবে ধ্রংস করা হয়েছিলো। হিন্দুদের কাছে বিষ্ণুমূর্তির অর্মাদা যতোটুকু না ছিলো গ্রানির, তার চেয়ে বেশি ছিলো আতঙ্কের। হিন্দুরা বিষ্ণুমূর্তির অর্মাদার কারণে দেবদেবীদের অভিশাপে নিপত্তিত হওয়ার আশংকায় ভীতসন্ত্বষ্ট ছিলো। পঞ্চিতা দেবালয়ে মূর্তির সামনে বসে ভয়ে থর থর করে কাঁপতো। তাদের ধারণা ছিলো, বিষ্ণুমূর্তি পৃথিবীতে মানুষের আগমনের সাথে সাথেই সৃষ্টি হয়েছিলো। পৃথিবীর প্রথম মানুষটিও বিষ্ণুমূর্তিকেই পূজা করতো। সেই পুরনো দেবমূর্তির এহেন অর্মাদায় হিন্দুরা গঙ্গার পানিতে নেমে চোখের জলে বুক ভাসিয়ে দেবতার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করতো। সাধারণ একটু বাতাস এলে কিংবা আকাশের গর্জন শুনলেই হিন্দুরা দুঃহাত জোড় করে বিড় বিড় করে ভগবানের কাছে ক্ষমাভিক্ষা চাইতো।

জয়পালের মৃত্যুর পর আনন্দ পাল ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে বেশ জাকজমক নিয়ে কয়েকটি যুদ্ধে সুলতান মাহমুদকে হমকি দিয়েছিলো। কিন্তু প্রত্যেকটি যুদ্ধেই সুলতান মাহমুদের কাছে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয় আনন্দ পাল। অবশেষে সে সুলতানের সাথে মৈত্রী চৰ্কিতে স্বাক্ষর করে। এরপরও সুলতানকে ফাঁকি দিয়ে জব্দ করার চেষ্টা করে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বশ্যতা স্থীকার করতে বাধ্য হয় আনন্দ পাল।

ঐতিহাসিকরা লিখেছেন, দ্রুমাগত পরাজয়ে আনন্দপাল হতোদ্যম হয়ে পড়েছিলো। বিশেষ করে সুলতান মাহমুদ থানেশ্বর মন্দির কজা করে নেয়ার পর এর শোক সইতে না পেরে শয্যাশায়ী হয়ে পড়ে রাজা আনন্দ পাল। অবশেষে তার মৃত্যুর পর পুত্র তরুণ চন্দ্রপাল ক্ষমতাসীন হয়।

রাজা আনন্দ পালের মৃত্যুর খবর শুনে হিন্দুস্তানের ছোট-বড় সকল রাজা-মহারাজা ও রায়গণ এসে লাহোরে জমায়েত হয় আনন্দ পালের শেষকৃত্যানুষ্ঠানে। আনন্দ পালের মরদেহ যখন চিতায় জুলছিলো, তখন কনৌজের রাজা সমবেত হিন্দু শাসকদের উদ্দেশে উচ্চ আওয়াজে বললো,

“আজ আমরা এমন এক মহান পুরুষের চিতার পাশে দাঁড়িয়েছি, যিনি সারাজীবন মন্দিরের হেফায়তের জন্য মুসলমানদের সাথে যুদ্ধ করে কাটিয়েছেন। হিন্দুস্তানের মধ্যে তিনিই ছিলেন একমাত্র শাসক, যিনি নিজের সীমানা পেরিয়ে গিয়ে সুলতান মাহমুদকে ঢালেঙ্গ করেছেন। আমাদের গান্দুরী ও কাপুরুষতার কারণে আজ হিন্দুস্তানের ঐতিহাসিক মন্দিরগুলো থেকে মুসলমানদের আঘান ধ্বনিত হচ্ছে। আসুন, বীরপুরুষ রাজা আনন্দ পালের জুলন্ত চিতার সামনে দাঁড়িয়ে আমরা শপথ নিই, আমরা সবাই মিলে মন্দিরের মর্যাদা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করবো এবং হত মন্দিরগুলো ফিরিয়ে এনে মসজিদগুলোকে মন্দিরে পরিণত করবো।”

“আমি এই অঙ্গীকার করছি বিষ্ণুদেবীর প্রতিশোধ নিতে। আমি গজনীর প্রতিটি ইট খুলে ফেলবো।” বললো কনৌজের রাজা।

সমবেত প্রত্যেক রাজা-মহারাজা, ঝৰি ও পুরোহিত আনন্দ পালের জুলন্ত চিতার তপ্ত আগনের তাপে উভগ্ন হয়ে প্রতিজ্ঞা করলো, তারা ভারতে ইসলামের ক্রমবর্ধমান বিস্তৃতি লাশের বাঁধ দিয়ে হলেও রোধ করবে। প্রত্যেকেই শপথ করলো, তারা মুসলমানদের মসজিদগুলোকে মন্দির, মুসলমানদেরকে হিন্দু এবং গজনীকে মহাভারতের রাজধানীতে ক্লপান্তরিত করবে। আনন্দ পালের উত্তরাধিকারী তরুণ চন্দ্রপাল সমবেত রাজাদের সারিতে দাঁড়িয়ে নীরবে অশ্ব বিসর্জন দিচ্ছিলো।

“রাজকুমার তরুণ চন্দ্রপালেরও এ সমাবেশে কিছু বলা উচিত। তিনিই তো এখন ক্ষমতাসীন রাজা।” বললো এক পুরোহিত। “শোক-তাপ এখন ভুলে যাওয়া উচিত। রাজপুতরা অশ্ব নয়, বুকের তাজা রক্ত দিয়ে শোককে শক্তিতে পরিণত করে।”

যুবক তরুণ চন্দ্রপাল সারি ঠেলে আরো সামনে এগিয়ে এলো। বাবার জুলন্ত চিতার দিকে তাকিয়ে সমবেত রাজা-মহারাজাদের দিকে চোখ ফিরিয়ে নিয়ে বললো, “আপনারা সবাই তো কঠিন সব অঙ্গীকারবাণী উচ্চারণ করলেন। কিন্তু বলুন তো, আপনাদের মধ্যে এমন ক’জন আছেন, যিনি কৃত অঙ্গীকার পূরণ করবেন? ইসলামের স্নোতের সামনে লাশের বাঁধ এতোদিন পর্যন্ত কেন আপনারা দিতে পারেননি। মুসলমানরা যখন থানেশ্বরের দিকে যাত্রা করেছিলো, তখন আপনাদের এই শক্তি ও দাপট কোথায় ছিলো? এখানকার

ঘসজিদগুলোকে মন্দির এবং মুসলমানদেরকে হিন্দু বানানো খুব কঠিন কাজ নয়, রাজপুতরা রঞ্জের সাগরে ঝাপিয়ে পড়াকে ভয় করে না। আপনারা আমার বাবার খুব প্রশংসনীয় করেছেন; কিন্তু বাবা তার এলাকায় প্রত্যেকটি যুদ্ধ মোকাবেলা করেছেন। আপনাদের মধ্যে অনেকেই আমাদের কাছে এ জন্য কিছু সৈন্য দিয়েছিলেন, যাতে আমরা মুসলমানদেরকে পেশোয়ারে ঠেকিয়ে রাখি। আপনারা কথায় যেমন সাহসিকতা দেখান, কাজে তার সম্পূর্ণ বিপরীত। আপনারা চান, সুলতান মাহমুদের অগ্রযাত্রা আমরা এখানেই বাধাগ্রস্ত করে রাখি আর আপনারা নির্বিবাদে রাজত্ব করবেন।”

“মহারাজ! আপনি আসলে কী বলতে চাচ্ছেন?” তরুণ চন্দ্রকে জিজ্ঞেস করলো এক রাজা।

“আমি পরিষ্কার বলে দিতে চাই, আমার রাজ্যকে নিরাপদ রাখার জন্য আমি মুসলমানদেরকে বঙ্গ হিসেবে বরণ করে নেবো। সুলতান মাহমুদ আমার রাজ্যে আক্রমণ করলে আমি মোকাবেলা করবো। কিন্তু এখানকার নিরপরাধ মুসলমানদের উপর আমি হাত উঠাবো না।” বললো তরুণ চন্দ্রপাল।

“তাহলে আপনি কি মাহমুদের মিত্র ও আনুগত্য মেনে নিচ্ছেন?” প্রশ্ন করলো কনৌজের রাজা।

“হ্যা, আমি মাহমুদকে কর দেবো এবং তার আনুগত্য মেনে চলতেই চেষ্টা করবো।”

“আপনি কি জানেন না, এখানকার মুসলমানরা হিন্দুস্তানে বসবাস করলেও গজনী সুলতানেরই আনুগত্য করে?” বললো অপর এক রাজা।

“আপনার কি একথা জানা নেই যে, গজনীতেই বহু হিন্দু বসবাস করে, আর গজনী বাহিনীতে পৃথক একটি হিন্দু ইউনিট পর্যন্ত রয়েছে কিন্তু তাদের থেকে কি কেউ বিদ্রোহ করে সেখান থেকে এখানে এসেছে ওদের কজায় আছে সেনাবাহিনীর চৌকস ঘোড়া, জঙ্গী হাতি, আধুনিক যুদ্ধান্ত। তারা সেখানে সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে বিচরণ করতে পারছে। তাদের কেউ এ পর্যন্ত কেনো হিন্দুস্তানে পালিয়ে এলো না? এখানকার সব মুসলমান আমাদের শক্তি নয়। অনেকেই আমাদের খুবই বিশ্বস্ত।” বললো তরুণ চন্দ্রপাল।

হঠাৎ মহিলাদের ভিড় ঠেলে এক সুন্দরী তরুণী রাজা-মহারাজাদের সারিতে দাঁড়ানো তরুণচন্দ্রের পাশে এসে দাঁড়ালো। সে তরুণচন্দ্রের হাত

থেকে তরবারী কেড়ে নিয়ে উঁচিয়ে ধরে বললো, “আপনারা সবাই জানেন, আমি এই ব্যক্তির স্ত্রী। তাকে বলুন, সে আমাকে বাবার জুলন্ত চিতায় ফেলে কিংবা এই তরবারী দিয়ে হত্যা করবক। আমি পরিষ্কার ঘোষণা করছি, আমি রাজপুতের কন্যা। আমার বাবা মুসলমানদের সাথে যুদ্ধ করে মৃত্যুবরণ করেছেন। আমি আমার ধর্ম অবমাননার প্রতিশোধ নেবো, আমার বাবার রঙের বদলা নেবো। আজ থেকে আমি আমার স্বামীর সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক ছিন্ন করছি। সে একটা কাপুরুষ। যে ব্যক্তি গজনী সুলতানের বশ্যতা স্বীকার করে নেয়, তার সাথে আমার কোনো সম্পর্ক থাকতে পারে না।”

তরুণচন্দ্র তরুণীর প্রতি ধেয়ে এলো। কিন্তু ততোক্ষণে তাদের দু'জনের মধ্যে এসে দাঁড়িয়ে গেলো আরেক যুবক এবং দ্রুত সে তরুণীর হাতের তরবারী কেড়ে নিলো। এই তরুণ ভীমপাল। আনন্দ পালের দ্বিতীয় পুত্র এবং তরুণচন্দ্রের ছোট ভাই। ঐতিহাসিকরা তাকে ভীমপাল বাহাদুর নামে উল্লেখ করেছেন। ভীমপাল ছিলো খুবই ডালপিঠে ও দুঃসাহসী। ভীমপাল তরুণপালকে বাধা দিয়ে বললো, “খবরদার তরুণপাল! এখানে এমন কেউ নেই, যে তোমার সহযোগিতায় এগিয়ে আসবে। এই মহিলার গায়ে তুমি হাত তুললে তুমি যে আমার ভাই এবং ওর স্বামী আমি সেকথা ভুলে যাবো। এখন থেকে আমিই হবো আমার বাবার সিংহাসনের অধিকারী। বাবার সিংহাসনের সে-ই স্থলাভিষিক্ত হতে পারে, যে তার অপমানের প্রতিশোধ নিতে সক্ষম।”

ভীমচন্দ্র সমবেত লোকদের দিকে তাকিয়ে তরবারী উঁচিয়ে বললো, “আমি যদি গজনী সুলতানের বশ্যতা অঙ্গীকার করি এবং বিষ্ণুদেবীর অপমানের প্রতিশোধ নেয়ার অঙ্গীকার করি, তাহলে কি আপনারা আমাকে বাবার সিংহাসনের উত্তরাধিকারী হিসেবে মেনে নেবেন?”

“হ্যা, তুমই মহারাজা জয়পাল ও মহারাজা আনন্দ পালের যোগ্য উত্তরসূরী।” ঘোষণা করলো প্রধান পুরোহিত।

এরপরই সমাবেশ থেকে আওয়াজ উঠলো, “তরুণচন্দ্র পালকে বসিয়ে দাও, তরুণচন্দ্রের কাছ থেকে তরবারী ছিনিয়ে নাও। ভীমপাল মহারাজের জয় হোক।”

দেখতে দেখতে ভীমপালের জয়ঘনি উচ্চকিত হলো। এর সাথে পাল্লা দিয়ে উঁচু হয়ে উঠলো আনন্দ পালের চিতার আগুন। চিতার লেলিহান অগ্নি

শিখার সাঁই শব্দ আর ভীমপালের জয়ধনিতে তলিয়ে গেলো তরুণচন্দ্রের বাস্তববাদিতার অস্তিত্ব। কিছুক্ষণের মধ্যে আনন্দ পালের দূরদর্শী বড় ছেলে ব্রাক্ষণ্যবাদী উত্থার কাছে পরাজিত হয়ে সাধারণ রাজকুমারে পরিণত হলো। তার জায়গায় আনন্দ পালের উৎ ও অদূরদর্শী দ্বিতীয় পুত্র ভীমপাল রাজা-মহারাজা ও পুরোহিতদের সমর্থনে সিংহাসনে স্থলাভিষিক্ত হলো। পাঞ্জাবের মহারাজায় অভিমিক্ত হলো ভীমপাল।

\* \* \*

দিন শেষে সেই রাতেই আনন্দ পালের রেখে যাওয়া রাজপ্রাসাদে হিন্দুস্তানের রাজা-মহারাজা ও পুরোহিতদের কনফারেন্স বসে। সমাবেশের সভাপতির আসন অলংকৃত করলো আনন্দ পালের দ্বিতীয় পুত্র ভীমপাল। মসনদ থেকে প্রত্যাখ্যাত হয়ে প্রাসাদ থেকে গায়ের হয়ে গেলো তরুণচন্দ্র পাল। শুরু হলো ভীমপালের নেতৃত্বে মুসলিম উৎখাতের চিন্তা-ভাবনা।

সবচেয়ে প্রবীণ পুরোহিত প্রস্তাব করলো, “হিন্দুস্তানের সবগুলো মসজিদ শুড়িয়ে দিতে হবে এবং এখানকার মুসলমানদের বাধ্য করা হবে— হয় তারা গজনী ঢঙে যাবে, নয়তো সনাতন ধর্ম গ্রহণ করবে।”

“এ ব্যাপারে আমি দাদা তরুণচন্দ্রের কথা সমর্থন করি। নিরপরাধ মুসলমানদের উপর আমরা কেনো হাত তুলতে যাবো?” বললো ভীমপাল। “আমরা শক্তির সংখ্যা বাড়াতে চাই না, বস্তুর সংখ্যা বাড়াতে চাই। এখানকার সবগুলো মসজিদ ধ্বংস করে দিলেও মুসলমানদের কিছু যায়-আসে না। মুসলমানরা যেখানেই নামায পড়তে দাঁড়ায়, সে জায়গায়ই মসজিদে পরিণত হয়। এসব ছায়ার পেছনে আমাদের দৌড়ে কোনো লাভ হবে না। সুলতান মাহমুদের মতো মহাশঙ্কির বিরুদ্ধে হবে আমাদের লড়াই। আমি হিন্দুস্তানের ইতিহাসে আমার নামের সাথে এ কাহিনী রেখে যেতে চাই না, ভীমপাল গজনীর সুলতানের কাছে পরাজিত হয়ে নিরপরাধ মুসলমানদের হত্যা করে প্রতিশোধ নিয়েছে।”

“আমাদের সামনে সবচেয়ে বড় সমস্যা হলো মুসলমানরা শুধু আমাদের মন্দিরগুলো ধ্বংস করে দেয়নি; মন্দির দখল হয়ে যাওয়ার কারণে বিপুল হিন্দু ইসলামের প্রতি আগ্রহী হয়ে উঠেছে।” বললো এক বিচক্ষণ পুরোহিত।

“লোকজন দেবদেবীর অভিশাপ ভয় পাচ্ছে; কিন্তু এখনো দেবদেবীদের কোন অভিশাপে খৎস্যজ্ঞ শুরু হয়নি। দেবতাদের অভিশাপ বর্ষণের আগেই আমাদেরকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে তাওব হয়ে ঝাপিয়ে পড়তে হবে। আমাদেরকে প্রয়াণ করতে হবে যে, মুসলমানরা যেগুলোকে ভূত বলে সেগুলোই আমাদের দেবতা। দেবতাদের অসম্মানকারী কোনো মানুষের বেঁচে থাকার অধিকার নেই।”

“যেসব দুর্গ মুসলমানদের দখলে রয়েছে, সেগুলো অবরোধ করা হোক।” প্রস্তাব করলো এক রাজা। কিন্তু সাথে সাথেই এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করলো কয়েকজন। তারা বললো, “মুসলিম দখলকৃত কোনো দুর্গ অবরুদ্ধ হওয়ার খবর পেলে পূর্ণ শক্তি নিয়ে চলে আসবে মাহমুদ। যে কোনো সামরিক পদক্ষেপের আগে আমাদের প্রস্তুতি নেয়া দরকার। আর প্রস্তুতির জন্য প্রয়োজন সময়। সময় নিয়ে পূর্ণ প্রস্তুতির পর আমরা ইচ্ছা করলে মাহমুদকে হিন্দুস্তানের কোনো সুবিধামতো এলাকায় টেনে নিয়ে ফাঁদে ফেলা সম্ভব হবে।”

“এ সময়ের মধ্যে রেরা, মুলতান ও থানেশ্বরে যেসব মুসলিম কর্মকর্তা রয়েছে তাদেরকে আমাদের হাত করে নেয়ার চেষ্টা করা দরকার, যাতে তারা মাহমুদের সহযোগিতা না করে।” প্রস্তাব করলো ভীমপালের উজির। ভীমপালের উজির ছিলো অত্যন্ত অভিজ্ঞ ও বুদ্ধিমান। সে আরো বললো, “মুসলমান কর্মকর্তাদের বাগে আনার কৌশল আমাদের জানা আছে। সে কৌশল প্রয়োগ করে আমরা এদের অকার্যকর করে দিতে পারি।”

“মুসলমান কর্মকর্তারা তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্যের প্রতি খুবই সতর্ক ও নিষ্ঠাবান।” বললো ভীমপাল। “তবুও আমার মনে হয়, আপনার কোনো কৌশল এসব সেনাপতি ও কর্তব্যক্ষিদের বাগে আনতে সফল হবে।”

উজির স্থিত হেসে বললো, “মুসলমানরাও মানুষ। সাধারণ মানুষরা অবতার ও পয়গাম্বরের শুণবিশিষ্ট হয় না। প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই একটা দুর্বলতা এবং একটা চাহিদা থাকে। যারা এই দুর্বলতা ও চাহিদাকে দমিয়ে রাখতে পারে, তারাই হয় মুনি-ঝৰি কিংবা পীর-বুর্যুর্গ। আমরা মানুষের মধ্যে থাকা সহজাত দুর্বলতা ও চাহিদাকে উক্তে দিয়ে তাদেরকে সেই উচ্চাসন থেকে নিচে নামিয়ে দিতে পারি। তাদের মধ্যে ভোগবাদের স্বপ্ন জাগিয়ে দিতে পারলে তারা কর্তব্যপরায়ণতা ভুলে যাবে।... আমরা থানেশ্বর থেকেই এ কাজ শুরু করতে পারি।”

রাজা-মহারাজাদের কনফারেন্সে আরো সিন্ধান্ত হলো, এখন থেকে ভারতের সকল রাজা-মহারাজা সুলতান মাহমুদের বিরুদ্ধে সংযুক্ত আক্রমণের পূর্ণ প্রত্নতি প্রস্তুত করবে। সেই সাথে মুসলমান সেনাধ্যক্ষ ও কর্মকর্তাদের পক্ষে নিয়ে আসার পূর্ণ চেষ্টাও অব্যাহত থাকবে। এসব ব্যাপারে সিন্ধান্ত গৃহীত হওয়ার পর আনন্দ পালের দ্বিতীয় পুত্রকে সুলতান মাহমুদের কাছে এই বলে বার্তা পাঠানোর কথা বলা হলো যে, তিনি আর সুলতান মাহমুদের করদাতা নন। রাজা আনন্দপাল যে মৈত্রী চুক্তি করেছিলেন, তা প্রত্যাখ্যান করা হলো।

হিন্দুস্তান থেকে ফেরার সময় সুলতান মাহমুদ তার অভিজ্ঞ সেনাধ্যক্ষ আবদুল্লাহ আল তাহি, আলতানতুশ এবং আরসালান জায়েবকে সাথে নিয়ে গিয়েছিলেন। কারণ, সেখানকার সমস্যা ছিলো খুবই কঠিন। হিন্দুস্তানের অভিযানে অনেক অভিজ্ঞ জেনারেল ছিলেন। কিন্তু তারা উল্লেখিত তিনি জেনারেলের মতো দুরদর্শী ছিলেন না। সুলতান সেসব সেনাধ্যক্ষকেই বিজিত এলাকার আইন-শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণসহ সার্বিক প্রশাসনিক দায়িত্বে নিয়োগ করেছিলেন।

থানেশ্বর রাজ্যের সেনাধ্যক্ষ ছিলেন বাহরাম গৌড় আর শহরের গভর্নর প্রশাসক ছিলেন কুতুব গোজাক। কুতুব গোজাক এ-ই প্রথম হিন্দুস্তানে এসেছিলেন। এখানকার প্রতিটি জিনিসই তার মনে বিশ্বয় সৃষ্টি করতো। তিনি যখন দেখলেন, দু'টি মেয়েকে দু'টি আসনে বসিয়ে সেই আসনগুলোকে মানুষশূন্য করে ফেলা হলো এবং কিছুক্ষণ পর সেই জায়গায় আবার সেই তরুণীদেরকেই গায়েব থেকে হাজির করা হলো, তাতে তিনি খুবই বিশ্বিত হলেন। গজনীর নারীরাও ঝুপ-সৌন্দর্যে কম ছিলো না কিন্তু তার কাছে হিন্দুস্তানের নারীদের ঝুপ-লাবণ্য দারুণ আকর্ষণীয় মনে হলো। তাকে জানানো হলো, হিন্দুস্তান আসলেই কারামত ও জাদুর দেশ। এখানে নির্দিষ্ট করে বলা মুশকিল কোন্টা সত্যিকার কারামত আর কোন্টা জাদু। কুতুব গোজাকের কাছে সবচেয়ে বেশি আশ্চর্যজনক লাগলো, এখানকার লোকজন সাপপূজা করে এবং নারীরা তাদের দুধ সাপকেও পান করায়।

একদিন সাত-আটজনের একটি মুসাফির সন্ধ্যাসীদল চার-পাঁচজন তরুণী নিয়ে থানেশ্বর মন্দিরে পূজা দিতে এলো। সন্ধ্যাসীদের সবার গলা থেকে পায়ের

টাখনু পর্যন্ত সাদা কাপড়ে আবৃত । তরুণীরাও সাদা কাপড়ে আবৃত । কিন্তু খুব হাঙ্কা ওড়না দিয়ে তাদের মাথা ঢাকা । সব কজন তরুণীরই চুল হাঙ্কা বাদামী, চোখ নীলাভ, গায়ের রঙ শ্যামল-রাঙা মিশেল । সবার গড়ন ও চালচলন এক ধরনের । পুরুষদের সবারই দাঢ়ি আছে, তবে মাত্র একজনের দাঢ়ি সাদা ।

সন্ধ্যার পর এই অভিযাত্রীদল যখন থানেশ্বর দুর্গে প্রবেশ করছিলো, তখন তাদের সবাইকে দেখে অতি ধর্মপরায়ণ সাধু-সন্ন্যাসী ও সংসার বৈরাগীই মনে হচ্ছিলো । তারা দুর্গের ফটকে এসে দুর্গপতির সাথে সাক্ষাতের আবেদন করলো । তারা আবেদনে জানালো, তাদের সাথে কয়েকজন তরুণী আছে । এ জন্য তারা সরাইখানায় থাকতে ভয় পাচ্ছে । তারা দুর্গপতির সাথে সাক্ষাত করে একটা নিরাপদ জায়গায় রাত্যাপনের অনুমতি চায় । তাদের আবেদন মানবিক বিবেচনা করে দুর্গপতির সাথে সাক্ষাতের অনুমতি দেয়া হলো । মুসাফিরদল দুর্গপতির কাছে যেতে দেখে সেনাধ্যক্ষ বাহরাম ও তার ডেপুটি ও তাদের দেখার জন্য দুর্গপতির দফতরের দিকে রওনা হলেন ।

এ লোকগুলোর পোশাক-পরিচ্ছদ তেমন আশ্চর্যকর ছিলো না । আশ্চর্যের বিষয় ছিলো, এই দলের পুরুষরা যেমন ছিলো সুন্দর, তার চেয়েও বেশি সুন্দর ছিলো তরুণীরা । তবে সবচেয়ে বিস্ময়কর ছিলো পুরুষদের মধ্যে সাদা দাঢ়িওয়ালা লোকটির গলায় একটি সাপ পেঁচানো ছিলো । সাপটি ফণা তুলে কখনো লোকটির মাথার উপর, কখনো চেহারায় উঁকি-ঝুঁকি মারছিলো । পুরুষদের সবার কাছেই ছিলো একটি করে সুন্দর লাঠি । প্রত্যেক লাঠির মাথায় সুতার তৈরি দড়ি পেঁচানো ছিলো । সেসব দড়িতে ছোট ছোট ঘুঙ্গুর বাঁধা ছিলো । তরুণীদের হাঁটার তালে তালে ছোট ঘুঙ্গুরগুলো এক ধরনের বাজনা সৃষ্টি করছিলা, যেনো কোনো ঝরনার পানি পাথরে আঘাত খেয়ে খেয়ে নিচের দিকে গড়িয়ে পড়ছে ।

দুর্গশাসক কুতুব গোজাক অভিযাত্রীদলকে সসম্মানে বসালেন । কারণ, তাদের পোশাক-পরিচ্ছদ দেখে তার কাছে সম্মানি শ্রেণীর লোক মনে হচ্ছিলো ।

“আমরা আপনার কাছে আসবার সাহস করতাম না; কিন্তু আমরা জানতে পেরেছি, আপনি একটি ভ্রান্ত ধর্মের বিরোধী । বাতিল নির্মূলে আপনাদের

প্রয়াসের জন্য আমরা আপনাদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আপনি নিশ্চয়ই অনেক বড় মাপের ও অভিজ্ঞত বৎশের লোক।” বললো সাদা দাঢ়িওয়ালা সন্ন্যাসী।

“আপনাদের ধর্ম কী?” সেনাধ্যক্ষ বাহরাম জিজ্ঞেস করলেন।

“আমরা সাপের পূজারী।” বললো সাদা দাঢ়িওয়ালা। “অবশ্য সাপের পূজা করলেও আমরা এক আল্পাহতে বিশ্বাস করি। আমার পূর্বপুরুষ ছিলেন সেই সব লোক, যারা বাদশাহ সিকান্দরের সাথে মহাভারতে এসেছিলেন। তাদের সম্পর্কে এই জনশ্রুতি আছে যে, তারা একটি বিশাল নাগকে খোজ করতেন, যে নাগের দেখা তারা ভারতের বাইরে কোথাও পাননি। কিন্তু হিন্দুস্তানে এসে তারা কঙ্কিত নাগের দেখা পান। ফলে তারা সেকান্দরের সেনাবাহিনী থেকে বিছেন্ন হয়ে পড়েন এবং শীর্ষ নাগের পেছনে দৌড়াতে থাকেন। বলা হয়ে থাকে, প্রত্যু তাদেরকে মুকুটধারী সেই নাগ দিয়েছিলেন। সেই নাগের রঙ ছিলো লাল-সোনালী। তার মাথায় ছিলো টুপির মতো ফুল এবং একটি কালো নাগের উপরে সেই নাগটি আরোহণ করেছিলো।... মুকুটধারী নাগ দৌড়ে পালাতে থাকলে আমাদের পূর্বপুরুষদের কয়েকজন নাগের পিছু ছুটতে থাকলো। এক পর্যায়ে নাগ এমন দুর্গম এলাকায় চলে গেলো, যেখানে কোনো মানুষের পক্ষে পৌছা সম্ভব ছিলো না। গঙ্গা নদীর একটি শাখা নদী প্রবাহিত হচ্ছিলো এই এলাকা দিয়ে। নদীর উপরে একটি প্রাকৃতিক পুল ছিলো। বন্তুত সেটি ছিলো নদী প্রস্তের সমান বড় একটি পাথর। কিন্তু পাথরটি ছিলো খুব সরু এবং ধারালো। সেই পাথরের নিচ দিয়ে প্রবাহিত পাহাড়ি নদীটি ছিলো খুবই স্ন্যাতকীয় এবং গভীর। নাগ সেই পুলের উপর দিয়ে চলে গেলো। চার অনুসরণকারীও তার পিছু নিলো। তন্মধ্যে দু’জন পা পিছলে পড়ে গেলে তারা খরস্নাতা নদীর প্রাতে ভেসে গেলো আর দু’জন তীরে পৌছতে সক্ষম হলো। নদীর এপারটি ছিলো নাগদের বসতি। খুবই সুন্দর ও মনোমুগ্ধকর এলাকা। আমাদের দুই পূর্বপুরুষ সেখানেই পরবর্তীতে বসতি স্থাপন করেন। সেখান থেকেই এসেছি আমরা। সাপদের সাথেই আমাদের বসবাস। সাপই আমাদের ধ্যান-জ্ঞান।”

“সাপকে কি আপনারা উপাস্য মনে করেন?” জিজ্ঞেস করলেন প্রশাসক।

“না, আমরা প্রতুকেই প্রতু মানি। কিন্তু সাপকে আমরা এ জন্য পূজা করি যে, এই সাপ আমাদের ও প্রতুর মধ্যে সেতুবন্ধনের কাজ করে। সাপ যেমন শয়তানি করতে পারে, তদ্বপ ফেরেশতার কাজও করতে পারে। লোহা ও

পাথরকে সাপ স্বর্ণে পরিণত করতে পারে। কোনো সাপের যদি একশ' বছর বয়স হয়ে যায় তাহলে তার শরীরে এমন একটি টুকরো তৈরি হয়, যা হীরার মতো চমকাতে থাকে। কেউ সেটিকে বলে মনসা, কেউ বলে মণি। সাপ সেটিকে সবসময় মুখের ভেতর রাখে। অনেক সময় নাগ সাপ সেই মনসা কিংবা মণিকে নিয়ে খেলা করে, বাতাসে উড়িয়ে দেয় আবার ঝাপ দিয়ে ধরে ফেলে। সেই মণিকে যদি আপনি লোহার টুকরোয় স্পর্শ করেন, তাহলে লোহাও সোনা হয়ে যাবে। সেটি যদি আপনার তরবারীতে স্পর্শ করা যায়, তাহলে তরবারীও সোনায় পরিণত হবে। কিন্তু কোনো মানুষ আজো সেই সর্পমণি অর্জন করতে পারেনি। মণি মুখে নিয়ে সাপ রাতে ঘুমোতে পারে না। সাপ মণিটি মুখ থেকে বের করে মাটিতে রেখে ঢেকে দিয়ে তারপর ঘুমোয়। শত বছরে এ ধরনের মণিওয়ালা সাপ দু'একটি জন্মে। কিন্তু শোনা গেলেও এ পর্যন্ত কেউ মণিওয়ালা সাপের দেখা পায়নি। সেই সাথে সাপের মণিও কেউ অর্জন করতে সক্ষম হয়নি। হিন্দুতানে একথা প্রচলিত আছে যে, যে সেই সাপের মণি অর্জন করতে পারবে, সে সারা হিন্দুতানের রাজত্ব লাভ করবে। শীর্ষ নাগও তার আনুগত্য স্বীকার করবে। তখন তার রাজমহল, তার রাজদুর্গ সব সাপে পাহারা দেবে। তখন সে দুনিয়ার সবচেয়ে বড় শাসক হিসেবে অভিহিত হবে।”

“আপনি কিংবা আপনার পূর্বপুরুষদের কেউ কি সেই নাগের সর্পমণি দেখেছেন?” জিজ্ঞেস করলো সেনাধ্যক্ষ বাহরাম।

“না, দেখিনি। আমাদের এলাকায় মণিওয়ালা সাপ আছে; সে কিন্তু যেখানে থাকে সেখানে আমাদের কারো যাওয়ার অনুমতি নেই। কেউ সেখানে যাওয়ার দুঃসাহস করে না। সাপ কোথায় থাকে, সেই জায়গাটি আমরা চিনি; কিন্তু সেখানে যাওয়া খুবই ঝুকিপূর্ণ। আমাদেরকে বলা হয়েছে, ওখানে বিচ্ছিন্নভাবে স্বর্ণ পড়ে রয়েছে। হীরা, মোতি, পান্নার স্তূপ সেখানে। আমাদের পুরোহিত বলেছেন, ওখানকার মেয়েদেরকে দেখে কেউ বিশ্বাসই করবে না এরা মর্তের কোনো মানুষ। সেইসব সুন্দরী রংগীনের কথা জগতের অনেকেই জানে; কিন্তু তারা বিশ্বাস করে ওখানকার রংগীরা নাগিনী, মানুষ নয়। আসলে সে কথা ঠিক নয়। আসলে এরা আমাদেরই বংশজাত। কিন্তু এরা অত্যধিক সুন্দরী হলেও খুবই দুর্ভাগ। জীবনের একটা সময় পর্যন্ত তারা খুবই উচ্ছল থাকে বটে; কিন্তু এক পর্যায়ে নির্জীব হয়ে যায়। কারণ, তারা জীবনে কখনো পুরুষের সান্নিধ্য পায় না।”

সাদা দাঢ়িওয়ালা লোকটি এমনই জানুময় ভঙ্গিতে বপ্পুরী নাগের কথা বলছিলো যে, দুর্গপতি কৃতুব গোজাক, সেনাধ্যক্ষ বাহরাম ও তার ডেপুটি রঞ্জনশ্বাসে তা শনতে লাগলো এবং বিস্তরে তাদের গায়ের পশম খাড়া হয়ে গেলো। তাদের সামনেই উপবিষ্ট ছিলো চার তরুণী। তাদের ঠোঁটে ছিলো শ্রিত হাসির আভা। গজনীর এই শাসকরা তরুণীদের ঝপ-সৌন্দর্য দেখে হতবাক হয়ে গিয়েছিলো। তারা ভেবেই পাছিলো না, এদের চেয়েও আরো সুন্দরী কোনো মানুষ হতে পারে! তারা যেহমানদের খুবই খাতির-যত্ন করলো এবং তাদের জন্য রাজকীয় থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করলো।

এক পর্যায়ে সবাই ঘুমোনোর জন্য চলে গেলো। কিন্তু সাদা দাঢ়িওয়ালাকে দুর্গশাসক কৃতুব গোজাক তার কাছে বসিয়ে রাখলো। সে বৃক্ষ থেকে সেই নাগের রাজ্যের গোপন রহস্য জানতে চেষ্টা করতে লাগলো। সাদা দাঢ়িওয়ালা কৃতুব গোজাককে বললো, “সারা হিন্দুস্তানের রাজত্বের ভেদ লুকিয়ে রয়েছে নাগের দেশে। যেখানে অপরিচিত কারো পক্ষে যাওয়া সম্ভব নয় এবং কেউ যাওয়ার দুঃসাহসও দেখাতে পারে না।”

“আচ্ছা, কারো পক্ষে কি সেখানে পৌছা সম্ভব নয়?” খুব মনোযোগ দিয়ে ঝুঁকে জিজ্ঞেস করলো কৃতুব। “আমার ধন-দৌলতের কোনো প্রয়োজন নেই। আপনি দেখতেই পাচ্ছেন, আমি বুড়ো হয়ে গেছি। আমি শুনেছি, হিন্দুস্তানের পাহাড়ী অঞ্চলে এমন গাছ-গাছড়া রয়েছে, যা সেবন করলে...।”

“হ্যাঁ, যা বার্ধক্যকে প্রতিরোধ করে...।” কৃতুব গোজাকের অসমাপ্ত কথা বলে দিলো সন্নাসীরূপী সাদা দাঢ়িওয়ালা। “আমাকে দেখুন, আমার দাঢ়ি সাদা হয়ে গেছে, বয়সও একশ’ পেরিয়ে গেছে। কিন্তু আমার শরীরে হাত দিয়ে দেখুন, এখনো কেমন শক্তি-সামর্থ্য রয়েছে। আপনি ঠিকই শুনেছেন। আমাদের এলাকায় এমন গাছ-গাছড়া রয়েছে, যেগুলোতে সাপের বিষ মিশ্রিত রয়েছে, যেগুলো বার্ধক্যকে প্রতিরোধ করে। সেইসব গাছ আমরা চিনি। সেগুলোতে এমন সব শুণ রয়েছে, যে শুধু বার্ধক্যকেই রোধ করে না, জীবনকেও দীর্ঘস্থায়ী করে।”

কৃতুব গোজাক ভাবছিলো, এ লোকের কাছ থেকে সে একাই রহস্য উদঘাটন করছে। কিন্তু এদিকে যুবক সামর্থ্যবান সেনাধ্যক্ষ বাহরাম সেই দলের একজন পুরুষ ও একজন তরুণীকে তার কক্ষে নিয়ে জানতে চাচ্ছিলো, তারা

কি তাদের সেই বিশ্বয়কর এশোকায় তাকে নিয়ে যেতে পারে? কিন্তু দলের পুরুষ লোকটি তাকে বলছিলো, তারা তাদের দলের সাথে এবং এশোকার গোপন রহস্য ফাঁস করে দেয়ার মতো গান্ধীরী করতে পারে না। পুরুষ লোকটি কথা বলতে বলতে একটা অজুহাত খাড়া করে সেনাধ্যক্ষের কক্ষ থেকে বেরিয়ে গেলো। তরুণী একাকী সেনাপতির কক্ষে রয়ে গেলো। তরুণী মনোহরী ভঙ্গিতে হাসছিলো। সেনাপতি তার সাথেও আলাপ জুড়ে দিলো। তরুণী সেনাপতিকে বললো, “জীবনে আপনার মতো এমন সুদর্শন সুপুরুষ আমি কখনো দেখিনি।”

“তুমি তো বেহেশতে থাকো।” তরুণীকে বললো সেনাপতি বাহরাম।

“সেটি জান্নাত নয়, জাহান্নাম। সেখানে নারীর আবেগের কোনো মূল্য নেই। যৌবনকে যেখানে গলা টিপে হত্যা করতে হয়, তা জাহান্নাম বৈ আর কি। আমাদের জীবন তো ওইসব সন্ন্যাসীদের সাথেই কাটাতে হয়, যাদের কোনো প্রাণ-মন বলতে কিছু নেই। আমাদের তো নারীত্ব নিয়ে বেঁচে থাকতে ইচ্ছে করে।” তরুণী বললো।

তাদের কথাবার্তা এমন এক পর্যায়ে গিয়ে শেষ হলো, যেখানে দু'টি ভিন্ন সম্ভা থাকলেও মনোদৈহিক দিক থেকে একাত্ম হয়ে যায়। তরুণী যখন সেনাপতির প্রতি আবেগপূর্ণ প্রেম-ভালোবাসা প্রদর্শন করলো, তখন সেনাপতি বাহরাম তাকে বললো, “আচ্ছা বলো তো, সাপের মণির কাহিনী কতটুকু সত্য?” তরুণী তাকে বললো, “আমার পক্ষে আপনাকে সঙ্গ দিয়ে ওখানে নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়; কিন্তু আমি আপনাকে পথের অবস্থা বলে দিতে পারি।” বস্তুত তরুণী সেনাপতিকে পথের দিক-নির্দেশনা দিচ্ছিলো আর সেনাপতি বাহরাম খান একটি কাগজে সাপের দেশের নকশা এঁকে নিচ্ছিলো।

“আপনার কাছে বিপুল পরিমাণ তীর থাকতে হবে। কারণ, এই পথে সাপের খুব উৎপাত। বিপদ দেখলেই যাতে তীর দিয়ে আপনি সাপ মেরে ফেলতে পারেন। আমি আপনাকে যে সুডং পথের কথা বলছি, সেটির উপরে একটি বিশাল অজগর কুণ্ডলী পাঁকিয়ে বসে থাকে। সেটির মাথায় তীর লাগলেই মরে যাবে। কিন্তু শরীরে তীর লাগলে আপনার পক্ষে প্রাণ নিয়ে বেঁচে আসা মুশকিল হবে। সুডং পথটি খুবই দীর্ঘ। আপনি সেটি অতিক্রম করলে একটি সুন্দর ঝর্না দেখতে পাবেন। সেই ঝর্নার তীরেই আপনি ওই সাপের

দেখা পাবেন। সেখানে সর্পরাজ মণি নিয়ে খেলা করতে থাকে। সেটি আপনি তীর দিয়ে মেরে ফেললেই মণি আপনার হাতের মুঠোয় এসে যাবে।”

“তখন তোমাকে আমি কোথায় পাবো?”

“আমাকে পেয়ে যাবেন।” চোখে চোখ রেখে ভুবনমোহিনী হাসি দিয়ে বললো তরুণী।

পরদিন প্রত্যুষেই নাগেশ্বরের কাহিনী রচনাকারী সন্ধ্যাসীদল থানেশ্বর দুর্গ থেকে চলে গেলো। তারা রেখে গেলো নাগরাজ্যের বিশ্বাকর আব্যান।

সকালে কৃতুব গোজাক তার একান্ত নিরাপত্তারক্ষীদের থেকে দু'জনকে ডেকে পাঠালেন। এই দু'জন ছিলো তার দৃষ্টিতে সবচেয়ে বিশ্বস্ত এবং দৃঃসাহসী বীরযোদ্ধা। তাদের ডেকে তিনি বললেন, “শোনো! শাসক হিসেবে আমি তোমাদের ডেকে পাঠাইনি, একান্ত বিশ্বস্ত বন্ধু হিসেবে তোমাদের ডেকেছি আমি। তোমরা যদি আমাকে একটি কাজ করে দিতে পারো, তাহলে তোমাদেরকে আমি পদোন্নতি দিয়ে গজনী পাঠিয়ে দেবো। আর তোমরা যদি সেনাবাহিনী থেকে অবসর নিতে চাও, তাহলে অবসর দিয়ে দেবো। তবে তোমাদেরকে এখান থেকে বিদায় করার সময় এমন সোনাদানা-কড়ি দিয়ে দেবো যে, তোমাদের সাত পুরুষ সুখে-শাস্তিতে আরাম-আয়েশে জীবন কাটাতে পারবে। তবে শর্ত হলো, তোমাদেরকে আমি এমন এক জায়গায় পাঠাছি, যেখানকার রহস্যের কথা পৃথিবীর কাউকে জানাতে পারবে না। আমি তোমাদেরকে বিশেষ এক পোশাকে একটি বিশেষ জায়গায় পাঠাবো।”

উভয়েই প্রতিশ্রুতি দিলো, তারা তাদের মিশনের খবর কাউকে জানাবে না। কৃতুব গোজাক তাদের সামনে একটি চিত্র রেখে তাদের গতিপথ বোঝাতে লাগলো। সৈন্য দু'জন যতোই রাজ্ঞার ভয়াবহতার কথা শুনতে লাগলো, বিশ্বয় ও আশ্চর্যে তাদের চেহারা ফ্যাকাশে হতে লাগলো।

“গত রাতে সাদা চাদর পরিহিত সন্ধ্যাসীরূপী একদল মুসাফিরকে আমার দফতরে হয়তো আসতে দেখেছো। ওই পথ দিয়ে পাহাড়ী নদী অতিক্রম করলেই সেই দলের সাদা দাঢ়িওয়ালা লোকটির দেখা পাবে তোমরা। তাকে পেয়ে গেলে তোমাদের কাজ সহজ হয়ে যাবে। সে তোমাদেরকে একটি গাছের শিকড় এবং প্রচুর সোনাদানা দেবে। সেগুলো নিয়ে তোমরা সোজা আমার কাছে চলে আসবে। গাছের শিকড়টা আমাকে দিয়ে দিবে আর সোনাদানা তোমরা নিয়ে নিবে।”

“সেই গাছের শিকড়টি কেমন?” জানতে চাইলো এক সৈনিক।

“সেটি এমন এক গাছের শিকড়, তা খেতে পারলে তুমি শত বছরেরও বেশি বাঁচতে পারবে এবং মৃত্যু পর্যন্ত শরীর থাকবে শক্ত-সামর্থ, টগবগে যুবকের মতো।”

সৈনিক দু'জন এ কথা শনে পরম্পর ঢোখাঢোখি করলো। ভাবখানা এমন যে, সোনাদানার চেয়ে এই শিকড়ের প্রতিই তাদের বেশি আগ্রহ।

“আমার নিজেরই যাওয়ার কথা ছিলো। সেই সন্ন্যাসী আমাকেই যেতে বলেছিলো। কিন্তু তোমরা তো জানো, দুর্গশাসকের পক্ষে এতো দীর্ঘ সময় দুর্গের বাইরে থাকা উচিত নয়। কিন্তু আমার এই ক্ষমতা আছে, তোমাদের দু'জনকে যতো সময়ের জন্য ইচ্ছা বাইরে পাঠাতে পারি।”

গত রাতে সেনাপতির কক্ষে তরুণী যখন নাগের দেশে যাওয়ার পথের কথা বলেছিলো, তখন সাদা দাঢ়িওয়ালা সন্ন্যাসীরপী লোকটি দুর্গশাসককে পথনির্দেশ দিলেছিলো এবং তাকে সশরীরে যাওয়ার প্রস্তাব করেছিলো। সাদা দাঢ়িওয়ালা কুতুব গোজাককে এ কথাও বলেছিলো, আপনি আমাকে যে ইঞ্জিন ও সশান করেছেন, এর পরিবর্তে আপনাকেও চির যুবক থাকার ওযুধ ও সোনাদানা উপচৌকন দেবো।

\* \* \*

সর্পনাগের পূজারীরা চলে যাওয়ার পর সেনাপতি বাহরাম তার ডেপুটিকে বললো, “তুমি যদি না যাও, তবে আমি নিজেই যাবো। আমরা দু'জনের মধ্যে যে কোনো একজন বাইরে থাকলেও এ কথা বলা যাবে যে, বাইরে সেনাটোকিশুলো দেখার জন্য গেছে। মেয়েটি আমাকে পথ বলে দিয়েছে। তুমি ভাবতে পারো, আমরা যদি সেখানে যেতে পারি, তাহলে আমাদের অবস্থান কোথা থেকে কোথায় চলে যাবে। এ কাজে আমাদের পারম্পরিক সহযোগিতা দরকার। হয় তুমি যাও, নয়তো আমি যাবো। চার-পাঁচজন চৌকস সৈন্য সাথে নিতে হবে।”

“মাননীয় সেনাপতি! আপনি কি দৃঢ় বিশ্বাস করে ফেলেছেন যে, ওই লোকটি যা বলেছে তা সর্বেব সত্য?” সন্দেহ প্রকাশ করলো ডেপুটি সেনাপতি।

“আপনি কি ভেবেছেন, মেয়েটি এমন কঠিন রহস্যের কথা কেনো আপনার কাছে প্রকাশ করে দেবে?”

“হ্যাঁ, ভেবেছি। ভেদ বলে দেয়ার কারণ হলো, আমাকে দেখে তার এতোটাই ভালো লেগেছে যে, নিজের উপর তার নিয়ন্ত্রণ নেই। সে আমাকে পাওয়ার জন্য আঞ্চলিক হয়ে গেছে। সে একান্তভাবে চায় আমি তাদের রহস্য ভেদ করে সোনাদানা কজা করে নিই এবং তাকে নিয়ে ঘর-সংসার করি।”

“কিন্তু আমার সন্দেহ হয় লোকগুলো তাদের তরঙ্গী মেয়েদের নিরাপত্তার জন্য রাত কাটানোর জন্য এসব উদ্ভিট গল্প ফেদেছিলো।” বললো ডেপুটি সেনাপতি। “এরা আপনাদের ধোকা দিয়ে নির্বিবাদে রাত কাটিয়ে চলে গেছে।”

“তুমি আমায় সঙ্গ দেবে কিনা তাই বলো?” বললো সেনাপতি। “তোমাকে আমি অধীনস্ত মনে করে নয়, বস্তু মনে করে আমার একান্ত বিষয়ে তোমাকে অংশীদার করেছিলাম। ওখান থেকে আমি যদি কিছু নিয়ে আসতে পারি, তাতে তোমারও অর্ধেক থাকবে। আচ্ছা বলো তো, ঘরবাড়ি আপনজন থেকে দূরদেশে হত্যা আর খুন্দুনিতেই জীবনটা শেষ করে দেয়াই কি আমাদের বিধিলিপি? এসব হচ্ছে রাজা-মহারাজা ও সুলতানদের বাগড়া। যদ্ব করে যেসব ধন-রত্ন পাওয়া যায়, তাতে তাদের আরাম-আয়েশ বাঢ়ে। তারা যুক্তে আমাদের জীবন বিপন্ন করে আমাদের রক্তের বিনিময়ে রাজা-বাদশাহ হচ্ছে। মৃত্যু-বিভীষিকা থেকে নিজের জীবনটাকে উদ্ধার করে কিছুটা আরাম-আয়েশ করার অধিকার কি আমাদের থাকতে পারে না?”

সেনাপতি বাহরাম যখন তরঙ্গীদের রূপ-সৌন্দর্যের কথা শুরু করলো, তখন ডেপুটি সেনাপতিরও চোখ চমকে উঠলো। সেনাপতি ডেপুটিকে বললো, “তুমি চিন্তা করো না। তুমি না গেলে আমিই যাবো। আমি হয়তো আমার জীবনকে ঝুঁকিতে ফেলে দিচ্ছি। আমার অনুপস্থিতিতে তোমার প্রধান কাজ হবে আমার অনুপস্থিতির কারণ গোপন রাখা। তুমি আমার অনুপস্থিতির ব্যাপারে বলবে, দূরে অবস্থিত আমাদের বিভিন্ন সেনাটোকিগুলো পরিদর্শন করে সেগুলোকে আরো কার্যকর করার জন্য আমি পরিদর্শনে বেরিয়েছি। প্রশাসক আমার এ কাজে কোনো বাধা দেবে না। তোমার দ্বিতীয় কাজ হবে, দৃশ্যত আমাদের উপর আক্রমণ হওয়ার আশংকা নেই, তবুও নিশ্চিতে থাকা উচিত

নয়। কারণ, আমরা শক্তবেষ্টিত অবস্থায় রয়েছি। শক্ত থেকে কখনো নিশ্চিন্ত  
হওয়া যায় না। যদি কোন কারণে শক্তিরা দুর্ব আক্রমণ করে, তাহলে দুর্গ রক্ষার  
জন্য তুমি জীবন বাজি রাখবে। তাহলে সৈন্যরা আর আমার অনুপস্থিতির  
ঘাটতি অনুভব করবে না।”

ডেপুটি সেনাপতি সেনাপতি বাহরামের প্ররোচনায় সায় দিয়ে দিলো। সে  
এই গোপন রহস্য গোপন রাখার প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করলো। তার সামনে এখন  
সমস্যা হয়ে দেখা দিলো সেনাপতির ক'জন সহচর নির্বাচন। কারণ,  
সোনা-কৃপার লোভে যে কোনো সিপাহী এ অভিযানে যেতে এবং বিষয়টি  
গোপন রাখতে রাজি হবে; কিন্তু বিপুল ধন-রত্ন হাতিয়ে নিতে এরাই আবার  
ব্যবহ সেনাপতিকেই হত্যা করে বসতে পারে। এমনও হতে পারে, তারা  
নিজেরাও খুনাখুনিতে জড়িয়ে পড়বে। নানা কারণে সেনাপতির জন্য চারজন  
সফরসঙ্গী নির্বাচনে ডেপুটিকে খুবই চিন্তায় ফেলে দিলো। অনেক ভেবে-চিন্তে  
তার বিশেষ ঝটিকা বাহিনী থেকে চার সিপাহীকে নির্বাচন করলো ডেপুটি  
সেনাপতি।

তারা মনে করেছিলো, তারা দু'জন ছাড়া এই গোপন রহস্যের ব্যাপারটি  
আর কেউ জানে না এবং সেই সর্পরাজ্যে যাওয়ার পথও জানা নেই আর  
কারো। এদিকে সাদা দাঢ়িওয়ালা ব্যক্তি দুর্গশাসককেও সর্পরাজ্যে যাওয়ার  
পথের কথা বলে গিয়েছিলো। হত্যৌবন ফিরে পাওয়ার ওষুধের জন্য দুর্গশাসক  
দু'জন বিশ্বস্ত সেনাকে পাঠানোর প্রস্তুতি নিছিলো। তার কাছেও বিষয়টি গোপন  
রাখাই ছিলো প্রধান সমস্যা। সেও এই আত্মপ্রবর্ধনায় মুঝ ছিলো যে, সে ছাড়া  
আর কেউ এই গোপন রহস্যের কথা জানে না।

সাদা দাঢ়িওয়ালা সন্ন্যাসী তার দলবল নিয়ে অতি প্রত্যুষে দুর্গ ত্যাগ করে  
চলে যায়। তরুণীদের বহনের জন্য হাওদাওয়ালা উট ছিলো। আর কাফেলার  
পুরুষরা সফর করছিলো ঘোড়াগাড়ীতে। সন্ন্যাসীদের কাফেলা যখন শহর  
অতিক্রম করছিলো, তখন তাদের দেখার জন্য পথে পথে বহু লোক জমায়েত  
হতে শুরু করছিলো। এক পর্যায়ে দর্শনার্থীদের ভিড় ঠেলে থানেশ্বর শহর  
পেরিয়ে গেলো সন্ন্যাসীদল। শহর ছেড়ে সন্ন্যাসীদের দলনেতা গাড়িচালকদের  
বললো, ফেরার পথেও মুসলমানদের সেনাচৌকির দিকে নজর রেখো। কোনো  
চৌকির ধারে-কাছে যেয়ো না। তুমি তো জানো, ওদের চৌকি কোন্ কোন্  
জায়গায় রয়েছে।

দুপুরের দিকে সন্ন্যাসী কাফেলা একটি জঙ্গলময় বিরান ভূমিতে পৌছলো। দূর-দূরাত্ত পর্যন্ত সেখানে কোনো লোকালয় ছিলো না। তাহাড়া এলাকাটি ছিলো খুবই দুর্গম। মাঝে-মধ্যে টিলা, ঝোপঝাড় আর উঁচু-নিচু। একটি সুবিধা মতো জায়গা দেখে সন্ন্যাসীদের দলনেতা যাত্রা বিরতি দিয়ে বিশ্রামের জন্য থেমে গেলো। তরঁণীরা উটের উপরের হাওদা থেকে নেমে এলো। ঘোড়াগুলোর বাঁধন খুলে দেয়া হলো। মাটির উপর মাদুর পেতে সবাই বসলো। কাফেলার সবাই ছিলো খুবই খুশি। তরঁণীরা তো উজ্জ্বাসে মেতে উঠেছিলো। দলের অন্যরা তরঁণীদের উজ্জ্বাস-আনন্দ দেখে হাসছিলো।

“আচ্ছা, আমরা যে শিকার বধ করতে পেরেছি, তা কীভাবে বোঝা যাবে?”  
দলপতির কাছে জানতে চাইলো এক তরঁণী।

“থানেশ্বরে আমাদের লোকজন আছে। দুর্গের ভেতরেও আছে আমাদের গোয়েন্দা।” বললো দলনেতা সাদা দাঢ়িওয়ালা সন্ন্যাসী। “দুর্গশাসক ও সেনাপতি যদি আমাদের বাতানো পথে অগ্রসর হয়, তাহলে আমাদের লোকেরা তাদের অনুসরণ করবে। তারা যদি নিশ্চিত হয় যে, এরা আমাদের বলা পথেই অগ্রসর হচ্ছে, তাহলে কোন্ কোন্ জায়গায় খবর পৌছাতে হবে, সে ব্যাপারে তারা জানে।”

“যে সেনাপতির কাছে আমাকে পাঠানো হয়েছিলো, সে তো আমার কথা শনে অভিভূত হয়ে পড়েছিলো।” বললো এক তরঁণী।

“ওরা কী করবে সে নিয়ে তোমাদের দুচিন্তা করার দরকার নেই। ওরা যা-ই করুক, সেটি হবে আমাদের জন্য সহায়ক। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, থানেশ্বর মন্দির অঞ্চলেই আমাদের হাতে ফেরত আসবে।”

হঠাতে করে কাফেলার একজন উৎকর্ণ হয়ে বললো, “মনে হয় আমার কানে ঘোড়া দৌড়ের আওয়াজ ভেসে আসছে।”

“এখানে কে আসবে; আমাদের ঘোড়াগুলোরই আওয়াজ হবে হয়তো।”  
সান্ত্বনা দিলো একজন।

এ ব্যাপারে আর কেউ মনোযোগ দিলো না। অথচ তা তাদের ঘোড়ার আওয়াজ ছিলো না। সন্ন্যাসী কাফেলাটি থানেশ্বর পেরিয়ে বিজন ময়দানে প্রবেশ করলে একটি ঝোপের আড়াল থেকে তাদের পর্যবেক্ষণ করছিলো এক বালক। তখন উটের হাওদাগুলোর পর্দা উঠানো ছিলো। ফলে ভেতরে বসা তরঁণীদের

স্পষ্ট দেখতে পেয়েছিলো বালকটি। বালক ঘোড়াগাড়ীতে আরোহীদেরও গভীর দৃষ্টিতে দেখে বুঝতে পারলো এই অভিযানী দল অত্যন্ত দামী। সে বিপরীত দিকে দৌড়ে কোথায় যেনো হারিয়ে গেলো।

দশ-বারোজনের একটি অপেক্ষমান কাফেলার কাছে গিয়ে থামলো বালকটি। কাফেলার লোকেরা তখন মাটিতে শুয়ে গড়াগড়ি দিয়ে আরাম করছিলো। অদূরেই তাদের ঘোড়াগুলো বাঁধা ছিলো। বালকটি গিয়ে তার দেখা কাফেলার কথা বললো এবং জানালো কাফেলাটি কোন্দিকে যাচ্ছে। তাদের মধ্য থেকে এক যুবক বালকটিকে সাথে নিয়ে কাফেলার অবস্থা জানার জন্য অগ্রসর হলো। তারা পাহাড়ী টিলা ও ঝোঁপঝাড়ের আড়ালে আড়ালে এগিয়ে কাফেলা দেখে বালকের পিঠ চাপড়িয়ে ফিরে এলো। সে এসে অন্যদের বললো, “শিকার খুবই মূল্যবান।” তাদের কেউ কেউ বললো, “কাফেলা কোন্দিকে যায়, তা দেখে ওদের পিছু পিছু অগ্রসর হও। রাতের বেলায় ওদের উপর হামলা করো।” আরেকজন বললো, “রাত-দিন বাদ দাও। আমাদের জন্য সবই সমান। শুধু খেয়াল রাখো, আশপাশে যেনো কোনো সেনাচৌকি না থাকে। কোনো সেনাচৌকিতে আওয়াজ চলে গেলে সৈন্যরা এসে আমাদের সবাইকে হত্যা করবে; কারো পালানোর সুযোগ থাকবে না।”

“হতভাগা মুসলমান সৈন্যরা তো আমাদের জীবন বিপন্ন করে ফেলেছে।” দলনেতা বললো। “এ জন্য আমরা হিন্দু রাজা-মহারাজাদের শাসনই বেশি পছন্দ করি। তারা রাজধানীর বাইরের লোকদের কোনো পরোয়াই করে না। অথচ গজনীর লোকেরা তো জঙ্গলেও শাসন জারি করেছে। আগে জঙ্গল ছিলো সম্পূর্ণ আমাদের নিয়ন্ত্রণে। যাক, চলো এখনই কাফেলাকে লুটে নিই। আশপাশে কোনো সেনাচৌকি নেই।”

আসলেও তাদের ধারে-কাছে কোনো সেনাচৌকি ছিলো না। কিন্তু গজনী বাহিনীর সাত-আটজন সৈনিক দূরবর্তী একটি চৌকি থেকে থানেশ্বর ফিরে যাচ্ছিলো। তারা ছিলো অশ্঵ারোহী। খুব নিশ্চিতে গল্ল-স্বল্প করে তারা ধীর-স্থিরভাবে পথ অতিক্রম করছিলো।

সর্পপূজারী সন্ন্যাসীদের কাফেলা একটি জায়গায় যাত্রা বিরতি করে আহারাদি সেরে শুয়ে-বসে বিশ্রাম করছিলো। পথে দস্যুদের একটি ঘোড়া হ্রেষার করছিলো বটে; কিন্তু তাদের কেউ সেদিকে খেয়াল করেনি। দস্যুরা

তাদের ঘোড়াগুলোকে কাফেলার অবস্থান থেকে কিছুটা দূরে বেঁধে রেখে হেঁটে কাফেলার দিকে অগ্সর হলো। অগ্সর হয়েই দস্যুদল ধিরে ফেললো কাফেলা।

দস্যুদলের নিষ্কিঞ্চ একটি তীর কাফেলার এক লোকের বুকে এসে বিন্দ হলো। সবাই আতঙ্কিত হয়ে চতুর্দিকে দেখতে লাগলো। ঠিক সেই মুহূর্তে তাদের কানে ভেসে এলো, “সবাই দাঁড়িয়ে যাও, কোনো চেঁচামেচি করবে না এবং কেউ পালানোর চেষ্টা করবে না।”

কাফেলার লোকজন দেখতে পেলো, বোঁপের আড়াল থেকে দশ-বারজন লোক বেরিয়ে এসেছে। ওদের সবার চেহারা ঢাকা। মাথা কালো কাপড়ে আবৃত। শুধু চোখ দুঁটো খোলা। এরা ডাকাত। দস্যুতাই এদের পেশা। ডাকাত দলকে এগিয়ে আসতে দেখে সন্ন্যাসীরূপী কাফেলার পুরুষরা তাদের ঢিলেচালা পোশাকের আড়াল থেকে খঙ্গরের চেয়ে বড় তরবারীর চেয়ে ছোট এক ধরনের অস্ত্র বের করে মোকাবেলার জন্য তৈরি হয়ে গেলে। ডাকাতদল যাদের পোশাক-পরিচ্ছদ দেখে সন্ন্যাসী মনে করেছিলো, মুহূর্তের মধ্যে তাদের কায়া বদলে গেলো। তারা এখন তরবারী নিয়ে বীতিমতো ডাকাতদলের মোকাবেলায় দাঁড়িয়ে গেলো। সন্ন্যাসীরা দুই তরুণীকে আগলে রেখে মোকাবেলা করছিলো আর ডাকাতদল তাদের বেষ্টনী ভেঙ্গে তরুণীদের কজা করার চেষ্টা করছিলো।

ডাকাতদল ভেবেছিলো, সন্ন্যাসীরূপী এই লোকগুলোকে ধমক দিয়েই কাবু করে ফেলবে। কিন্তু অল্পক্ষণের মধ্যেই তাদের ধারণা ভুল প্রমাণিত হলো। তারা মনে করেছিলো, ধমকি দিয়েই সন্ন্যাসীদের কাছ থেকে সবকিছু কেড়ে নেবে এবং সুন্দরী তরুণীদের অপহরণ করে নিয়ে যাবে। কিন্তু তাদেরকে কঠোর প্রতিরোধের মুখোমুখি হতে হলো। সন্ন্যাসীরূপী লোকগুলোও নিয়মিত সৈন্যের মতো লড়াইয়ে প্রবৃত্ত হলো। অবশ্য সন্ন্যাসীদের হাতিয়ারগুলো যুৎসই ছিলো না। লম্বা তরবারী দিয়ে ডাকাতরা তাদের কাবু করে ফেললো এবং কয়েকজনকে হত্যা করে ফেললো। তরুণীরাও এমন সাহসিকতার পরিচয় দিলো যে, মৃতদের ছোট তরবারীগুলো হাতে নিয়ে তারাও আত্মস্ফায় প্রবৃত্ত হলো। এক পর্যায়ে তরুণীরা ডাকাতদের হৃষকি দিলো, তোমরা রাজপুত কন্যাদের গায়ে হাত দিতে পারবে না। আমরা মৃত্যুবরণ করবো; তবু তোমাদের লালসার শিকার হবো না। কাফেলার জোরদার আক্রমণে দু'তিন ডাকাতও মারা গেলো।

গজনীর সৈন্যরা ওদের কাছ দিয়ে অগ্রসর হচ্ছিলো। হঠাৎ তাদের কানে ভেসে এলো নারীকষ্টের আর্তনাদ। তারা থেমে এন্দিক-ওন্দিক তাকিয়ে দেখলো, কাছেই দশ-বারটি ঘোড়া বাঁধা। তারা পূর্ব থেকেই জানতো হিন্দুস্তানের বিজন এলাকায় ডাকাত ও পথদস্যদের আখড়া থাকে। রাজা-মহারাজারা এই দস্যদের নিয়ন্ত্রণে কখনো কোনো পদক্ষেপ নেয়নি। অথচ সুলতান মাহমুদ বিজিত এলাকার প্রশাসকদের কঠোর নির্দেশ দিয়েছিলেন তারা যেনো শহর অঞ্চলের বাইরেও যেসব সেনাচৌকি থাকে, তাদেরকে নির্দেশ দেয় এলাকায় রীতিমতো টহল দিতে, যাতে নিরাপদে মুসাফিরগণ যাতায়াত করতে পারে এবং পথদস্যদের যেনো সৈন্যরা নির্মল করতে চেষ্টা করে।

সৈন্যদল তাদের গতিপথ বদল করে তাদের অঞ্চলগুলোকে তাড়া করলো। মুহূর্তের মধ্যে ঘোড়াগুলোর কাছে পৌছে দেখতে পেলো, একদল দুর্বস্ত অদৃরে কয়েকজন তরঙ্গীকে তুলে নেয়ার জন্য চেষ্টা করছে। সৈন্যরা ওদের অঞ্চল দিলো। সৈন্যদের উপস্থিতি দেখে ডাকাতদল তরঙ্গীদের ছেড়ে পালানোর চেষ্টা করলো। কিন্তু তারা ওদের ঘোড়া পর্যন্ত পৌছার আগেই সৈন্যরা তাদের পাকড়াও করে ফেললো।

এরপর অকুস্থলে এসে দেখলো দু'তরঙ্গী ছাড়া আর বাকি সবাই নিহত হয়েছে। নিহতদের মধ্যে সাদা দাঢ়িওয়ালা একজনের দেহে তখনো প্রাণ আছে বলে মনে হলো। সৈন্যরা তার চেহারায় পানির ঝাপটা দিয়ে তাকে ঘোড়াগাড়ীতে তুলে নিলো আর তরঙ্গীদের অভয় দিয়ে বললো, তোমাদের আর কোনো ভয় নেই, তোমরা নিশ্চিন্ত হতে পারো। ধৃত ডাকাতদের হাত-পা বেঁধে ওদের ঘোড়ার সাথেই হেঁটে যেতে বাধ্য করলো। তরঙ্গী দু'জনকে একটি ঘোড়াগাড়ীতে সওয়ার হতে অনুরোধ করলো। অতঃপর সবাই রওনা হলো থানেশ্বরের পথে।

গজনীর সৈন্যরা এতোগুলো ঘোড়া, কয়েকজন বন্দি আর শেষ রাতে বিদায় হওয়া সন্ন্যাসী কাফেলার উট ও ঘোড়াগাড়ী নিয়ে থানেশ্বর দুর্গে যখন প্রবেশ করলো, তখন বেলা ডুবে গেছে।

ডাকাতদলের ফ্রেফতারি এবং লুক্ষিত কাফেলার কথা দুর্গশাসক কুতুব গোজাক ও সেনাপতি বাহরামের কানে পৌছামাত্রই তারা উভয়ে দৌড়ে এলেন। তাদেরকে জানানো হলো, এই ডাকাতদল সন্ন্যাসীদের কাফেলা আক্রমণ করে

‘দু’তরুণী ও অন্যান্য সব পুরুষকে হত্যা করেছে। সৈন্যরা জানতো না, এরা শেষ রাতে এ দুর্গ থেকেই রওনা হয়েছিলো।

দুর্গশাসক সাদা দাঢ়িওয়ালা সন্ম্যাসীর জীবন বাঁচানোর জন্য চিকিৎসকদের সম্ভাব্য সব ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দিলেন। দুর্গশাসক তার হত্যৌবন ফিরে পাওয়া এবং দীর্ঘ জীবন লাভের জন্য সন্ম্যাসীকে বাঁচানোর প্রতি মনোযোগী হলেন। এদিকে দুই তরুণী ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছিলো। তাদের মুখে কথা বের হচ্ছিলো না। একটি পৃথক কক্ষে তাদের থাকতে দেয়া হলো। তাদের সেবা-যত্ত্বের জন্য দু’জন মহিলাকে নিযুক্ত করা হলো। দুর্গশাসক ও সেনাপতি তাদের সামন্তা দিলো, তোমাদের আর কোনো শংকা নেই; সৈন্যদের দিয়ে তোমাদেরকে নিজ নিজ বাড়িতে পৌছে দেয়ার ব্যবস্থা করা হবে।

সাদা দাঢ়িওয়ালা সন্ম্যাসী অচেতন ছিলো। রাতভর চিকিৎসকরা তার চিকিৎসা অব্যাহত রাখলো। দুর্গশাসক নিজে চিকিৎসা তদারকি করলেন। পরদিন দুপুরে সে হঁশ ফিরে পেলো। চোখ খুলেই সে ক্ষীণকণ্ঠে জানতে চাইলো সে এখন কাথায়ঃ তাকে জানানো হলো, সে এখন থানেশ্বর দুর্গে। দুর্গশাসক নিজে তার চিকিৎসার তদারকি করছেন। তাকে আরো জানানো হলো, তার কাফেলার দু’জন তরুণী অক্ষত অবস্থায় বেঁচে আছে। তাদেরকে সৈন্যরা স্বত্ত্বে এনে এখানে রেখেছে। সে তরুণী দু’জনকে দেখার ইচ্ছা প্রকাশ করলে তাদের ডেকে পাঠানো হলো।

তরুণীদ্বয় এসে তাকে জানালো, গজনী সৈন্যরা তাদেরকে উদ্ধার করে এনেছে এবং আপনাকে জীবিত দেখে সৈন্যরা এখানে এনে চিকিৎসার ব্যবস্থা করেছে। তারা এ কথাও জানালো যে, দুর্গশাসক ও সেনাপতি নিজে তাদের সার্বিক দেখাশোনা করছেন। এমনকি তাদের সেবা-যত্ত্বের জন্য দু’জন মহিলাকেও নিয়োগ করা হয়েছে।

গজনীর সৈন্যদের এই মহানুভবতার কথা শুনে সন্ম্যাসীর চোখে পানি চলে এলো। সে আবেগপ্রবণ হয়ে তরুণীদের বললো, “আমি আর এই লোকদের ধোঁকা দিবো না। দুর্গশাসকের হয়তো আমার প্রতি যত্নবান হওয়ার ব্যক্তিস্বার্থ থাকতে পারে। কিন্তু থানেশ্বর অভিযুক্তি গজনী সৈন্যদের তো আমার প্রতি যত্নবান হওয়ায় কোনো স্বার্থ ছিলো না। তোমাদের মতো সুন্দরী তরুণীদের এরা পরম সম্মানে আদর-যত্ত্বে এখানে নিয়ে এসেছে। অথচ তোমরা ছিলে

একেবারেই অসহায়। ওরা তোমাদের যা ইচ্ছা, তাই করতে পারতো; কিন্তু বিশ্বাস কর্ম্মত; তোমাদের স্পৰ্শ করেনি। বরং তোমাদের এখানে এনে পরম আদর-যত্নে রেখেছে। এরা আমাকে নতুন জীবন দিয়েছে। আমি আর এদের ধোঁকা দিতে পারি না।”

সে দুর্গশাসকের সাথে কথা বলার আগ্রহ প্রকাশ করলে দুর্গশাসককে খবর দেয়া হলো। দুর্গশাসক তখনই চলে এলো এবং তরুণীরা তাদের কক্ষে চলে গেলো।

“আমি আপনার সৈন্যদের এই মহানুভবতার প্রতিদান দিতে চাই।”  
ক্ষীণকষ্টে বললো সন্ন্যাসী।

“আপনি একে অনুগ্রহ মনে করবেন না।” বললো দুর্গশাসক। “আপনি আগে সুস্থ হয়ে নিন। আমি দুঁজনকে প্রস্তুত করে রেখেছি, যারা আপনাকে নিয়ে যাবে। আপনি জানেন, আমি আপনার কাছে কী প্রত্যাশা করি। আর ওই সৈন্যদের কথা বলছেন, যারা আপনাকে ডাকাতদের হাত থেকে উদ্ধার করে নিয়ে এসেছে। আপনি সুস্থ হয়ে বাড়িতে ফিরে গেলে ওদের জন্য কিছু সোনাদানা দিয়ে দিলেই চলবে।”

“আসলে আমার কাছে না আছে কোনো সোনাদানা, না আছে কোনো বিশ্বাস কর ওষুধী গাছ।” দৃঢ়কষ্টে বললো সন্ন্যাসী। “আপনার সেবা ও যত্নের প্রতিদান আমি সোনাদানা আর যৌবন ফিরে পাওয়ার কথিত ওষুধ দিয়ে দিতে চাই না। আমি আপনার ও সৈন্যদের উপকারের প্রতিদান একটি কঠিন সত্য উচ্চারণ করে দিতে চাই। প্রকৃতপক্ষে আমি আপনাকে চির যৌবনপ্রাণ হওয়ার ওষুধী গাছের কথা এবং সর্পমণি ও সোনাদানা এবং নৈসর্গিক সৌন্দর্যে ভরা যে মনোরম জগতের কথা বলেছিলাম, তা সবই অসত্য ও কাল্পনিক। জগতে এর কোনো অস্তিত্ব নেই। এ কারণে আপনি ইচ্ছা করলে দেয়ালের উপর থেকে ফেলে দিয়ে আমাকে হত্যা করতে পারেন এবং এই তরুণীদেরকে উপভোগ করেও প্রতিশোধ নিতে পারেন। তারপরও আমি বলবো, প্রকৃত সত্য বলে দিয়ে আমি আপনার বড়ই উপকার করছি। আপনি দুঁজনকে ওষুধী গাছ আনার জন্য পাঠানোর ব্যবস্থা ইতিমধ্যে করে ফেলেছেন। যদি এদেরকে কাল্পনিক ঠিকানার সঙ্গানে পাঠিয়ে দিতেন, তাহলে তারা জীবনেও সেই অবাস্তব গন্তব্যের ঝোঁজ পেতো না। বরং ঠিকানাবিহীন পথে ঘুরে ঘুরে জীবন বিপন্ন করতো। আপনার ভারত অভিযান ♦ ৪৩

দুই সেনাকর্মকর্তাও আমার এক তরুণীর ধোকায় পড়ে সর্পমণি আর সোনাদানা কজা করার নেশায় আকৃষ্ট হয়ে পড়েছিলো । তারাও হয়তো কথিত সর্পমণি ও সোনাদানার স্বর্গীয় রাজ্যের তালাশে বেরিয়ে পড়তো ।”

সন্ন্যাসীর মুখে পূর্ব কথার সম্পূর্ণ বিপরীত কথা শুনে দুর্গশাসকের মাথা চকর দিয়ে উঠলো । কয়েকবার তার চেহারার রং বদল হলো । তিনি দাঁতে দাঁত পিষতে শুরু করলেন ।

“আপনি বিস্মিত হবেন না ।” দুর্গশাসকের উদ্দেশে বললো সন্ন্যাসী । আমি এই পরিস্থিতিতেও আপনাকে ধোকায় রাখতে পারতাম এবং আপনার সেবা-যত্ত্বে আমি নিশ্চিতে সুস্থিতা লাভ করতে পারতাম । কিন্তু আমি কল্পনাও করতে পারিনি আপনার সেনাবাহিনীর সাধারণ সিপাহীরাও এতে উচ্চমানের সততা ও চরিত্রের অধিকারী । আসলে আপনাদের উন্নত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের মূল কারণ আপনাদের ধর্মের বস্তুনিষ্ঠতা ও সত্যতা । বাস্তবে আমরা লাহোর থেকে এসেছিলাম । রাজা আনন্দ পালের দ্বিতীয় পুত্র ভীমপাল এখন সিংহাসনে সমাচার করেন । রাজা ভীমপালের অভিজ্ঞ সেনাপতি তার একটি চক্রান্তের অংশ হিসেবে আমাদের পাঠিয়েছে । আমাদের পরিকল্পনা ছিলো আপনাকে ও আপনার সেনাপতিকে স্বপ্নিল জগতের লোভ দেখিয়ে এবং প্রচুর সোনাদানা, চিরযৌবন ও রাজত্বের মোহে ফেলে বিভ্রান্ত করা । আপনাকে দুর্গের বাইরে নিয়ে যাওয়া এবং প্রয়োজনে আপনাকে গায়েব করে ফেলার পরিকল্পনাও আমাদের ছিলো ।”

“আমরা আপনার কথায় বিভ্রান্ত হয়ে যাবো কিসের ভিত্তিতে আপনি এ বিশ্বাস করলেন ।” সন্ন্যাসীকে জিজ্ঞেস করলো কুতুব গোজাক ।

“আপনি তো একজন মানুষ, ফেরেশতা নন । মানুষ যতোই ন্যায়নিষ্ঠ হোক না কেনো আরাম-আয়েশ ও ভোগ-বিলাসিতার বাসনা সবার মধ্যে কাজ করে । এই বাসনাকে আপনি দমিয়ে রাখতে পারেন; কিন্তু তা নির্মূল করতে পারবেন না । ধন-সম্পদ ও সুন্দরী নারী ভোগ-বিলাসিতার সবচেয়ে উৎকৃষ্ট উপকরণ । আমরা মানুষের মানবিক দুর্বলতাগুলো বুঝি । যে কোনো মানুষের মধ্যে যৌবনকে দীর্ঘদিন ধরে রাখার আকাঙ্ক্ষা থাকে । আপনার দৈহিক গড়ন ও বার্ধক্যের টান দেখে আমি আপনার পড়স্ত যৌবনকে উক্ষে দেয়ার কথা বলে আপনাকে আমার প্রতি আকৃষ্ট করতে সক্ষম হয়েছিলাম । আপনি আমার কথায়

আকৃষ্ট হয়ে বলেছিলেন, সোনাদানার চেয়ে আপনার কাছে যৌবন ফিরে পাওয়ার  
ওমুদ্ধী গাঢ়টিই বেশি কাঞ্জিত ।”

সন্ন্যাসীরপী লোকের কথায় কুতুব গোজাকের চেহারায় লজ্জার আভাস  
ভেসে উঠলো ।

“আপনি পেরেশান হবেন না ।” বললো সন্ন্যাসী । “আপনার জায়গায় অন্য  
কোনো ব্যক্তি হলেও আমাদের ফাঁদে পা দিতো । আমি তরুণীদেরকে নিয়ে  
এসেছিলাম আপনার মধ্যে যৌবনের ভাটার টান অনুভূত করানো জন্য ।  
দুনিয়াটাকে আমি খুব গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করেছি । বহু মানুষকে আমি  
ঘেঁটেছি । আমি মানুষের স্বভাবজাত প্রবণতা নিয়ে গভীর নিরীক্ষা করেছি । দীর্ঘ  
অভিজ্ঞতাকে আমি আপনার মধ্যে প্রয়োগ করেছি । মনের বাসনা প্ররূপের জন্য  
এবং জীবন ও জগতকে উপভোগ করার লোভে মানুষ বিবেককে চাপা দিয়ে  
আবেগের দাসত্ব করতে শুরু করে । তখন কর্তব্যপরায়ণ মানুষও আপন কর্তব্য  
ও দায়িত্ব ভুলে যায় । অধঃপতনের দিকে ধাবমান লোকটিও তখন নিজের  
অধঃগতি অনুধাবন করতে পারে না । তখন অনেকেই বুঝতে পারে না  
হত্যোবন ফিরে আসে না এবং সোনাদানা ধন-সম্পদের দ্বারা এবং দৈহিক  
ভোগবাদিতার দ্বারা আঘাত প্রকৃত প্রশান্তি পাওয়া যায় না । জাগতিক ধোঁকা ও  
প্রবৃত্তির প্ররোচনাকে যারা নিয়ন্ত্রণ করতে পারে, তারাই হয় সাধু-সন্ন্যাসী বা  
পীর-বৃষুর্গ । যে মানুষের মধ্যে আঘাত নিয়ন্ত্রণ শিথিল হয়ে যায়, সে শত শক্ত  
দুর্গেও পরাজয়বরণ করে । শক্ররা তার পিঠে চড়ে বসে । আপনি আপনার মিশন  
থেকে বিচ্ছুর্ণ হয়ে গিয়েছিলেন আর আমাদের কর্তব্য ছিলো আমাদের মিশনকে  
আরো এগিয়ে নিয়ে যাওয়া ।... কিন্তু এই পড়ত্ব জীবনে আমি কায়মনোবাকে  
আপনাকে একটি রুচি বাস্তব উপদেশ দিতে চাই । যে দুই তরুণী ডাকাতদের  
হাত থেকে বেঁচে গেছে এদেরকে আপনারা আটকে রাখবেন না । এদেরকে  
আটকে রাখলে এরা আপনার সেনাবাহিনীর মধ্যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে ফেলবে,  
আপনাদের মধ্যে পারস্পরিক শক্রতা জন্ম দেবে । অবশ্যজ্ঞাবী নৈতিক ও বাহ্যিক  
উভয় ধরনের পরাজয় থেকে রক্ষা পেতে হলে নিজের প্রবৃত্তিকে অবশ্যই  
নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে ।”

সাদা দাঢ়িওয়ালা সন্ন্যাসীর ক্ষত শুকাতে প্রায় মাসখানিক সময় লেগে  
গেলো । এই সময়ের মধ্যে সেনাপতি বাহরাম জেনে গেলো সাপ ও মানুষ

একই সাথে বসবাস করে পৃথিবীতে এমন কোনো রাজ্য নেই। সেই সাথে দুর্গে নিয়ে আসা তরঙ্গীয়ও তাকে জানিয়ে দিলো আসলে সর্পরাজ্য সর্পমণি বলতে বাস্তবে কিছুই নেই।

এসব কাঢ় বাস্তবতা প্রকাশ করার পরও কুচুব গোজাক যথারীতি পরম যত্নে সন্ন্যাসীর চিকিৎসা তদারকি অব্যাহত রাখলেন। তরঙ্গী দুর্জনকে সস্মানে দুর্গেই রাখা হলো। এক পর্যায়ে তাদের বিদায়ের সময় হলো।

“আপনি শক্তার বিষাক্ত মনোভাব নিয়ে এখানে এসেছিলেন আর এখন আপনাকে আমরা বস্তুর মতোই বিদায় জানাচ্ছি। আমাদের আচার-ব্যবহার যদি আপনার ভালোই লেগে থাকে, তাহলে যাওয়ার সময় অন্তত এতেটুকু বলুন, আসলে আপনাদের রাজা-মহারাজাদের উদ্দেশ্য কী?” সন্ন্যাসীর উদ্দেশ্যে বললেন দুর্গশাসক। “সে কি আমাদের সুলতানের প্রতি আনুগত্য বহাল রাখবে, না তার বাবার পরাজয়ের প্রতিশোধ নেবে?”

“আমরা আপনাদের ঈমান ও কর্তব্য বিনষ্টের জন্য যে কঠিন আক্রমণ পরিচালনা করেছিলাম, এটাই প্রমাণ করে আমাদের নতুন মহারাজা ভীমপাল আপনাদের সুলতানের আনুগত্য করবে না বরং তাকে চ্যালেঞ্জ করবে।” বললো সন্ন্যাসী। সন্ন্যাসী আরো বললো, “রাজা ভীমপাল নতুন করে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছে। সে করদরাজা থাকবে না। আপনাদের অধীনস্ত দুর্গশাসক ও সেনাপতিদেরকে মানসিকভাবে পর্যন্ত করার মিশন হিসেবেই আমরা আপনার কাছে এসেছিলাম। তাকে নিশ্চিত করা হয়েছে, এই পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা হলে গজনী বাহিনী দুর্বল হয়ে পড়বে। এর মূল উদ্দেশ্য হলো, গজনীর সুলতানকে তাড়িয়ে একটি দুর্গম ও কঠিন জায়গায় নিয়ে গিয়ে তার উপর সমর্পিত আক্রমণ করা হবে। সেই সাথে তাকে কর দিতে অঙ্গীকার করবে নতুন রাজা ভীমপাল।”

রাজা ভীমপালের কাছে খবর পৌছে গেলো সন্ন্যাসীর বেশে থানেশ্বর দুর্গে যে গোয়েন্দাদেরকে মিশনে পাঠানো হয়েছিলো, তা অকার্যকর হয়ে গেছে। কিন্তু তাকে এ কথা জানানো হয়নি যে, শুধু মিশনই ব্যর্থ হয়নি, বরং তারা যে পরিকল্পনা করেছিলো, তাও ফাঁস হয়ে গেছে। অবশ্য ভীমপাল এসব চক্রান্তে বিশ্বাসীও ছিলো না। নিজের সাহসিকতা ও সামরিক কার্যক্রমের প্রতি ভীমপালের বেশি আস্থা ছিলো। সে পুরো উদ্যমে যুদ্ধপ্রস্তুতি করতে লাগলো

এবং কোনু দুর্গম ও কঠিন জায়গায় সুলতানকে পরাজিত করা যায়, তা জায়গা নির্বাচনের প্রতি বেশি মনোযোগী হলো ।

ঝিলম থেকে রাওয়ালপিণ্ডি পর্যন্ত একের পর এক পাহাড় অবস্থিত । বর্তমানে পাহাড়ের ভেতর ও পাদদেশ দিয়ে চলে গেছে মহাসড়ক ও রেলপথ । পূর্বে এসব জায়গার পথ ছিলো গুহার মতো । ঝিলম পাহাড়ী এলাকায় বুগীরটিলা নামে একটি জায়গা ছিলো । সেখানকার অধিবাসীদের জাদু-টোনা ছিলো সারা ভারতবর্ষে বিখ্যাত । সুলতান মাহমুদের সময়ে এই এলাকাটি ছিলো প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে অপরূপ এবং খুবই দুর্গম । ভীমপাল সুলতান মাহমুদের সাথে মোকাবেলার জন্য ঝিলম ও রাওয়ালপিণ্ডির মাঝামাঝি দুর্গম এই স্থানটিকে বেছে নিলো । সে তার সেনাবাহিনী সেই দুর্গম পাহাড়ী এলাকায় স্থানাঞ্চলের নির্দেশ দিলো । সেই সাথে সেনাপতিদের বললো, তারা যেনো পাহাড়ী এলাকায় যুদ্ধ করার জন্য সেনাদেরকে বিশেষভাবে তৈরি করে । গজনী বাহিনীকে লাহোরে যাওয়ার জন্য এই দুর্গম ও সংকীর্ণ পথ অবলম্বন করতে হতো । এই সুযোগকে কাজে লাগানোর জন্য ভীমপাল জায়গায় জায়গায় ফাঁদ তৈরি করলো এবং পাহাড়ের উপরে তীরন্দাজ ইউনিট নিযুক্ত করলো । তীরন্দাজের উপরই বেশি গুরুত্ব দিলো ভীমপাল । আক্রমণের পর পাহাড়ী এলাকায় গজনী বাহিনী বিক্ষিণ্ণ হয়ে গেলে তাদের পরাত্ত করার জন্য বিশেষ অস্থারোহী ও হস্তি বাহিনীকেও প্রস্তুত করলো । হস্তি বাহিনীকে অতি সংকীর্ণ পথে আক্রমণ এবং বিস্তৃত যয়দানে মোকাবেলার জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণ দিলো ।

একদিন ভীমপালের কাছে থবর এলো, থানেশ্বর দুর্গ শাসকের পক্ষ থেকে এক দৃত মহারাজার সাথে সাক্ষাৎ করতে এসেছে । ভীমপাল তাদেরকে রাজ দরবারে নিয়ে আসার নির্দেশ দিলো । থানেশ্বর দুর্গশাসকের দৃতের সাথে ছিলো ভীমপালের পাঠানো সাদা দাঢ়িওয়ালা সেই সন্ন্যাসী ও তার সহযোগী দুই তরুণী । থানেশ্বর দুর্গের ডেপুটি সেনাপতি দৃত হিসেবে বারজন নিরাপত্তা রক্ষী নিয়ে ভীমপালের রাজ্যদরবারে এসেছিলো ।

দৃত রাজা ভীমপালের মুখোমুখি হয়ে বললো, “মহারাজ! আমরা আপনার আমানতকে ফেরত দিতে এসেছি । আপনার পাঠানো অন্যান্য সন্ন্যাসী ও তরুণীরা হিন্দু ডাকাতদের আক্রমণে নিহত হয়েছে বিধায় আমরা দুঃখ প্রকাশ করছি । এদেরকেও গুরুতর আহত অবস্থায় আমাদের সৈন্যরা উদ্ধার করে

এনেছিলো । আমরা তাদেরকে চিকিৎসা করিয়ে সুস্থ করেছি । আমরা তাদেরকে আরো আগেই ফেরত পাঠাতে পারতাম; কিন্তু এই বয়ক সন্ন্যাসীর আঘাত ছিলো মারাঞ্জক; তার সুস্থ হতে সময় লেগেছে । আপনি এই তরঙ্গীদের কাছে জিজ্ঞেস করতে পারেন, আমরা আপনার আমানতের কোনো খেয়ালত করেছি কিনা । তাদের কাছে জিজ্ঞেস করতে পারেন, তাদের দলের কোনো সদস্য আমাদের হাতে মৃত্যবরণ করেছে কিনা ।”

সমকালীন ঐতিহাসিকগণ লিখেছেন, ভীমপালের মতো দুঃসাহসী ও অত্যাচারী রাজা ও সন্ন্যাসীর ব্যর্থতার কোনো প্রতিশোধ নিতে পারেনি । বরং ব্যর্থ সন্ন্যাসী ও দৃতকে সস্থানেই বিদায় করেছে । এর ফলে ডেপুটি সেনাপতি সাহসিকতার সাথেই রাজদরবারে তার বক্তব্য উপস্থাপন করেন । তিনি রাজার উদ্দেশে বলেন, “মাননীয় মহারাজ ! আপনি আমাদের করদাতা । চুক্তি অনুযায়ী আপনি ও আমাদের মধ্যে কেউ কারো বিরুদ্ধে যুদ্ধ প্রস্তুতি নেবে না । কিন্তু আপনি ইতিমধ্যেই বেশকিছু তৎপরতা চালিয়েছেন, যা চুক্তির সুস্পষ্ট লজ্জন এবং এটাও প্রমাণিত হয়েছে, হিন্দু রাজপুতরা সাপের চেয়েও ভয়ংকর ।”

রাজা ভীমপাল তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দৃতের দিকে তাকিয়ে বললো, “করদাতা অর্থ এই নয় যে, তোমরা আমাদের রাজদরবারে এসে যাচ্ছে তাই কথা বলবে ।”

রাজার মনোভাব দেখে দরবারীদের কেউ কেউ তরবারীর বাঁটে হাত রেখে স্কুল দৃষ্টিতে দৃতের দিকে অগ্নিদৃষ্টি নিষ্পেপ করলো । দৃতরূপী ডেপুটি সেনাপতি চকিতে একবার রাজদরবারের চতুর্দিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে যুচকি হাসলেন এবং বললেন, “দুর্ভেদ্য রাজদরবারের ভেতরে নিরস্ত্র এক দৃতের বিরুদ্ধে এতোজন শোক-রণপ্রস্তুতি নিলেন, ভাবতেও অবাক লাগে । আমাদের সুলতানের দরবারে কোনো নিরস্ত্র দৃতের প্রতি স্কুল হয়ে যদি কোনো শাহজাদাও তরবারীর বাঁটে হাত রাখতো, তাহলে সুলতান তার হাত কেটে ফেলতেন । তরবারীর পরাকাষ্ঠা যুদ্ধ যয়দানে দেখাতে হয় । তোমরা যদি তরবারী চালনায় এতোটাই সিদ্ধহস্ত হতে, তাহলে এই বৃক্ষ ও তরঙ্গীদেরকে আমাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করতে না । এরা তো তোমাদেরই বোন-কন্যা । এদের সন্ত্রমকে তোমরা যুদ্ধাস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করতে পারলেন ।”

কোনো কোনো ঐতিহাসিক লিখেছেন, সেদিন ভীমপালের রাজদরবারে যে ব্যক্তি দোভাস্বীর কাজ করছিলো, সে থানেক্ষের দুর্গশাসকের বিশেষ দৃত গজনী বাহিনীর একজন তুখোড় যোদ্ধা ডেপুটি সেনাপতির তিরক্ষারমূলক বক্তব্য হ্বহু

ভাষান্তরিত করে রাজাকে শোনাচ্ছিলো না। দৃতের কঠোর ও কড়া তিরকার ও অবমাননামূলক শব্দগুলোকে অনেকটাই সাদামাটা ও সহজ ভাষায় রাজার কাছে পেশ করছিলো। অবস্থা দেখে দৃত রাজার দোভাষীর উদ্দেশে বললেন, “আমি জানি না, তুমি আমার কথাগুলো হ্বহু ভাষান্তরিত করে রাজার কাছে উপস্থাপন করছো কিনা। কিন্তু আমি বুঝতে পারছি, আমার আবেগ ও উচ্চাসকে হ্বহু তুমি রাজার কাছে পেশ করছো না। আমি যেভাবে বলছি, হ্বহু সেভাবে আমার কথাগুলো তোমাদের রাজার কাছে উপস্থাপন করো।”

এ পর্যায়ে এ কথাটিও দোভাষী রাজাকে শোনালো।

“সম্মানিত দৃত, শুনুন! আমার বাবা ছিলেন আপনাদের করদাতা। তিনি মারা গেছেন। এখন আমাকে এই সিদ্ধান্তে আসতে হবে যে, আমি কর দেবো কিনা। অবশ্য এ অবস্থায়ও আমাদের মৈত্রী বহাল আছে এবং থাকবে।” বললো রাজা।

“আমি আপনার কাছে ইসলামের দাওয়াত পেশ করা এ মুহূর্তে কর্তব্য মনে করছি।” বললো দৃতকুণ্ঠী ডেপুটি সেনাপতি। “আপনার দাদা আমাদের কাছে পরাজিত হয়েছিলেন। আপনার বাবাও কোনো ক্ষেত্রেই জয়লাভ করতে পারেননি। এখন আপনার পালা। আপনি ইতিমধ্যে কয়েক তরুণীকে বলি দিয়ে দিয়েছেন। আপনি পাথরের মূর্তির সামনে বসে আরাধনা করে কী পাছেন? পরাজয় ছাড়া এতে কি কোনো উপকার হয়েছে! আপনার কি এখনো বুঝে আসেনি, আপনাদের ধর্ম একটি ভাস্তু বিশ্বাস? সেই অদ্বিতীয় নিরাকার প্রভুই আপনাদেরকে একের পর এক বিপর্যয়ের মুখোমুখি করছেন। কারণ, তিনিই একমাত্র প্রভু। শাস্তি ও পুরস্কার দেয়ার ক্ষমতা একমাত্র তাঁরই আছে। আপনি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করুন মহারাজ।”

ওঁ শ্ৰী মৃগাক্ষী

“কারো রাজদরবারে এসে কোনো দৃত কারো ধর্মকে অবমাননা করুক এমন দুঃসাহস আমরা কোনো দৃতকে দিই না।” বললো রাজা। “আমার রাজ দরবারে এসে আমার সামনে আমার ধর্মকে অবমাননা করে আপনি আমাদের সাথে মৈত্রীচুক্তির ব্যাপারে ভাবতে বাধ্য করছেন। ঠিক আছে, আপনি এখন আসতে পারেন।”

দৃত রাজদরবার ত্যাগ চলে এলেন। সাদা দাঢ়িওয়ালা সন্ন্যাসী এবং দুই তরুণী অধোমুখে তখনো রাজদরবারে দাঁড়ানো।

“ওদের এখান থেকে নিয়ে যাও।” হংকার দিয়ে নির্দেশ দিলো ভীমপাল। “এই বৃক্ষ আর মেঘেগুলো আমার জীবনের কলঙ্ক হয়ে থাকবে। আমার দৃষ্টি থেকে এদের সরিয়ে দাও। এসব আমি কখনো ব্যবহার করতে প্রস্তুত নই। আমি সম্মুখ্যুক্তে মোকাবেলা করেই মাহমুদকে বন্দী করে মন্দিরে নিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করবো, এখন বলো কার ধর্ম সঠিক!”

ঝিলম তীরের পাহাড়ী এলাকা সেনা শিবিরে পরিণত হলো। সেখানে বিপুল সংখ্যক সৈন্য পাঠালো রাজা ভীমপাল। এদিকে মন্দিরে মন্দিরে হিন্দু পুরোহিতরা আবারও মুসলমানদের বিরুদ্ধে বিষেদগার করতে শুরু করলো। ফলে পূর্বের মতো বেসামরিক লোকজন ঢাল-তলোয়ার ও তীর-ধনুক নিয়ে লাহোরে জমায়েত হতে শুরু করেছে। হিন্দু জনসাধারণ রাজা ভীমপালের কোষাগারে অর্থ-সম্পদ জমা করতে শুরু করলো। হিন্দু নারীরা তাদের গায়ের অলংকার খুলে ভীমপালের যুদ্ধভাণ্ডারে দান করতে লাগলো। প্রত্যেক হিন্দুর মধ্যে যুদ্ধ-উন্নাদনা জন্ম নিলো। যেসব হিন্দু যুবক যুদ্ধের প্রস্তুতি নিয়ে হিন্দুস্তানের বিভিন্ন এলাকা থেকে লাহোর পৌছলো, তাদেরকে ঝিলম তীরবর্তী পাহাড়ী এলাকায় পাঠিয়ে দেয়া হলো।

সুলতান মাহমুদের কাছে খবরাখবর আসছিলো। কিন্তু তার পক্ষে জানা সম্ভব হয়নি যে, ভীমপাল তার বিরুদ্ধে আক্রমণ করার চক্রান্ত করছে এবং আক্রমণের জন্য প্ররোচনা দিচ্ছে। এমতাবস্থায় ১০১২ খ্রিস্টাব্দ চলে গেলো। ১০১৩ খ্রিস্টাব্দের শেষভাগে নির্ভরযোগ্য সূত্রে খবর এলো, ভীমপাল সুলতানের সাথে তার বাবার মৈত্রীচূক্তি প্রত্যাখ্যান করেছে এবং কর দিতেও অবীকৃতি জানিয়েছে। সুলতানের গোয়েন্দারা এ খবরও পাঠালো যে, রাজা ভীমপাল ঝিলম নদীর তীরবর্তী পাহাড়ী এলাকায় তার সৈন্যদের ছড়িয়ে রেখেছে এবং জায়গায় জায়গায় ফাঁদ তৈরি করেছে। সমকালীন হিন্দু জনতা ভীমপালকে বীর উপাধিতে ভূষিত করেছিলো। আর এদিকে শক্র নির্মলে সুলতান মাহমুদ ছিলেন অধৈর্যশীল। বেঙ্গমানদের বিরুদ্ধে তিনি সব সময়ই ক্ষিণ থাকতেন। তার এক পা সর্বদাই ঘোড়ার পাদানিতে থাকতো। ভীমপালের রণপ্রস্তুতির কথা শুনে সুলতান ক্ষেত্রে অগ্নিশর্মা হয়ে উঠলেন। ইতিমধ্যে তাঁর সৈন্যবাও কিছুটা বিশ্রাম নেয়ার অবকাশ পেয়েছিলো এবং তার সৈন্যবাটতিও এ সময়ে পূরণ হয়ে গিয়েছিলো। ভীমপাল ভেবেছিলো, সুলতান মাহমুদ হয়তো আরো কিছুদিন পরে এদিকে অভিযান করবেন এবং লাহোর পর্যন্ত পৌছুতে তার বাহিনীর

অন্তত ছয় মাস সময় লাগবে। ততোদিনে শীতকাল শেষ হয়ে শ্রীঅক্ষকাল শুরু হয়ে যাবে। আর তখন হিন্দুস্তানীদের জন্য সময়টা যুক্তির উপযোগী হবে। কিন্তু ভীমপালের এ ধারণা ছিলো নিতান্তই ভুল।

ভীমপাল জ্যায়গায় তার সৈন্য মোতায়েন করে ফাঁদ তৈরি করে নিচিস্তে লাহোরে অবস্থান করছিলো আর ভাবছিলো, সুলতানের বাহিনী মারগালা অঞ্চলের পাহাড়ী এলাকা অতিক্রম করলেই তার গোয়েন্দারা তাকে খবর দেবে। রাওয়ালপিণ্ডি অঞ্চলের একটি জ্যায়গার নাম মারগালা। ভীমপাল সুলতানের ক্ষিপ্রগতি সম্পর্কে জানতো না। তাই সে রাজকীয় চালে ধীরগতিতে অঘসর হয়ে লাহোর থেকে বালনাথ নামক পাহাড়ী উপত্যকায় পৌছলো। এদিকে সুলতান মাহমুদ মারগালা এসে গতি থামিয়ে দিলেন। সারা রাত তিনি সেখানে অবস্থান করলেন। তিনি এখানে যাত্রাবিরতি করে তাঁর গোয়েন্দাদের মাধ্যমে জানতে চেষ্টা করেন, শক্র বাহিনীর অবস্থান কোথায়, তাদের বিস্তৃতি কোনু পর্যন্ত এবং তাদের রণকোশল কী ধরনের হতে পারে? ইত্যবসরে ভীমপাল বালনাথ নামক স্থানে পৌছায়। জ্যায়গাটি ছিলো পাহাড়-চিলা ও খানা-খন্দকে ভরা। ভীমপাল জ্যায়গাটিকে নিজের সুবিধা অনুযায়ী দুর্গের মতো ব্যবহার করার পরিকল্পনা করে অবস্থান গ্রহণ করে।

প্রত্যুষেই সুলতান মাহমুদ ভীমপালের অবস্থান এবং সেখানকার ভৌগোলিক পরিস্থিতির সামগ্রিক তথ্য পেয়ে যান। সুলতানকে আরো জানানো হলো, খিলমের টিলা ও পাহাড়ের চূড়ায় ভীমপালের তীরন্দাজ বাহিনী অবস্থান নিয়েছে এবং জ্যায়গায় জ্যায়গায় ওঁৎ পেতেছে। সামগ্রিক পরিস্থিতি জেনে সুলতান সেনাক্ষমাভারদের ডেকে বললেন, তিনি লাহোর যাবেন না এবং খিলমের পাহাড়ী পথেও তিনি অঘসর হবেন না। তিনি কমাভারদের প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা দিয়ে অঘবর্তী সেনাদেরকে পূর্ণ প্রস্তুতি নিয়ে পাঠিয়ে দিলেন।

ভীমপালের সৈন্যবল সুলতানের সৈন্যবলের চেয়ে অনেক বেশি ছিলো। অবস্থানগত দিক থেকেও ভীমপাল ছিলো সুবিধাজনক স্থানে। সুলতান মাহমুদের সৈন্যরা আক্রমণাত্মক ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলো। সাধারণ বাংকারে অবস্থানকারী কোনো বাহিনীকে আক্রমণ করতে হলে বেশি সৈন্যের প্রয়োজন হয়। কারণ, এমন আক্রমণে আক্রমণকারীদের জনবল বেশি ক্ষতির

সম্মুখীন হয় কিন্তু এক্ষেত্রে সুলতানের সৈন্যসংখ্যা বেশি ছিলো না। এ ক্ষেত্রে ঝটিকা বাহিনীকে ব্যবহার করার ক্ষেত্রে সুলতানকে যুবই সর্তর্কতা অবলম্বন করতে হলো। সাধারণত গুপ্ত হামলা ও ঝটিকা আক্রমণের সাফল্য নির্ভর করে সৈন্যদের বীরত্ব ও সাহসিকতার উপর। রাতের অঙ্ককারে লক্ষ্যস্থলে না গিয়েই যদি ফিরে এসে কোনো সৈন্যদল কর্তা ব্যক্তিদেরকে মিথ্যা তথ্য দেয়, তা নিরূপণ করার মতো বিকল্প কোনো সূত্র থাকে না।

এক্ষেত্রে সুলতান মাহমুদের গুপ্ত আক্রমণকারীদের নির্বাচন করা হতো সৈন্যদের দৈহিক ও মানসিক দৃঢ়তা এবং ধর্মীয় আবেগের ভিত্তিতে। ঝটিকা বাহিনীর সদস্যের সাথে সুলতান মাহমুদ আন্তরিক সম্পর্ক গড়ে তুলতেন। সুলতান মাহমুদের ঝটিকা বাহিনীর সদস্যদের অবস্থা এমন হতো যে, তাদের জীবন-মরণে কবরস্থ হওয়া এবং কাফন দাফন হওয়ার সম্ভাবনাও থাকতো না।

পরদিন রাতের বেলায় সুলতান মাহমুদের সৈন্যরা পাহাড়ী অঞ্চলে পৌছে গেলো। ঝটিকা বাহিনীর সদস্যরা রাতের অঙ্ককারে আরো এগিয়ে গেলো। প্রত্যেক দলে ছিলো দশ-বারজন দুর্ধর্ষ সৈন্য আর তাদের সাথে থাকতো একজন করে স্থানীয় গাইড। প্রত্যেক দলের টার্গেট ছিলো সেই পাহাড় চূড়া, যেখানে ভীমপাল অবস্থান করছে। সময়টা ছিলো ডিসেম্বরের শুরু এবং শীতের প্রচণ্ডতা। এমন বরফশীতল রাতে শক্রপক্ষ থেকেও কোনো জঙ্গী তৎপরতার সম্ভাবনা নেই মনে করে ভীমপালের সৈন্যরা বাংকারে মাথা গুঁজে শয়ে ছিলো।

সুলতানের ঝটিকা বাহিনী পা টিপে বরফশীতল রাতের অঙ্ককারে পাহাড়ে ও টিলার চূড়ায় উঠে গেলো। হিন্দু ভীরন্দাজ সৈন্যরা তখন বেঘোরে ঘুমোচ্ছে। প্রতি বাংকারে মাত্র একজন করে প্রহরী পাহারা দিচ্ছিলো। এই একজন পাহারাদারের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা তেমন কঠিন হলো না। কয়েকটি চৌকিতে হিন্দু সৈন্যরা জাগ্রত থাকার কারণে প্রচণ্ড যুদ্ধ হলো আর অধিকাংশ চৌকিতেই সুলতানের বাহিনী ঘুমন্ত সৈন্যদেরকে নিঃশেষ করে দিলো। জাগ্রত সৈন্যদের সাথে কঠিন মোকাবেলায় প্রবৃত্ত হওয়ার কারণে চতুর্দিকে শোরগোল পড়ে গেলো। শোরগোলের আওয়াজ ভীমপালের কানে পৌছুলে পরিস্থিতি জানার জন্য ভীমপাল লোক পাঠালো। কিন্তু সংবাদ সংগ্রহ করে কেউই আর ফিরে এলো না।

রাত শেষে প্রত্যুষেই সুলতান মাহমুদ তাঁর গেরিলা দলের সাফল্যের সংবাদ পেলেন। অতঃপর তাঁর সৈন্যদের একটি অংশকে তিনি চুপিসারে পাহাড়ের চূড়ায় উঠে যাওয়ার নির্দেশ দিলেন। ভীমপালের রণকোশল সুলতান মাহমুদের বুৰতে মোটেও বেগ পেতে হলো না। ভীমপাল ভেবেছিলো, সুলতানের বাহিনী পাহাড়ের পাদদেশ দিয়ে অতিক্রম করবে। এ জন্য সে পাহাড়ের পাদদেশে সৈন্যদের ছড়িয়ে দিয়েছিলো।

দুপুরের আগেই সুলতানের সৈন্যরা ক্ষুধার্ত সিংহের মতো গর্জন দিয়ে আল্লাহ আকবার ধ্বনিতে আকাশ-বাতাস মুখরিত করে পাহাড়ের উপর থেকে নীচের দিকে তুফানের মতো ধেয়ে এলো। ভীমপালের সৈন্যরা আকস্মিক এই আক্রমণে প্রতিরোধের অবকাশই পেলো না। ওঁৎ পেতে ফাঁদ তৈরি করে রাখা হিন্দু সৈন্যরাই ফাঁদে আটকে গেলো। অবস্থা বেগতিক দেখে দাদা জয়পালের মতো ভীমপালও নিজের জীবন নিয়ে পালিয়ে গেলো। যাওয়ার আগে সে নির্দেশ দিলো, সকল সৈন্য বাংকার থেকে বেরিয়ে লাহোর রক্ষার চেষ্টা করো।

ভীমপালের ভাগ্য প্রসন্ন ছিলো যে, সে পালাতে সক্ষম হয়েছিলো। অল্পক্ষণের মধ্যেই শক্রবাহিনীর কেন্দ্রীয় কমান্ড নিঃশেষ হয়ে গেলো। হিন্দু বাহিনীর পতাকাও গায়েব হয়ে গেলো। পতাকা গায়েব ও কেন্দ্রীয় কমান্ড না থাকায় হিন্দু বাহিনী দিঘিদিক ছেটাছুটি করতে শুরু করলো আর সুনিয়ন্ত্রিত ও লক্ষ্যভেদী গজনী বাহিনীর সৈন্যরা অল্প সময়ের মধ্যেই গোটা এলাকা শক্রমুক্ত করে ফেললো।

যুদ্ধ শেষে গজনী বাহিনীর হাতে হিন্দু যুদ্ধবন্দিরা জানিয়েছে, রাজা ভীমপাল পরিস্থিতি বেগতিক দেখে কাশীরের দিকে পালিয়ে গেছে। সুলতান মাহমুদ ভীমপালের প্রতি এতোটাই ক্ষুর ছিলেন যে, তিনি একটি সেনা ইউনিট নিয়ে ভীমপালের পশ্চাদ্বাবন করলেন। কাশীরে বিলাম নদীর তীরে অবস্থানরত হিন্দু সৈন্যরা সুলতানের অগ্রবর্তী দলকে ঘেরাও করে সবাইকে হত্যা করে। এই সাফল্যে হিন্দু বাহিনীর সেনাপতি সামনে অসমর হয়ে সুলতানের বাহিনীর উপর আক্রমণ করে। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যে তারা বুৰতে পারে, জীবনের সবচেয়ে ভুল কাজটাই তারা করেছে। কিছুক্ষণ ব্যর্থ মোকাবেলা করে অবশ্যে তাদের সবাইকে সুলতানের কাছে পরাজয়বরণ করতে হয়।

বিজয়ের পর সুলতান মাহমুদ ঘোষণা করলেন, এখানকার সকল অধিবাসী যদি ইসলাম ধর্ম প্রচলন করে, তাহলে সকলে বসতি উজাড় করে দেয়া হবে। সুলতানের ঘোষণায় লোকজন দলে দলে ইসলামে দীক্ষা নিতে লাগলো। সেখানকার যুগিরাটিলা নামক স্থানের একটি মন্দিরে একটি মূর্তি ছিলো খুবই পুরনো। হিন্দুরা বিশ্বাস করতো, চল্লিশ হাজার বছরের পুরনো এই মূর্তিটি। সুলতান মাহমুদ পুরনো মূর্তিকে গুঁড়িয়ে দিয়ে মন্দিরটি সম্পূর্ণ নিষ্ঠিত করে ফেললেন। ১১১৪ সালের জুলাই মাসে বিজয়ীবেশে সুলতান মাহমুদ পুনরায় গজনীতে ফিরে এলেন।

## অজেয় দুর্গ

১০১৪ হিজরী সনের শেষ ভাগের ঘটনা। বিলম্ব নদীর তীরবর্তী পাহাড়ের ঢালে সাধারণ একটি দুর্গে সুলতান মাহমুদের কিছুসংখ্যক সৈন্য অবস্থান করছিল। পাঞ্জাবের মহারাজ ভীমপালকে পরাজিত করে সুলতান মাহমুদ এ দুর্গ তাঁর অধীনে নিয়ে এসেছিলেন। পাঞ্জাবের বিজিত এলাকায় সুলতান মাহমুদ তাঁর নিজস্ব শাসনব্যবস্থা চালু করতে পারেননি। কারণ, গ্যানীতে গঙ্গাগোল দেখা দেয়ায় তাকে তড়িঘড়ি করে গ্যানীতে ফিরে যেতে হয়েছিল। পাঞ্জাবের পরাজিত মহারাজার সাথে সুলতানের কৃতজ্ঞি অনুযায়ী তিনি পাঞ্জাবের যে কোন স্থানে তাঁর সেনাবাহিনীর দু'-একটি শিবির স্থাপনের ক্ষমতা লাভ করেছিলেন। তুক্তি মোতাবেক সেনাদের সর্বময় খরচ ভীমপালের বহন করার কথা ছিল।

বালনাথ দুর্গে সুলতান মাহমুদের সৈন্যদের অবস্থান কয়েক মাস হয়ে গেল। মাকরানের অধিবাসী সারওয়াগ নামের ডেপুটি সেনাপতি ছিলেন বালনাথের দুর্গপতি। হঠাৎ একদিন বালনাথ দুর্গে দু'জন অশ্঵ারোহী এলো। আগস্তুকদের একজন একটি মসজিদের ইমাম আর অপরজন গ্যানী বাহিনীর একজন সৈনিক। তারা কাশ্মীরের সীমান্ত এলাকা থেকে এসেছে। দীর্ঘপথ পাড়ি দিয়ে আসায় তারা ছিল পরিশ্রান্ত। তাদের চেহারা ধুলোবালি মাঝে আর শীতের তীব্রতায় টেঁট ফেটে চৌচির।

তাদের চেহারা ছবিই বলে দিছিল, তারা দীর্ঘপথ পাড়ি দিয়ে এসেছে এবং পথিমধ্যে কোন বিশ্রাম ও পানাহার করেনি। এরা বালনাথ দুর্গে এসেই দুর্গরক্ষক সরওয়াগের কাছে চলে এলো।

“আপনারা খুবই ক্লান্ত। কিছুক্ষণ বিশ্রাম করুন, এরপর আমি আপনাদের কাছ থেকে ওখানকার খৌজ খবর জানবো।”

“ওখানকার যে ভয়াবহ পরিস্থিতি তার চেয়ে আমাদের চেহারা মোটেও খারাপ হয়নি সম্মানিত দুর্গপতি।” বললেন আগস্তুক ইমাম।

“তাই! কী হয়েছে? হিন্দুরা কি আমাদের লোকজনকে বন্দী করে রেখেছে? উদ্ধিগুকষ্টে জিজ্ঞেস করলেন সারওয়াগ! হিন্দুরা কি আপনাদেরকে ইসলামের

প্রচার কাজে কোন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে? সুলতানের নির্দেশ বাস্তবায়নে হিন্দুরা আপনাদেরকে বাধা দিচ্ছে?”

“না, এমন কিছুই হয়নি। আমি বাধ্য হয়েই এই সিপাহীকে সঙ্গে নিয়ে এসেছি। সে ঘটনা নিজের ঢোকে প্রত্যক্ষ করেছে।... আমি নিজেও সৈনিক, শুধু ইমাম নই। আপনার এমনটি ভাববার অবকাশ নেই যে, আমি ভীত-সন্ত্রন্ত হয়ে ওখান থেকে পালিয়ে এসেছি। কাশীর যাদুগরদের স্বর্গরাজ্য। এছাড়া ওখানে এক প্রকার অস্বাভাবিক অদৃশ্য শক্তি রয়েছে, যারা মানুষকে নানাভাবে ধোঁকা দেয়। এই অস্বাভাবিক শক্তি জিনও হতে পারে, মানুষের প্রেতাঞ্চাও হতে পারে।” বললেন ইমাম।

“মনে হচ্ছে, আপনারা হিন্দুদের যাদুটোনার শিকার হয়েছেন। বললেন দুর্গপতি সারওয়াগ। আপনি যা বলছেন, এসব কথা এতো সহজে আমার পক্ষে বিশ্঵াস করা কঠিন। সুলতান ব্যক্তিগতভাবে আমাকে বহু যাচাই-বাছাই করে দুর্গপতির দায়িত্বে নিযুক্ত করেছেন। তাকে আমার সম্পর্কে বলা হয়েছিল, সেনাপতি সারওয়াগ কুসংস্কার ও অপপ্রচারে প্রভাবিত ও ভীত-সন্ত্রন্ত হওয়ার মতো ব্যক্তি নয়। আপনি হিন্দুস্তানে জনগ্রহণকারী মানুষ। হিন্দুদের নানা কুসংস্কার ও ভৌতিক ধ্যান-ধারণায় বিশ্বাসী পরিবেশে বড় হয়েছেন। অর্থ এখন আপনি মুসলমানদের ইমাম। একজন ইমামকে অবশ্যই বাস্তববাদী ও দ্রুদর্শী হওয়া উচিত। কারণ, আপনি সমাজের পরিচালক। সাধারণ মানুষ আপনাকে অনুসরণ করবে।

“সম্মানিত দুর্গপতি! এতদূর থেকে নাওয়া-খাওয়া, ঘুম-বিশ্রাম ত্যাগ করে অবিরাম সফর করে আপনার কাছে ছুটে এসেছি, আপনাকে বুঝতে হবে ব্যাপারটি সাধারণ কোন ঘটনা নয়। আপনার পক্ষে ঘটনার ভয়াবহতা কল্পনা করাও কঠিন। তাই আপনি আমার সবকথা শোনার আগেই বলে দিয়েছেন আমি বাস্তববাদী নই। বললেন ইমাম।

আমি একথা এজন্য বলেছি যে, আপনারা ওখানকার ঘটনা বলতে গিয়ে যাতে আবেগাপ্রবণ হয়ে বাড়িয়ে না বলেন।” বললেন দুর্গপতি। যা হোক, এখন আপনি যা বলতে চাচ্ছিলেন বলুন।

“প্রকৃতিগতভাবেই কাশীর এমন শোভামণ্ডিত অঞ্চল যে, মনে হয় কাশীর দুনিয়ার কোন ভূখণ্ড নয়, যেন এটা মানুষ নয়- জিন্নাতের আবাসস্থল। কখনো

মনে হয়, এ ভূখণ্ড হয়তো মর্তের মানুষের আবাসস্থল নয়, এখানে ওইসব  
মানুষের ঝুহেরা বাস করে, যারা সবাই জান্নাতী।” বললেন ইমাম।

“ঝুহ আল্লাহ তায়ালার একটি আমানত। মানুষ মরে গেলে ঝুহ আল্লাহর  
দরবারে চলে যায়। বললেন, দুর্গশাসক সারওয়াগ। কোন ঝুহ জমিনে বসবাস  
করে না। আপনি কল্পনা আর স্বপ্নের কথা বলবেন না সম্মানিত ইমাম। আসলে  
আপনি ওখানে কী দেখে এসেছেন, হ্বহু সেই কথা বলুন।

“আমরা ওখানে গিয়ে মানুষকে ইসলামের মৌলিক আকীদা-বিশ্বাস  
সম্পর্কে অবহিত করছিলাম। আমরা তাদেরকে নামায পড়াতে শুরু করি এবং  
মুসলমানদের করণীয় সম্পর্কে তাদের জানাতে থাকি। এ কথাও বুঝাতে চেষ্টা  
করেছি। আল্লাহর সাথে মুসলমানদের সম্পর্ক কী? ওখানকার লোকজন  
সুলতানের নির্দেশে মুসলমান হয়ে গিয়েছিল বটে; কিন্তু আমরা তাদেরকে  
ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত করার উদ্যোগ নিলে তারা মনে প্রাণে ইসলাম ধ্রহণ  
করতে শুরু করে।

কিছুদিন পর সেখানে রাতের বেলায় বিশ্বয়কর এক আলোর ঝলকানী  
দেখা দেয়। অথচ তখন আসমানে না কোন মেঘ ছিল, না বৃষ্টি-বাদলের লক্ষণ  
ছিল। আমি যে গ্রামে ছিলাম এক পর্যায়ে ওই গ্রামেও অন্তু বিজলী দেখতে  
পাওয়া যায়। একদিন রাতের বেলায় সেই গ্রামের মাঠে ঘোড়া দৌড়ানোর  
আওয়াজ শোনা যায়। এমন নয় যে, আওয়াজটি কাছে থেকে শুরু হয়ে দূরে  
মিলিয়ে যেত, বরং কাছে থেকেই আওয়াজটি শোনা যেত এবং কিছুক্ষণের  
মধ্যেই তা হারিয়ে যেত।

একদিন দিনের বেলায় কাঠুরিয়া লোকজন জঙ্গলে কাঠ সংগ্রহে গেলে তারা  
জঙ্গলের মধ্যে নারীকষ্টের কান্নার আওয়াজ শুনে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে দৌড়ে পালিয়ে  
এলো। তারা এসে এই খবর শোনালে অন্য লোকজন জঙ্গলে কোন বিপদাপ্ন  
নারীর কান্না কি-না তা যাচাই করতে গিয়ে কোন জনমানুষের অস্তিত্বই জঙ্গলে  
ঝুঁজে পায়নি।

একদিন রাতের বেলায় বিপন্ন নারীকষ্টের কান্না শোনা গেল। নারীর কান্না  
থেমে যাওয়ার পর জলদগঞ্জির কষ্টের আওয়াজ ভেসে এলো... ‘দেব-দেবীদের  
অভিশাপ পতিত হবে... পাহাড় ফেটে যাবে... বনে আগুন জুলবে... সাবধান!  
দেব-দেবীদের বিরুদ্ধাচরণ করে তাদের অসন্তুষ্ট করো না।’

ইয়াম আরো বললেন, এসব কথা শুনে আমি তাদের বোঝাতে চেষ্টা করেছি, দেবদেবীদের কোন অঙ্গিত্ব নেই, এসব দেখে তোমাদের ভয় পাওয়ার কিছুই নেই। তোমরা সর্বাবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ করবে। কিন্তু বুঝতে পারলাম, আমার আশ্বাসবাণীতে তারা আশ্঵স্ত হতে পারছে না। এই ঘটনার চার/পাঁচ দিন পর পার্শ্ববর্তী গ্রাম থেকে চারজন লোক ভীত-বিহুল অবস্থায় আমাদের গ্রামে এলো। তারা এসে জানাল, তাদের গ্রাম সংলগ্ন একটি পাহাড় ফেটে গেছে। ফাটা পাহাড় থেকে একটু পর পর আগনের ক্ষুলিঙ্গ বের হচ্ছে। মাঝে মধ্যে ভেঙ্গে পড়ছে পাহাড়ের অংশবিশেষ। ভাঙা পাহাড়ের আশপাশে অস্তুত আকৃতির মানুষের আনাগোনা তারা দেখতে পেয়েছে।

এসব ভীতিকর কাহিনী শুনে আমার গ্রামের লোকজন এতটাই ভীত হয়ে পড়ল যে, তারা গ্রাম ছেড়ে পালিয়ে যাওয়ার জন্য তৈরী হয়ে গেল। আমি যতই তাদের ‘কিছু হবে না’ বলে আশ্বস্ত করতে চেষ্টা করি; কিন্তু তারা ততই ভয়ে আতঙ্কঘন্ট হয়ে পড়ে। আমি গ্রামের মুরুংবীদের বোঝাতে চেষ্টা করি, যা শোনা যাচ্ছে, এগুলো হিন্দু যোগী সন্ন্যাসীদের কারসাজী। এরা সাধারণ লোকজনকে ইসলাম গ্রহণ থেকে ফেরানোর জন্য এসব যাদুটোনা করছে।

সম্মানিত দুর্গাসক! আমি যতই আশ্বাসবাণী শোনাই না কেন, কিছু ঘটনা আসলে এমনও ঘটেছে, যেগুলোর কোন ব্যাখ্যা নেই। কোন অবস্থাতেই এগুলোকে উড়িয়ে দেয়া যায় না। যেমন ধূরুন, রাতের বেলায় পরিষ্কার মেঘহীন আকাশে বিজলী চমকানোর বিষয়টি মানুষকে বোঝানো মুশকিল। মানুষকে কি বোঝাবো, আমার নিজের কাছেই এই বিষয়টির কোন ব্যাখ্যা নেই। তাছাড়া আরো এমন ঘটনাও ঘটেছে, এ সৈনিকের মুখে আপনি তা শনুন।

“আমাদের সেনাচৌকির অবস্থান নদীর পাড়ে।” বললো সৈনিক। হঠাৎ এক রাতে আমরা নারীকষ্টের কান্নার আওয়াজ শুনতে পেলাম। একাধিক নারীর কান্নার আওয়াজ শুনে চৌকির কমান্ডার যুবায়ের সাহেব আমাকে এবং অপর একজন সিপাহীকে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন। যেদিক থেকে কান্নার আওয়াজ ভেসে এসেছিল, আমরা সেদিকে অগ্রসর হলে আওয়াজ থেমে গেল। অপর দিক থেকে দুঁজন পুরুষকে আমরা আসতে দেখলাম। কমান্ডার যুবায়ের জামালী তাদের জিঞ্জেস করলেন, নারীকষ্টের কান্নার আওয়াজ কোন দিক থেকে এসেছেঃ তারা জানালো, কোন নারীর কান্নার আওয়াজ তারা শোনেনি।

ঠিক সেই সময় নারীদের কান্নার আওয়াজ আবার শোনা গেল। কমান্ডার তখন তাদের জিজ্ঞেস করলেন, এই তো কান্নার আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। এই মহিলারা কারাৎ তারা বললো, কোথায়, আমরা তো কারো কান্নার আওয়াজই শুনছি না! আমরা বিশ্বিত হলাম, যে আওয়াজ আমরা দিব্য শুনতে পাচ্ছি, একই আওয়াজ অন্যেরা শুনতে পাচ্ছে না কেন?

সেই দুই ব্যক্তি আমাদের জানালো, এই এলাকায় মাঝে মধ্যে দু'জন তরুণীকে দেখা যায়। যারাই দেখতে পায়, তাদেরকেই ওরা কাছে যেতে ডাকে, কিন্তু কাছে গেলে আর ওদের পাওয়া যায় না। তরুণীরা অদৃশ্য হয়ে যায়। লোক দু'জন আরো কিছু কথা বলতে চাছিল, কিন্তু কমান্ডার জামালী আর কথা না বাড়িয়ে আমাদের নিয়ে চৌকিতে ফিরে এলেন। পরদিন সন্ধার পর যুবায়ের জামালী আমাকে ও অপর এক সাহসী সৈনিককে সাথে নিয়ে বের হয়ে বললেন, তিনি গতরাতের কান্নার রহস্য উদ্ঘাটন করতে চান। আমাদের চৌকির ধারে-কাছে কোন জনবসতি ছিল না। গোটা এলাকাটি ছিল খুবই সুন্দর। আমরা দু'টি টিলাসম পাহাড়ের মাঝখান দিয়ে যাছিলাম, এমন সময় একটি পাহাড়ের ঢালে আমরা দু'জন তরুণীকে দেখতে পেলাম। ওদের মাথা থেকে পা পর্যন্ত আসমানী রঙের এমন পাতলা কাপড় জড়ানো ছিল যে, ওদের শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলো দূর থেকেই স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল। তরুণীদ্বয়ের মাথা ছিল খোলা, তাদের চুলগুলো ছিল আজানু প্রলম্বিত। ওরা পরম্পর কথা বলছিল আর আমাদেরকে ইশ্বারায় কাছে যেতে আহ্বান করছিল। ওরা যেখানটায় দাঁড়ানো ছিল, সেই জায়গাটি ছিল অসম্ভব সুন্দর। চারদিকে ঘন ঘাস আর বাহুরী রঙের লতাগুলু ও সুশোভিত ফুলগাছের ঝোপঝাড়। জায়গাটি ঘন গাছ গাছালীতে ভরা ছিল। গাছের ডালপালা পরম্পর মিলেমিশে পুরো জায়গাটায় ছাতার মতো আচ্ছাদন তৈরী করেছে। সূর্যের আলো ঘনগাছের পত্রপল্লব ভেদে করে মাটিতে পৌছাতে পারতো না। দাঁড়ানো দু'জনকে মনে হচ্ছিল এই প্রাকৃতিক পরিবেশেরই যেন অংশ। দুই তরুণীকে দাঁড়ানো দেখে আমরা ঠাঁয় দাঁড়িয়ে পড়লাম। তরুণীদ্বয় তাদের অবস্থানেই দাঁড়িয়ে রইল। কমান্ডার যুবায়ের জামালী বললেন, তিনি সামনে এগিয়ে যাবেন। আমরা তাকে বাধা দিলাম। কিন্তু তিনি আমাদের বাধা মানলেন না। আমরা ঠাঁয় দাঁড়িয়ে রইলাম। তরুণী দু'জনের একজন হাতের ইশ্বারায় যুবায়ের জামালীকে কাছে ডাকল।

আমাদের নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করে কমান্ডার এগিয়ে গেলেন। কিন্তু তিনি তরুণীদের কাছে যাওয়ামাত্রই অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

সে কি বাতাসে মিলিয়ে গিয়েছিল? দুর্গশাসক সারওয়াগ জানতে চাইলেন।

“না, বাতাসে মিলিয়ে যায়নি— খুব দ্রুত জমিনে তলিয়ে গেল। বললো সিপাহী।

“আমরা তাকে জমিনে তলিয়ে যেতে দেখে যখন তরুণীদের দিকে তাকালাম, তখন আর তরুণীদয়কে ওখানে দেখতে পেলাম না। এই অবস্থা দেখে আমরা ভয়ে ওখান থেকে পালিয়ে এলাম। এই ব্যক্তি আমাদের এলাকার ইমাম। আমরা এসে তাকে এই ঘটনা জানালাম। মনে হলো, ইনি এসব ঘটনায় আগে থেকেই ভীত।”

“আমার জীবন নিয়ে আমার কোন ভয় নেই। আমার ভয় হচ্ছে, ইতোমধ্যে আমরা যেসব লোককে ইসলামে দীক্ষিত করেছি, তারা আবার ইসলাম থেকে পৌত্রিকতায় ফিরে যাবে।” বললেন ইমাম।

ওখানকার অধিবাসীরা বিশ্঵াস করতে শুরু করেছে, তারা যেহেতু হিন্দুত্ব ছেড়ে ইসলাম গ্রহণ করেছে, তাই তাদের উপর দেবদেবীদের গ্যব আপত্তি হচ্ছে। এজন্যই তাদেরকে শাস্তি দেয়ার জন্য আসমানী মাখলুক জমিনে নেমে এসেছে।”

চৌকির সৈন্যদের মধ্যেও এই ধারণা ছড়িয়ে পড়েছে যে, সুলতান এখানে ক্ষমতাবলে মানুষকে ইসলাম গ্রহণের নির্দেশ দিয়েছেন, এজন্যই এসব অঙ্গভাবিক ঘটনা ঘটছে। বললো সৈনিক। কমান্ডার যুবায়ের জামালীর জমিনে দেবে যাওয়ার ঘটনাটি এমনই প্রভাব সৃষ্টি করেছে যে, যেই শোনে, তার চেহারাই বিবর্ণ হয়ে যায়। চৌকির সকল সৈন্যই এখন নানা সংশয় ও কুসংস্কারে প্রভাবিত হয়ে পড়েছে।”

‘তোমাদের মধ্যে কি এমন সাহসী কেউ ছিল না যে কমান্ডার যে জায়গায় জমিনে দেবে গেছে, সেই জায়গাটিতে গিয়ে বিষয়টির কারণ অনুসন্ধান করবে? পাহাড়ী এলাকায় ঘাস ও ঝোপ ঝাড়ের মধ্যে অনেক গভীর গর্ত থাকে। তাছাড়া এমনটিও তো হতে পারে, ওখানে গর্ত তৈরী করে রাখা হয়েছে আর এই দুই তরুণী প্রেফ হিন্দু যোগী-সন্ন্যাসীদের যাদুর অংশ হিসেবেই এমন মোহম্মদ আচরণ করেছে?’

সম্মানিত ইমাম, আপনি কি দৈমানের শক্তি সম্পর্কে জ্ঞাত নন? আপনি কি জানেন না, দৈবান শক্তিশালী হলে তার উপর কোন যাদুটোনাই কার্যকর হতে পারে না?

দুর্গশাসকের এ কথায় ইমাম নীরব হয়ে গেলেন, সিপাহীর কর্ত্ত্বেও আর কোন কথা উচ্চারিত হল না।

“ঠিক আছে, আমি আপনাদের সাথেই যাচ্ছি। এখানে সুলতান আমাকে শুধু শাসনকাজ চালানোর জন্য নয়, ইসলামের প্রচার-প্রসার ও ইসলামের পাহারাদার নিযুক্ত করেছেন। বললেন দুর্গশাসক সারওয়াগ।

এটা কোটলী কাশীরের ঘটনা। দক্ষিণ কাশীরের এই এলাকাটিতে তখন ছিল কোটলী রাজাদের রাজত্ব, যা পুঁজি পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। রাজুরী এলাকায় লোহা কোট নামের একটি সুরক্ষিত দুর্গ ছিল। পাহাড়ের উপর অত্যন্ত মজবুত এই দুর্গ ছিল বহিরাক্রমণ থেকে অত্যন্ত সুরক্ষিত। সেই দুর্গের রাজা ছিল নন্দরায়। পাঞ্জাবের যে কোন রাজা যুদ্ধে পরাজিত হলে কোটলীর লোহাকোট দুর্গে গিয়ে আশ্রয় নিতো। কারণ, এই দুর্গটি ছিল অঙ্গের ও অঙ্গভাবিক মজবুত। রাজা জয়পাল সুলতানের কাছে শেষবারের মতো পরাজিত হয়ে এই দুর্গেই এসে আশ্রয় নিয়েছিলেন। জয়পালের ছেলে আনন্দপালও সুলতান মাহমুদের হাতে পরাজিত হয়ে এই দুর্গেই এসে আশ্রয় নিয়েছিলো। রাজা ভীমপালকে টোল্লায়ুগিয়া নামক স্থানে সুলতানের সৈন্যরা পরাজিত করার পর সেও কাশীরের কোন অঞ্চলে এসেই আশ্রয় গ্রহণ করে।

পূর্বেই বলা হয়েছে, সুলতান মাহমুদ রাজা ভীমপালকে তাড়া করে কাশীর পর্যন্ত পৌছে গিয়েছিলেন। কাশীরের রাজা নন্দরায়ের এক সেনাপতি তৎক্ষণাৎ সুলতান মাহমুদের প্রেরিত-অগ্রগামী দলকে ঘেরাও করে প্রায় নিচিহ্ন করে দিয়েছিলেন। কিন্তু এই ক্ষতির জন্য তৎক্ষণাতেও চড়ামূল্য পরিশোধ করতে হয়। সুলতান নিজে তৎক্ষণাতে তার দলবলসহ পাকড়াও করে যুদ্ধবন্দী করে ফেলেন। তৎক্ষণাতেও এই ক্ষয়ক্ষতিতে সুলতান এতটাই স্কুল হয়েছিলেন যে, তিনি তৎক্ষণাতেও সকল সহযোগিকে হত্যা করে তাদের মরদেহ খিলম নদীতে ভাসিয়ে দিয়েছিলেন। এর পর বিজিত এলাকায় সুলতান ফরমান জারী করেন, যারা ইসলাম গ্রহণ করবে না, তাদের গ্রাম ছাড়া করা হবে। ইসলাম গ্রহণ করলে তাদেরকে সকল নাগরিক সুবিধাসহ সরকারীভাবে তাদের ধন-জন্ম ও ইজজত-আকুর নিরাপত্তা দেয়া হবে।

দুর্গ থেকে বাইরে এসে সুলতানের মোকাবেলা করার সাহস হয়নি রাজা নন্দরায়ের। তার সামরিক শক্তি অনেকাংশেই দুর্বল হয়ে পড়েছিল। সুলতান মাহমুদ নন্দরায়ের এলাকায় পৌছে রাজা নন্দরায়ের কাছে পয়গাম পাঠালেন, তিনি যেন রাজা ভীমপালের মতোই তার বশ্যতা স্বীকার করে নিয়ে খিরাজ দিতে স্বীকারেওভিমূলক সঞ্চিত করেন। রাজা নন্দরায় সুলতানের বশ্যতা স্বীকার করে নিয়ে তাকে খাজনা দিতে সম্মতি জানান। ফলে সুলতান ও রাজা নন্দরায়ের মধ্যে সঞ্চিত স্থাপিত হয়। চুক্তিতে শর্ত ছিল, নন্দরায়ের নিয়ন্ত্রিত যে কোন জায়গায় সুলতান ইচ্ছে মতো দু'তিনটি সেনাটোকি স্থাপন করতে পারবেন এবং একজন শাসকের অধীনে গোটা এলাকার নিরাপত্তা নিয়ন্ত্রিত হবে। নাগরিক ট্যাক্স রাজা নন্দরায়ই আদায় করবেন। কিন্তু তিনি সুলতানের সৈন্যদের সর্বিক ব্যয় নির্বাহ করবেন এবং বার্ষিক একটি মোটা অংকের সমানী বিজয়ী সুলতানকে দিতে বাধ্য থাকবেন।

সুলতান মাহমুদ বিজিত এলাকার সকল সাধারণ মানুষকে ইসলামে দীক্ষা নেয়ার নির্দেশ জারী করেন। সেই সাথে এই নোটিশও জারী করেন, পেশোয়ার, লাহোর, মুলতান ও বেরায় ইসলাম শিক্ষা দেয়ার মতো পারদর্শী কয়েকশত শিক্ষককে যেন কাশীর এলাকায় পাঠিয়ে দেয়া হয় এবং এখানকার নওমুসলিমদের ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলা হয়। এসব জরুরী নির্দেশনা দেয়ার পর কেন্দ্রের গোলযোগের খবর পেয়ে তিনি দ্রুত রাজধানী গফনীতে ফিরে যান।

একাধিক ঐতিহাসিক বর্ণনা করেছেন, সুলতান মাহমুদ বলেছিলেন, 'কারো উপর কোন ধর্মত চাপিয়ে দেয়া যায় না। আমি যদিও কাশীরের সকল মানুষকেই মুসলমান হয়ে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছি, কিন্তু আমি অমুসলিমদের এই অভিযোগ প্রমাণ করতে চাই না যে, বিজিত রাজ্যের নাগরিকদের উপর সামরিক শক্তিবলে ইসলাম চাপিয়ে দেয়া হয়েছে।

সুলতান বললেন, কাশীরের লোকজন গোয়াড় ও অশিক্ষিত। এরা শাসকদের যে কোন নির্দেশকেই ধর্মীয় নির্দেশের মতো অলজনীয় মনে করে। এদের রাজা মহারাজার ইচ্ছা অনিচ্ছাই এদের ধর্ম। আমি এদের একথা বোঝাতে চাই যে, ধর্মের বিধি-নিমেধের সম্পর্কে কোন শাসক কিংবা রাজা-মহারাজাদের সাথে নয়। ধর্মের সম্পর্ক একান্তই আল্লাহর সাথে। আর

আল্লাহ বা মারুদকে মাটি-পাথর দিয়ে বানানো যায় না। এই এলাকায় যদি কিছু মসজিদ তৈরী করে দেয়া যায়, তাহলে সেখানে উচু নীচু শাসক শাসিত একই সারিতে নামায পড়লে তারা বুঝতে পারতো, ইসলাম ধর্ম শ্রেণী বৈষম্য সমর্থন করে না। ধর্মের দৃষ্টিতে সকল মানুষ সমান। আল্লাহর কাছে মানুষ হিসেবে সবাই এক। রাজা হোক প্রজা হোক, শাসক হোক, কিংবা শাসিত, সবার মাথা-ই একসাথে একই মাটিতে আল্লাহর উদ্দেশ্যে সিজদায় অবনত হয়।

খ্যাতিমান অমুসলিম ঐতিহাসিক স্যার আর্লিংটন এর ভাষায় সুলতান মাহমুদ বলেছিলেন, ‘যদি বিজিত এলাকার গণমানুষের কাছে ইসলামের মহত্ত্ব কল্যাণকামিতা বাস্তবস্থাপ্তভাবে উপস্থাপন করা না হয়, তাহলে গণমানুষের মধ্যে এই ভুল ধারণা সৃষ্টি হবে যে, সুলতান বলেন এক আর করেন আরেক, যা সুলতানের ভাবমর্যাদা বৃদ্ধি ও ক্ষমতা সংহত করার জন্য সহায়ক, তা-ই তিনি করেন। ফলে নতুন মুসলমানরা ধর্ম থেকে নিরুৎসাহিত হয়ে ধর্মচূর্ণত হয়ে যেতে পারে। আমার সালাতানাতের মধ্যে কোন মুসলমানের ধর্মচূর্ণতিকে আমি বরদাশ্র্ত করবো না। সাধারণ মানুষকে এটা বুঝিয়ে দিতে হবে তাদের প্রতু কে, তাদের রাসূল (সা.)-কে এবং তাদের ধর্মের বিধি-নিষেধ কী?'

মহারাজা নন্দরায়ের শাসনকার্য দুটি দুর্গের ভেতরে বন্দী হয়ে পড়েছিল। আর দুর্ঘের বাইরে বিজিত রাজ্যে সুলতান মাহমুদ আল্লাহর নির্দেশ মতো আল্লাহর রাজত্ব প্রতিষ্ঠার নির্দেশ দিয়েছিলেন। কাশ্মীরের নওমুসলিমদের ধর্ম শিক্ষা দেয়ার জন্য পেশোয়ার, লাহোর, মুগ্ধতান ও বেরো থেকে ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত বহুসংখ্যক লোক এনে নতুন এলাকায় ধর্মীয় শিক্ষা ও ইমামতি করার জন্য ছড়িয়ে দেয়া হয়েছিল। কাশ্মীর এলাকায় তৈরী করা হয়েছিল বহু মসজিদ। প্রায় প্রতিটি থামেই কাঠ দিয়ে একটি করে মসজিদ নির্মাণ করা হয়।

তৎকালীন ভারতের এই এলাকাটির সাধারণ মানুষের ধর্ম বলতে তাদের রাজা-মহারাজাদের তোষণই ছিল প্রধান স্তুতি।

রাজা-মহারাজাদেরকেই এই এলাকার সাধারণ প্রজারা দেবতার জাগতিক প্রতিনিধি বলে বিশ্বাস করতো। আসলে এদের ধর্মবিশ্বাস ছিলো জীবনে বেঁচে থাকা আর পানাহার করার স্বাধীনতার মধ্যে সীমাবদ্ধ। অবরুদ্ধ, নিষ্পেষিত ও নির্যাতিত এসব লোক যখন মুসলিম সৈন্যদেরকে বিজয়ী বেশে দেখতে পেল,

প্রত্যক্ষ করলো মুসলমানদের সাম্য-মৈত্রী-মানবিকতা ও ভেদাভেদহীন নীতি, তখন হেছায়, বিনা প্ররোচনা ও বলপ্রয়োগ ব্যতিরেকেই তারা দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করে। এসব অঙ্গ-অনভিজ্ঞ নাগরিকদের হৃদয়ে ইসলামের বৌধ-বিশ্বাস মজবুত করার নির্দেশনা দিয়ে সুলতান মাহমুদ জরুরী প্রয়োজনে গ্যন্ধীতে ফিরে যেতে বাধ্য হন। কিন্তু পরাজিত হিন্দু রাজা-মহারাজাদের জন্য সুলতানের এই ইসলাম প্রচার আয়োজন ছিল রাজত্ব হারানোর চেয়েও আরো বেশী বেদনাদায়ক। ভীমপাল কোন সুরক্ষিত দূর্গে আশ্রয় না নিয়ে দুর্গম গ্রামাঞ্চলে গিয়ে আঘাগোপন করলেন। তাকে যখন জানানো হলো, সুলতান মাহমুদ ভারত ছেড়ে গ্যন্ধী চলে গেছেন, তখন রাজা ভীমপাল গোপন আশ্রয়স্থল থেকে বেরিয়ে দুর্গম পথে লাহোর পৌছলেন।

ভীমপালের লাহোর ফিরে আসার সংবাদ শুনে দীর্ঘদিন পর গোটা এলাকার রাজা-মহারাজারা এসে লাহোরে একত্রিত হলেন। শধু রাজা-মহারাজারা নন, ভারতের বিভিন্ন খ্যাতিমান মন্দিরের খ্যাতিমান পুরোহিত পণ্ডিতগণ এসে হাজির হলেন।

ভীমপালের নেতৃত্বে এক বৈঠকে ভারতে ইসলামের ক্রমবর্ধমান বিস্তৃতি রোধের নানা পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা-পর্যালোচনা শুরু হলো। সকল পুরোহিত পণ্ডিত অব্যাহত ব্যর্থতা ও পরাজয়ের জন্য শামরিক শাসক ও নেতাদের ব্যর্থতাকেই দায়ী করছিলেন। কোন কোন পুরোহিত সুলতান মাহমুদকে হত্যার জন্য কার্যকর উদ্যোগ নেয়ার পরিকল্পনা পেশ করলেন। ক্ষীণ আওয়াজে এমনটিও উচ্চারিত হলো, সুলতান মাহমুদকে সিঙ্গু নদের ওপারেই আটকে রাখতে হবে— পেশোয়ারে প্রবেশের সুযোগ দেয়া যাবে না। আর এখানে তার রেখে যাওয়া সৈন্যদেরকে ঘেরাও করে আহার-সামগ্রীর সরবরাহ বক্ষ করে দিয়ে ক্ষুৎপিপাসায় ধুকে-ধুকে মারার ব্যবস্থা করতে হবে। কিন্তু যে যতো যুৎসই প্রস্তাবই উথাপন করুক না কেন, রাজা-মহারাজা ও পুরোহিত-পণ্ডিতদের এই বৈঠকে স্থির কোন যৌথ সিদ্ধান্তে পৌছা সম্ভব হলো না। অনেকটা সিদ্ধান্তহীনতার মধ্যেই শেষ হলো কনফারেন্স।

মূলত অনেকক্ষণ ও সিদ্ধান্তহীনতার মূল কারণ ছিল প্রত্যেক রাজা-মহারাজা ও পুরোহিত পণ্ডিতের নিজ নিজ কর্তৃত্ব ও রাজত্ব অক্ষুণ্ণ রাখার চেষ্টা। এক পর্যায়ে লাহোরের প্রধান পুরোহিত কঠ চড়িয়ে বললেন, সবাই এখন

মুসলমানদের ভয়ে আতঙ্কিত। অথচ সংখ্যায় কিন্তু মুসলমানরা সব সময়ই সামান্য। মুসলমানরা এতোটা দূর থেকে এখানে এসে যুদ্ধ করছে। খৰানকার প্রতিজন মানুষ, ছেলে-বুড়ো সবাই মুসলমানদের শক্তি। এখানকার মাটি-মানুষ সবই মুসলিম সৈন্যদের বৈরী। তারপরও মুসলমানরাই একের পর এক রাজ্য দখল করে নিচ্ছে। আমাদের সবাইকে এ বিষয়টি ভাবতে হবে। কেন এমন হচ্ছে? সুলতান মাহমুদ কি কোন দৈত্য? জিন? না দানব? আসলে সে আপনাদের মতোই একজন মানুষ। তথাপি আপনাদের সবাইকে পরাজিত করছে। এর প্রধান কারণ হলো সে তার ধর্মের অনুশাসন মেনে চলে, সে তার ধর্মের পৃজারী, ধর্মের প্রতি সে নিবেদিত। ধর্মের প্রতি এই নিবেদিতপ্রাণ হওয়াকেই মুসলমানরা বলে ইমান। ধর্মে নিষ্ঠাই তাদের বিজয়ের প্রধান শক্তি। ধর্মের প্রতি আপনাদের এতোটা নিষ্ঠা নেই। ধর্মের চেয়ে আপনারা নিজেদের ক্ষমতা, মর্যাদা ও রাজত্ব নিয়ে বেশী ব্যস্ত।

প্রধান পুরোহিতের একথায় রাজা-মহারাজাদের মজলিসে নেমে এলো নীরবতা। পুরোহিত এই নীরবতা দেখে সবার দিকে দৃষ্টি ঘুরিয়ে নিয়ে জলদগঞ্জির কঠে বললেন-

“হিন্দুস্তান হিন্দুদের দেশ, দেবদেবীদের দেশ। এটা আঘাত আকবার এর দেশ নয়। এটা হরেকৃষ্ণ হরিহরি মহাদেব এর দেশ। কিন্তু দেবদেবীদের দেশ হলে কি হবে, এদেশে এখন দেবদেবীদের কী ধরনের অবমাননা করা হচ্ছে, তা আপনারা দিব্য দেখতে পাচ্ছেন। এই ধরিত্বা চিত্কার করে বলছে, সে তার উপরে বিচরণকারী এক মুসলমানের বোবাও সহ্য করতে পারে না। আপনারা যদি ধরিত্বা এই চিত্কার শুনতে না পান, অনুধাবন না করেন, তাহলে আমাদের ভবিষ্যত বংশধর ও নতুন প্রজন্ম মুসলমানদের গোলামে পরিণত হবে এবং শ্রীকৃষ্ণের বাঁশী চিরদিনের জন্য শুন্দ হয়ে যাবে। তাই ভবিষ্যত প্রজন্ম ও অনাগত বংশধরদেরকে এই অভিশাপ থেকে রক্ষা করতে হবে।

আপনারা শ্রবণ করুন, আমাদের পূর্বপুরুষরা মুহাম্মদ বিন কাসিমের রোপিত ইসলামের বৃক্ষটিকে হিন্দুস্তান থেকে কিভাবে উপড়ে ফেলতে সক্ষম হয়েছিল। অথচ সেই বৃক্ষ কিন্তু মহিরুহে পরিণত হয়েছিল। চন্দ্রগুণ আর অশোকের এই দেশের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছিল বিন কাসিমের রোপিত ইসলামের শিকড়; কিন্তু আমাদের মহান পণ্ডিত ও ঝৰিগণ হৃদয়ে ধর্মের

জগমালা নিয়ে ভগবানের নামে অসীম সাহসিকতা ও কৌশলের মাধ্যমে হিন্দুস্তানে ছড়িয়ে পড়া আয়ানের ধ্বনিকে মিটিয়ে দিতে সক্ষম হয়েছিলেন।

যে পাপের শাস্তি আপনাদের প্রত্যেকেই ভোগ করতে হচ্ছে, তাহলো আপনারা সবাই সুলতান মাহমূদের এই যুদ্ধকে রাজ্যপাটের বিরুদ্ধে আক্রমণ মনে করছেন। এই ভুল ধারণা আপনাদের ত্যাগ করতে হবে। আপনাদের বুঝতে হবে, এই যুদ্ধ দু'টি শাসকগোষ্ঠীর লড়াই নয়, এই যুদ্ধ দু'টি ধর্মের লড়াই। দুই ধর্ম ও বিশ্বাসের এই লড়াইয়ে ক্রমাগতভাবে ইসলাম বিজয়ী হচ্ছে। মহারাজা ভীমপালের শুধু পরাজয় ঘটেনি। এখানে হিন্দুবাদের পরাজয় ঘটেছে। পরাজয় ঘটেছে দেবদেবী ও ভগবানে বিশ্বাসীদের। কালাঞ্জরের গোটা এলাকায় হাজারো মৌলভী ও ইমামদের ছড়িয়ে দেয়া হয়েছে। থামে থামে তৈরী করা হয়েছে মসজিদ। ইসলাম যদি এসব মানুষের হৃদয়ে বন্ধমূল হয়ে পড়ে, তবে আর কোনদিন কারো পক্ষেই এদেশ থেকে ইসলামকে বিতাড়িত করা সম্ভব হবে না।

“মাননীয় পঞ্চিত, এসব কথা আমাদের জন্য নতুন নয়, বললেন ভীমপাল। এখন আমাদের ভাবা উচিত, কালাঞ্জরের এলাকায় যেভাবে ইসলামের বীজ বপন করা হচ্ছে, তার প্রতিরোধ ব্যবস্থা নিয়ে চিন্তা করা। আমি স্বীকার করে নিছি, আমি যুক্তে সুলতান মাহমূদের কাছে পরাজিত হয়েছি, আমার সেনাবাহিনীও ব্যর্থ হয়েছে। কিন্তু সেটিই শেষ কথা নয়। আমাদের আবারো চেষ্টা করতে হবে। একটি চূড়ান্ত লড়াইয়ের জন্য হিন্দুস্তানের সকল রাজা-মহারাজার সহযোগিতা দরকার।”

“আপনি পরাজয় স্বীকার করেছেন। এটাও আপনাকে মেনে নিতে হবে যে, ভবিষ্যতেও আপনি আরো পরাজয়ের সম্মুখীন হবেন।” বললেন পুরোহিত। এবারের যুক্তে যদি চূড়ান্ত বিজয় ছিনিয়ে আনা না যায়, তবে প্রস্তুতির জন্য সময় নষ্ট করা হবে নিতান্তই সময়ের অপচয়। এ মুহূর্তে সবচেয়ে বড় প্রয়োজন কালা রে যেভাবে সাধারণ প্রজাদের মুসলমান বানানো হয়েছে এবং তাদের হৃদয়ে ইসলামকে বন্ধমূল করার চেষ্টা চলছে, তা প্রতিহত করা।”

“কী করবেন? এখন তো আর আপনার পক্ষে সেখানে গিয়ে ধর্মপ্রচার করা সম্ভব নয়।” পুরোহিতের উদ্দেশ্যে বললেন কালাঞ্জরের রাজা নন্দরায়। কেননা, মাহমূদের সৈন্যরা সেখানে চৌকি স্থাপন করে শাসনকার্য চলাচ্ছে। মুসলিম

সৈন্যরা রাত-দিন টহল দেয়। আমি শুনেছি, মাহমুদ নাকি নির্দেশ দিয়েছে, কাউকে যদি হিন্দুধর্ম প্রচার করতে পাও, তবে তাকে সেখানেই হত্যা করবে। কালাঞ্জরে আমার দুর্গ ছাড়া আর কোথাও এখন আর হিন্দুধর্মের পূজা-অর্চনা নেই। দুর্গের বাইরে সবখানেই ইসলাম ধর্মের চৰ্চা, ইসলাম ধর্মের আলোচনা। আপনি যে সব ইসলাম প্রচারক ও ইসলামের কথা বলেছেন, তারা পুরোমাত্রায় মুসলিম সৈন্যদের সহযোগিতা পাচ্ছে।”

‘তরবারী দিয়ে সব কাজ হয় না’ বললেন রাজা ভীমপালের প্রধান উজির। “যাদু চালাও। ওরা যদি শক্তির জোরে মানুষকে ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করে থাকে, আমরা তরবারীর শক্তি প্রয়োগ ছাড়াই আবার এসব লোককে ইসলাম থেকে বিচ্যুত করতে পারি। আমরা এসব লোকের মনে ইসলাম সম্পর্কে সংশয়-সন্দেহ জন্মাতে পারি। এসব বিষয়ে যারা অভিজ্ঞ, তাদের ডাকা হোক, তাদেরকে একাজ চালানোর ব্যবস্থা করা হোক। কালাঞ্জরের মাটি, মানুষ, ভূপৃষ্ঠা, সুবিধাবাদী যাদুটোনার কারিশমা প্রদর্শনের জন্য খুবই উপযোগী। কালাঞ্জরের লোকদের মনে ভয়ানক আতঙ্ক সৃষ্টি করুন এবং অস্বাভাবিক দৃশ্যের অবতারণা করুন। যে অল্পসংখ্যক সৈন্য সুলতান মাহমুদ রেখে গেছে, তাদের মনেও আতঙ্ক সৃষ্টি করুন, সেই সাথে ওদেরকে ঝুপসৌন্দর্য ভোগবাদের ফাঁদে ফেলে বেকার করে দিন। গোপন ও অদৃশ্য কর্মকাণ্ডের দ্বারা যদি আমরা মুসলমানদের মোকাবেলায় এখনই কার্যক্রম শুরু না করি, তাহলে মুসলমানদের ইমানী শক্তি বেড়ে যাবে, তখন ওদের মোকাবেলা করা আমাদের জন্য আরো কঠিন হবে।”

“হ্যাঁ, মানুষের সৃষ্টিগত দুর্বলতাগুলোতে কাজে লাগাতে হবে।” উজিরের কথাকে সমর্থন করলেন প্রধান পুরোহিত। প্রেম ও ভয় সকল মানুষের মধ্যেই বিদ্যমান এবং এটি একটি প্রকৃতিপ্রদত্ত ও দুর্বলতা। ভালোবাসা ও প্রেমের আহ্বান মিথ্যা হলেও যে কোন মানুষের পক্ষেই তা তাৎক্ষণিক প্রত্যৰ্থ্যান করা কঠিন। মুসলিম সৈন্যদেরকে প্রেমের বিষ পান করিয়ে বিগড়ে দাও, তাহলে ইসলামের প্রচারক আর নওমুসলিম সবাই তোমাদের এই জালে আটকে যাবে।

রাজনৈতিক সমাধানের পথে যখন কোন ঐক্যমত্য প্রতিষ্ঠা ছাড়াই বৈঠক ভেঙে যেতে উপক্রম হয়েছিল, ঠিক সেই মুহূর্তে প্রধান পুরোহিতের চানক্য কৌশল সবাইকে আশ্঵স্ত ও ঐক্যবদ্ধ হতে সাহায্য করল। এটা ছিল এমন

প্রস্তাব যাতে সবাই একমত পোষণ করল এবং এ প্রক্রিয়া জোরদার করার তাগিদ অনুভব করল ।

১০১৪ সনের শেষের দিনগুলোতে দক্ষিণ কাশীরে বিজিত এলাকাগুলোতে ইসলাম গ্রহণকারী হিন্দু নওমুসলিমদের বিভাগ এবং মুসলিম সৈন্যদেরকে বেকার করে দেয়ার জন্য শুরু হলো হিন্দু যোগী-সন্ন্যাসী ও পুরোহিতদের ঘান্দু-টোনার আগ্রাসন । বলতে গেলে তখন হিন্দু পুরোহিতদের রাজত্ব ছিলো গোটা ভারত জুড়ে । যেসব গ্রামে কোন অস্বাভাবিক ঘটনার দৃশ্য কেউ দেখেনি, সেসব গ্রামে বাতাসে ভর করে প্রচারিত হচ্ছিলো যতোসব ভৌতিক কাহিনী । গুজবের পাল্লা এতোটাই ভারী ছিলো যে, অমুক গ্রামে পাহাড় থেকে আগুন বের হচ্ছে, মেঘবৃষ্টিহীন আকাশে বিজলী চমকাচ্ছে, অমুক গ্রামে পথচারীদের পথ আটকে দিয়েছে সুন্দর প্রেতাঞ্চা । লোকমুখে এসব কাহিনী শুনেই মানুষের অস্তরাঞ্চা ভয়ে কেঁপে উঠতো । ভয় এক সময় পরিণত হতো সামাজিক আতঙ্কে । এমন গুজবও প্রচার পেয়েছিলো যে, গয়নী বাহিনীর লোকেরা ধরে নিয়ে জবাই করে মাংস খেয়ে ফেলছে ।

সুলতান মাহমুদের সেনাচৌকির কমান্ডার যুবায়ের জামালীর মাটিতে ধসে যাওয়ার কাহিনী ছিল মারাঞ্চক ভয়ঙ্কর । এই ভয়ঙ্কর সংবাদটি সারওয়াগকে অবহিত করা জরুরী ছিল । কারণ, সারওয়াগ ছিলেন কালাঞ্জর অঞ্চলের আঝগ্লিক প্রশাসক । সকল ছোট ছোট সেনাচৌকি ছিলো তার অধীনে । ঘটনার শুরুত্ব উপলক্ষ্য করে এক সৈনিক ও একজন ইয়াম আঝগ্লিক কমান্ডার সারওয়াগকে ব্যাপারটি সম্পর্কে অবহিত করতে দ্রুত আঝগ্লিক হেডকোয়ার্টার টিলায়গিয়ায় পৌছায় । টিলায়গিয়ায় ছিলো তখনকার আঝগ্লিক হেডকোয়ার্টার ও কমান্ডার সারওয়াগের অবস্থান । সারওয়াগ বিষয়টি জানার পর তিনি সাথে সাথেই সংবাদদাতাদের নিয়ে কালাঞ্জর রওনা হন ।

সেনাকমান্ডার সারওয়াগের সাথে তার কয়েকজন দেহরক্ষী ছিল । সেই সাথে তাদের আসবাবপত্র ও রসদ বহন করার জন্য কয়েকটি খচর ও উট কাফেলার সাথী ছিলো । তাদের কাফেলার আগে আগে দু'জন অশ্বারোহী পথিক যাচ্ছিল । তাদের বেশভূষা দেখে মনে হচ্ছিল, তারা সাধারণ কোন মুসাফির । অশ্বারোহী মুসাফির দু'জন সারওয়াগের কাফেলাকে দেখে আগে আগেই যাচ্ছিল ।

ইমাম ও সংবাদবাহী সৈনিক যখন কালাঞ্জর থেকে সংবাদ নিয়ে টিলাযুগীয়াতে আসছিলেন, তখন তাদের পক্ষে দেখার অবকাশ হয়নি, এই দুই অশ্বারোহী তাদেরকেই অনুসরণ করে পিছু পিছু আসছিল। ইমাম ও সংবাদবাহী সৈনিক যখন বালনাথে প্রবেশ করেছিল, তখন অশ্বারোহীরা কোথায় যেন চলে গিয়েছিলো। এখন সারওয়াগ সিপাহী এবং ইমামকে নিয়ে যখন কালাঞ্জরের দিকে রওনা হলেন, তখন এরা তাদের আগে আগে চলতে শুরু করল।

সারওয়াগের কোন গাইডের দরকার ছিল না। কারণ, ইমাম ও সংবাদবাহী সৈনিক রাঙ্গা সম্পর্কে অবহিত ছিল। কাফেলা সাধারণ গতিতে অগ্রসর হচ্ছিল। পাহাড়ী পাথুরে জমিন, ঘাসের বিছানা, উঁচু-নিচু টিলা তাদের পিছনে থেকে যাচ্ছিল। কাশ্মীরের বরফে ঢাকা পাহাড়ের ঢূঢ়া তারা দেখতে পাচ্ছিলেন। ইমাম সেনাপতি সারওয়াগকে বলছিলেন, ওই যে বরফ ঢাকা উঁচু পাহাড়টি দেখা যাচ্ছে, এটির পাদদেশে যে বসতি এলাকাটি রয়েছে, এটি এই অঞ্চলের মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর এবং সেখানকার অধিবাসীদের সৌন্দর্য সারা ভারতে প্রবাদতুল্য।

উঁচু-নিচু টিলাময় পাহাড়ী এলাকায় যখন এই কাফেলা পৌছলো, তখন রাত হয়ে গেছে। বিরতিহীনভাবে তারা রাতেও কিছু পথ এগিয়ে থাকার সিদ্ধান্ত নিল। কিছুপথ অগ্রসর হয়ে বিশ্রামের জন্য কাফেলা যাত্রা বিরতি করল। তখন ছিল হাঙ্কা ঠাণ্ডার সময়। পরদিন দিনের বেলা যখন কাফেলা রওনা হওয়ার প্রস্তুতি নিছিল, তখন হঠাতে একটি ঘোড়া খুব জোরে হেষারব করে লাগাম ছিড়ে পালিয়ে গেলো। এটি ছিল একজন নিরাপত্তারক্ষীর ঘোড়া। আরোহী তখনও ঘোড়ার পিঠে বসতে পারেনি, এর আগেই অজানা আতঙ্কে চম্পট দিল ঘোড়া।

সবাই দেখতে পেল তিন থেকে সাড়ে তিন ফুট লম্বা একটি সাপ ঘাসের উপর গড়াচ্ছে। জায়গাটি ছিল ঘন সবুজ ঘাসে আচ্ছাদিত। ছেট ছেট আগছা জাতীয় গাছে থোকা থোকা ফুল ফুটে রয়েছে। প্রকৃতি যেন পরিকল্পিতভাবে জায়গাটিকে রং-বেরঙের বৃক্ষাদি লাগিয়ে অপরাপ সাজে সাজিয়েছে। ছেট ছেট টিলা আর উঁচু-নিচু খানা-খন্দকের মাঝে মাঝে সমতল জমিন। এ যেন কোন দক্ষ ভাক্ষর্যের তৈরী মনোরম মনোসেন্ট।

সাপ দেখে সামান ও খাদ্যসামগ্রী বোঝাই উট ও ঘোড়া ছুটে পালাল। ঘোড়া ও খক্ষরগুলোকে পালাতে দেখে সবাই ওগুলোকে ধরতে পিছু পিছু

দৌড়াল, সাপ মারার অবকাশ কারো হলো না। জায়গাটি এমন যে, ঘোড়া আর খচর সামানপত্র নিয়ে কোথায় পালিয়েছে আন্দজ করাই কঠিন। সাপের ভয়ে পালানো কোন জন্মকে আয়ত্তে আনা কঠিন।

সবাই যখন ঘোড়ার খৌজে টিলার আড়ালে হারিয়ে গেল, ঠিক এই সময়ে টিলার আড়াল থেকে অকুক্ষলে দু'জন লোকের আগমন ঘটল। সাপটি তখনও ধীরে ধীরে ঘাসের উপর গড়াগড়ি করছে। এদের একজন এসে সাপটিকে একটু আড়ালে নিয়ে একটি থলের মধ্যে ভরে থলের মুখ বন্ধ করে ঘোড়ার জিনের সাথে থলেটি বেধে ফেলল। সেখানে আরো একটি ঘোড়া দাঁড়ানো ছিল।

সাপ পাকড়াওকারী লোকটি একটি ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে অপর গোড়াটির জীন ধরে বিপরীত দিকে চলে গেল। কিছুক্ষণ পর তার সাথীও এসে অপর ঘোড়াটিতে সওয়ার হল। ধীরে ধীরে উভয়েই দৃষ্টিসীমার বাইরে চলে গেল।

সেদিন সারওয়াগের কাফেলার পুরো সময় ঘোড়া ও রসদবাহী খচর ধরার পেছনেই কেটে গেল। হঠাৎ আগমনকারী দু'জনের একজন অপরনজনকে বলল—

“সামনে চল, এরা ফিরে যাবে না।”

“ফিরে যেতেও পারে। তবে এদের উপর নজর রাখতে হবে।” বলল অপরজন।

দিনের শেষ প্রহরে সারওয়াগের ছোট কাফেলার অর্ধেক সওয়ার ও অর্ধেক পায়ে হেঁটে সামনে অঞ্চসর হতে লাগল। বহু চেষ্টার পর তারা তিন চারটি ঘোড়া আর মালবাহী দু'টি খচর ও উটকে ধরতে পেরেছিল। সারওয়াগ দৃঢ়চেতা সেনাধ্যক্ষ। কোন বাধাই তাকে লক্ষ্যচ্যুত করতে পারে না। তিনি কাফেলার সাথীদের বললেন, পায়ে হেঁটে যারই ঝাঁকি লাগে সওয়ার হবে। আমি এখন থেকে হেঁটেই যাবো। হিন্দুস্তানের এসব নাগ আমাদের মিশন ভঙ্গুল করে দিতে পারবে না।

এ পর্যায়ে তারা পাহাড়ী এলাকায় এসে পৌছলো। একদিকে বিশাল পাহাড়, আর একদিকে বহু দূর পর্যন্ত বিস্তৃত পাহাড়ের ঢাল। একটু পরপরই তাদের পথ মোড় নিছিল। কখনও তাদেরকে দু'পাহাড়ের মাঝখান দিয়ে অতিক্রম করতে হচ্ছিল। তারা যতোই সামনে অঞ্চসর হচ্ছিল, শীতের প্রকোপ ততোই বৃদ্ধি পাচ্ছিল। কনকনে শীতের বাতাস। অবশ্য জায়গাটি এমন যে,

পানাহার সামঘী সাথে না থাকলেও তাদের ক্ষুধা-ত্বক্ষয় মরতে হতো না। জায়গায় জায়গায় পাহাড়ী বরনা বেয়ে স্পষ্টিকবৃচ্ছ পানি নিচে পড়ছে। নানা ধরনের ফলজ গাছে বাহারী ফল ঝুলছে। যে কয়টি জন্ম তাদের সাথে ছিল, এদের খাবারের অভাব ছিল না। এলাকাটি পশ্চর খাবার উপযোগী সবুজ ঘাসে ভরা।

এমন জায়গায় এসেই তাদের রাত হয়ে গেল। একটি পাহাড়ের ঢালে রাতের বিশ্বামীর জন্য তাঁবু ফেলল তারা। রাতের বেশীর ভাগ সময় কাটলো এলাকাটির প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের কথাবার্তায়। তাদের তাঁবুর পাশেই বাধা ছিল জন্ম কয়টি। সকাল বেলায় আবারো রওনা হওয়ার জন্য ঘোড়ায় জীন আটকানো হলো এবং কাফেলা এগোতে শুরু করল।

অন্যদেরকে সওয়ার করে কাফেলার সরদার সারওয়াগ হেঁটেই অগ্রসর হচ্ছিলেন। তিনি ইমাম সাহেবকে একটি ঘোড়ায় সওয়ার করালেন। দলনেতা পায়ে হেঁটে রওনা হওয়ায় সারওয়াগের নিরাপত্তা রক্ষীরাও পায়ে হেঁটেই যাচ্ছিল। হঠাৎ ইমাম সাহেবের ঘোড়া এদিক ওদিক লাফালাফি শুরু করল। যারা ঘোড়ায় চড়ে অভ্যন্ত, তারা ঘোড়ার এসব আচরণের অর্থ জানে। ঘোড়ার অবস্থা দেখে সারওয়াগ ইমামকে বললেন, জলদী ঘোড়ার পিঠ থেকে লাফিয়ে নিচে নেমে পড়ুন! ইমাম সাহেব ঘোড়ার পিঠ থেকে লাফিয়ে পড়ার সাথে সাথেই ঘোড়াটি তীব্র হেষারব করে ছুটে পালাল। সাথে সাথে অন্য ঘোড়াগুলোও নিয়ন্ত্রণহীন হয়ে হেষারব করতে লাগল।

হঠাৎ একজন বলে উঠল, সাপ! সাপ! এবার একই রং ও একই মাপের দু'টি সাপকে দেখা গেল। সবগুলো ঘোড়া নিয়ন্ত্রণহীন হয়ে লাগাম ছিড়ে যেদিকে পারল ছুটে পালাল। সবাই ঘোড়া ধরতে পিছু পিছু দৌড়াল। কারো আর সাপ মারার খেয়াল হলো না। দু'টি ঘোড়া পাহাড়ের ঢালু জায়গায় দৌড়াতে গিয়ে পা পিছলে নিচে প্রবাহ্মান ঝিলম নদীতে পড়ে গেছে আর স্নোতঙ্গীনী ঝিলমের তীব্র স্নোত তাদের ভাসিয়ে নিয়ে গেছে। নদী থেকে ঘোড়া দুটোর তীরে উঠে আসার কোন অবকাশই ছিল না।

পাহাড়ের ঢালে রাত্যাপনকারী সারওয়াগের কাফেলা সকালবেলায় রওনা হওয়ার সময় যখন অবশিষ্ট সওয়ারী ঘোড়া দুটোকেও হারিয়ে বিষণ্মনে সেখান

থেকে রওনা হয়ে গেল, কিছুক্ষণ পর ফেলে যাওয়া সেই জায়গাটিতে এলো সারওয়ারের কাফেলাকে আড়াল থেকে অনুসরণকারী দুই অশ্বারোহী। এরা এসে ঘাসের উপরে গড়াগড়িরত অবস্থায় সাপ দুটোকে ধরে থলের মধ্যে আটকিয়ে তাদের একটি ঘোড়ার জীনের সাথে সাপভর্তি থলেটি ঝুলিয়ে দিল।

কি সব অদ্ভুত ব্যাপার সম্মানিত সেনাপতি! এই এলাকা দিয়েই তো আমি দু'-তিন দিন আগে এই সৈনিককে নিয়ে আপনার কাছে পৌছেছি। তখন তো কোন সাপ আমার নজরে পড়েনি! এখন শীতের সময়। শীতের সময় সাধারণত সাপ গর্তে থাকে। সাপ শীত সহ্য করতে পারে না।

“ভেবে দেখুন ইমাম সাহেব! মনে হয় আমরা আসল গথ ভুলে অন্য পথে এসে পড়েছি। দেখুন না কোন জনবসতি কি চোখে পড়ছে? এমন জনমানবহীন এলাকায় রাস্তা ভুলে যাওয়াটাই স্বাভাবিক।” ইমাম সাহেবের উদ্দেশ্যে বললেন সেনাপতি সারওয়াগ।

সেনাপতি সারওয়াগের মনোবল এখনও চাঙ্গা। তিনি পায়ে হেঁটেই কাফেলাকে নিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। তিনি সবাইকে পায়ে হেঁটে লক্ষ্যস্থলে পৌছার জন্য উজ্জীবিত করছিলেন। সারওয়াগের প্রবল ধারণা জন্মালো, ইমাম সাহেব হয়তো আসল রাস্তা ভুলে অন্যপথে কাফেলাকে নিয়ে যাচ্ছেন। চলতে চলতে সন্ধ্যার আগে পথের একটি মোড়ে তারা দু'জন অশ্বারোহীকে দেখতে পেল। অশ্বারোহী দু'জন তাদের কাছাকাছি এসে ঘোড়া থেকে নেমে পড়ল এবং রাস্তার কিনারায় দু'হাত জোড় করে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল। সারওয়াগ তাদের কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন, উভয়েই মাথা নিচু করে সারওয়াগকে কুর্নিশ করল। সারওয়াগ ইমাম সাহেবের উদ্দেশ্যে বললেন, আপনি এদের ভাষা বোবেন, এদের তুলুন এবং এদের কাছ থেকে পথের কথা জিজ্ঞেস করে নিন।

ইমাম সাহেব লোক দু'টিকে উঠতে বললেন। ইমাম সাহেবের কথায় তারা উঠলো বটে; কিন্তু একজন হাত জোড় করে ভিখারীর মতো করে বললো-

“আমরা আপনাদের গোলাম। আপনারা মুসলমান। আমরা আপনাদের ধর্ম গ্রহণ করেছি।”

ইমাম সাহেব এদেরকে তাদের গন্তব্যের কথা জানিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, “আমরা ঠিক পথেই অগ্রসর হচ্ছি তো?”

“না, আপনারা পথ ভুল করেছেন। বললো একজন। আমরা বহুদ্র থেকে আপনাদের দেখে এসেছি। আমরা অবাক হচ্ছি, এ পথ দিয়ে আপনারা কী করে জীবন নিয়ে ফিরে এলেন! আমরা তো এই এলাকাটিকে মৃত্যুপুরী বলে থাকি। বাঘের মতো হিংস্র জন্ম ও এই অঞ্চলে আসে না। এই এলাকাটি সাপের এলাকা। আপনারা যে দিকে যাচ্ছেন, এ পথে প্রতিটি গাছের ডালে ডালে একেকটি সাপকে ঝুলে থাকতে দেখবেন। আপনারা এ পথ ছেড়ে অন্য পথে চলুন। বলেই সে রাস্তার কথা বলতে শুরু করল। কিন্তু এ পথটি খুবই জটিল। ঘন ঘন মোড় নিতে হবে। এ পথে গেলে বারবার আপনাদের পথ হারানোর আশঙ্কা আছে। এজন্য আমরা আপনাদের সাথেই যাচ্ছি।

“ইমাম সাহেব পথিকের বক্তব্য সারওয়াগকে জানালে সারওয়াগ ওদেরকে সাথে নিয়ে নেয়ার নির্দেশ দিলেন। আরো বললেন, এরা আমাদের পথ দেখিয়ে গন্তব্যে পৌছে দিলে এ কাজের জন্য আমরা তাদেরকে উপযুক্ত পারিশ্রমিক দেবো।”

“আগস্তক দুই অশ্বারোহী সারওয়াগের কাফেলার গাইডের দায়িত্ব পেল।

চলতে চলতে সারওয়াগ ইমাম সাহেবের মাধ্যমে গাইডদের কাছে জানতে চাইলেন, তোমরা কি এই এলাকার বিশ্বাসকর ঘটনাবলী সম্পর্কে কিছু জানঃ

জবাবে তারা বললো, “আম্রা তো সেই জায়গা থেকেই পালিয়ে এসেছি। আমরা ভয়ে স্বী-সন্তানসহ এলাকা ছেড়ে এদিকে এসে পড়েছি।” জবাব দিলো তাদের একজন।

“তোমরা কি কোন পাহাড় থেকে আগুন বেরোতে দেখেছো?”

“আমরা অনেক দূরে থাকি। আমরা সরাসরি আগুন দেখিনি। তবে অনেক দূর থেকে আগুনের শিখা দেখেছি। মনে হচ্ছিল যেন আসমান জুলছে। আমরা রাতের বেলায় আসমানে বিজলী চমকাতেও দেখেছি।... আমরা এমন আওয়াজও শুনেছি... কেউ নিজেদের বাপদাদার ধর্ম ত্যাগ করো না...। বললো সেই লোক।

“তোমরাও কি বাপদাদার ধর্ম ত্যাগ করে ইসলাম গ্রহণ করেছো?”

“জি হ্যাঁ। আমরা ইসলামকে সত্যধর্ম বলে বিশ্বাস করি। এজন্য আমরা ওখান থেকে চলে এসেছি। আমরা আপনাদের ধর্ম কিছুতেই ত্যাগ করবো না।”

“গাইড দুঁজনই একের পর এক সেইসব ঘটনা আরো ভয়াবহ রূপ দিয়ে সারওয়াগকে জানাল, যে ঘটনা সারওয়াগকে ইমাম ও সংবাদবাহী সিপাহী শুনিয়েছিল। এদের দুঁজনই তাদের কথাবার্তায় আতঙ্কিত ভাব ফুটিয়ে তুলেছিল। ইমাম সাহেব ও সারওয়াগ তাদের অভয় দিচ্ছিলেন, এতো আতঙ্কের কিছু নেই। তোমাদের কোনই ক্ষতি হবে না। গাইড দুজন অনুগত দাসের মতো কাফেলাকে পথ দেখিয়ে আগে আগে যাচ্ছিল।

দক্ষিণ কাশ্মীরে দেওকোট নামের একটি জনবসতি। দেবদারু আর চিলি কাঠের তৈরী বিশ-পঁচিশটি বাড়ি নিয়ে দেওকোট গ্রাম। গ্রামের সকল অধিবাসীই হিন্দু। এ গ্রামে দেবদারু কাঠের একটি ছেট মন্দিরও আছে। মন্দিরের অনতিদূরে গয়নী বাহিনীর একটি ছেট চৌকি। চৌকিতে প্রায় জনাতিশেক সৈনিকের অবস্থান। আজমীর নামের এক লোক এই ছেট সেনাচৌকির কমান্ডার। আজমীর মূলতানের অধিবাসী। এক সময় আজমীর ছিল কারামতী সম্প্রদায়ের লোক। মূলতান দখল করে সুলতান মাহমুদ যখন কারামতীদের ধর্মীয় শুণামীর মুখোশ উন্মোচন করে দেন, তখন বহু কারামতী ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে সুন্নী মুসলমানে দীক্ষা নেয়। আজমীর ছিল সেই কারামতীদেরই একজন।

কমান্ডার আজমীর একদিন নিয়মিত সেনাটহলের উদ্দেশ্যে সাথীদের নিয়ে গ্রামে টুহল দিচ্ছিল। সুলতান মাহমুদের নির্দেশে সেই গ্রামের মন্দিরটি অপসারণ করে মসজিদ তৈরী করা হয়েছিল। মসজিদে একজন ইমামও নিযুক্ত করা হয়েছিল। ইমাম সেখানকার অধিবাসীদের কুরআন-হাদীস শিক্ষা দিতেন এবং লোকজনকে ইসলামের ইবাদত-বন্দেগীর রীতি-পদ্ধতি শিক্ষা দিতেন। এ গ্রামের লোকজনও ছিল অস্তুত ঘটনায় আতঙ্কিত। কারণ, তারাও গ্রামের পার্শ্ববর্তী পাহাড়ে আগুন জুলতে দেখেছিল এবং রাতের বেলায় বিজলীর আলোয় আকাশ উত্তসিত হতে দেখেছিল।

এক রাতে এমনই বিজলী চমকানোর সময় ইমাম সাহেব ঘর থেকে বাইরে গেলে তিনজন বিবন্ধ নারীকে দেখতে পান। তখন ছিল তীব্র বাতাস। বাতাসে বিবন্ধ তরুণীদের চুলগুলো উড়ে তাদের চেহারা ঢেকে দিচ্ছিল। তরুণীরা সেই পাহাড়ের ঢালে দাঁড়ানো ছিল। রাত ছিল অন্ধকার। বিপরীত পাহাড় থেকে আলো দৃঢ়িত ছড়াচ্ছিল। সেই আলাতে আবছা আবছা দেখা

যাচ্ছিল পাহাড়ের ঢালে দাঁড়িয়ে থাকা তরুণীদের। ঘটনাক্রমে ইমাম সাহেব সেনিন ঠিক এ সময়ে ঘরের বাইরে এসেছিলেন। তিনি দেখলেন, কিছুক্ষণ জ্যোতি ছড়িয়ে পাহাড়ী আলো বন্ধ হয়ে গেছে। কিছুক্ষণ পর আবার একই জায়গা থেকে বিচ্ছুরিত হয়েছে আলোক রশ্মি। কিন্তু পরে আর তরুণীদের সেখানে দেখা যায়নি।

পরদিন ইমাম সাহেব টোকিতে গিয়ে কমান্ডারকে গতরাতে তার দেখা দৃশ্যের কথা জানালেন। ইমাম সাহেব আজমীরকে জানালেন, গ্রামের লোকজন বলাবলি করছে, ইসলাম যদি সত্য ধর্মই হয়ে থাকে, তাহলে ইমাম সাহেব তাদেরকে অবশ্যই এ ধরনের অলৌকিক কোন কিছু দেখাবে। গ্রামের লোকেরা আরো বলাবলি করছে, ধর্মচূতির কারণে তাদের উপর মুসিবত ধেয়ে আসছে। এজন্য তাদেরকে শান্তি পেতে হবে।

আজমীর ইমামের কথা শুনে গ্রামে গিয়ে অধিবাসীদের আতঙ্ক দূর করতে চেষ্টা করেছে। কিন্তু তাতে অধিবাসীদের ভয় দূর হয়নি; বরং সে নিজেই কিছুটা বিভ্রান্তির শিকার হয়ে পড়েছে। কারণ, সে আলৈম ছিল না। ইসলামের সহীহ আকীদা-বিশ্বাসের অকাট্য কোন দলীল-প্রমাণ সম্পর্কে তার কোন জ্ঞান ছিল না। সে শুধু জানতো “কেউ ইসলামের বিরুদ্ধে কিছু বললে তার গর্দান উড়িয়ে দেয়া হবে” এই নির্দেশের কথা।

গ্রাম প্রদক্ষিণ করে মসজিদে গিয়ে কমান্ডার আজমীর ইমাম সাহেবকে বললো, আমি একজন সৈনিক আর আপনি আলৈম। আপনার ইলম এসব ঘটনার কী ব্যাখ্যা দেয়ঃ আপনি এ সম্পর্কে লোকজনকে একটা বুঝ দিন। তা না হলে আমাদের সৈনিকরাও তো ইসলাম ছেড়ে দেবে।

আমি তরবারী দিয়ে লড়াই করতে পারি, মানুষ শাসন করতে পারি, যে কোন দুর্ভেদ্য দুর্গের প্রাচীর ডিঙাতে পারি, কিন্তু ধর্মের ব্যাপারে একেবারেই অজ্ঞ এবং নাদান একজন মানুষ। আপনার ও ইসলামের আকীদা-বিশ্বাসের পাহারাদারী করার জন্য আমাকে এখানে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। সুলতান নির্দেশ দিয়েছেন যেন মানুষের মন জয় করার ব্যবস্থা নেয়া হয়। কিন্তু এখানে এমন সব ঘটনা ঘটছে যে, তাতে মানুষের মনের মধ্যে ইসলাম সম্পর্কে নানা সংশয়-সন্দেহ দেখা দিয়েছে। সম্মানিত ইমাম, এ সম্পর্কে আপনি আমাকে কিছু বলুন, আল্লাহ না করুন শেষে আমি নিজেই পথভ্রষ্ট হয়ে না যাই।

বাস্তবে এসব অদ্ভুত ঘটনার বাস্তবসম্মত ব্যাখ্যা দেয়ার মতো প্রজ্ঞা ইসলামের আকীদা-বিশ্বাস ও হিন্দুদের কঠিন চক্রান্ত সম্পর্কে অনভিজ্ঞ ইমামের কাছে ছিল না।

ফলে যৌক্তিক কোন আশ্঵াস বাণী ছাড়াই কম্বারসুলভ ভঙ্গিতে গ্রামবাসীকে শাস্তির ভয় দেখিয়ে হমকি ধমকি দিয়ে চৌকির কম্বার আজমীর নিজের চৌকিতে ফিরে এলো। আজমীর নিজেও বিভ্রান্তির শিকার। গ্রামের লোকেরা রাতের অঙ্ককারে যে আওয়াজ শুনেছিল, নীরব ও একাকীভূতে আজমীর নিজেই সেই আওয়াজ শুনতে শুরু করল- “ইসলাম যদি সত্যই সৃষ্টিকর্তার ধর্ম হয়ে থাকে, তবে এসব ঘটনার বিপরীতে কোন অলৌকিক ঘটনা দেখা না!”

“আজমীরের সেনাচৌকির অবস্থানও ছিল একটি পাহাড়ের ঢালুতে। কাঠের তৈরী দু'তলা বিশিষ্ট একটি ঘরকে সেনাচৌকি বানানো হয়েছে। রাতের বেলায় উদিগ্ন মনে চৌকির দুতলার জানালা খুলে বাইরের দিকে তাকিয়ে ছিল কম্বার আজমীর। রাত যেমন তীব্র ঠাণ্ডা, তেমনই ঘন অঙ্ককার। দশ হাত দূরের কোন জিনিসও দেখা যাচ্ছিল না। কাশীরের প্রাকৃতিক গাছ গাছালীর নানা ফুলের সুবাসে মনোমুঝ্কর একটি মনমাতানো পরিবেশ। নাম না জানা অচেনা ফুলের গক্ষে মোহিত চারদিক।

আজমীর ছিল নিবেদিতপ্রাণ মুসলমান। কিন্তু এখানে এসে সে ইসলামকে নিয়ে কঠিন পরীক্ষার মুখোমুখী। আজমীর দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতো, হিন্দুদের ধর্মবিশ্বাস নিতান্তই একটি বাতিল ধর্মবিশ্বাস। মূর্তিপূজা সর্বেব একটি কুফরী কাজ। কিন্তু ইসলাম যে সত্য ধর্ম, এ বিষয়টি বাস্তবতার নিরীথে সংশয়ের শিকার নওয়সলিম আজমীরের কাছে প্রমাণ করার মতো কোন উপাদান ছিল না। সে জোর দিয়ে বলতে পারছিল না, ইসলমাই সত্য।

নিতকু রাতের এই একাকীভূতে চিত্ত-ভাবনায় হঠাত হেদ ঘটালো দূরের একটি পাহাড়ের ঢালের আলোকরশ্মি। ঘন অঙ্ককার রাতেও রশ্মির আলোর বলক ছিল বেশ তীব্র। আলোটি কয়েকবার চমকালো আবার বন্ধ হয়ে গেলো। এ দৃশ্য দেখে কম্বার আজমীরের গায়ের পশম খাড়া হয়ে গেলো। সে ভাবতে লাগল, সকাল হলেই গ্রামের মানুষের মুখে শোনা যাবে- রাতে গ্রামের পাহাড় তারা আগুন জ্বলতে দেখেছে। অথবা বলবে, রাতের বেলায় অমুক পাহাড় আগুন উদ্বীরণ করেছে।”

অবস্থাদ্বিতীয়ে কমান্ডার আজমীর এতোটাই পেরেশান হলো যে, সে সিজদায় পড়ে আল্লাহর দরবারে কান্নাজড়ানো কঠে নিবেদন করল, হে পরওয়ারদেগার! তুমি তোমার পবিত্র নামের মর্যাদা রক্ষা করো। তুমি তোমার প্রিয় ধর্ম ইসলামের পবিত্রতা ও মর্যাদা অঙ্গুণ রাখো। তুমি আমার ঈমানের দৃতি দেখাও, আমি যাতে এসব অঙ্গনের রহস্য উদ্ঘাটন করতে পারি এই ক্ষমতা দাও।”

রাত শেষে ভোরের আলো যখন দিনের বার্তা ঘোষণা করলো, তখনও সেই রাতের ঘটনা কমান্ডার আজমীরের মনে পাথরের বোৰা হয়ে বিরাজ করছিল। সে দায়িত্ব অনুভব করছিল, এসব অঙ্গাভাবিক ঘটনার রহস্য উদ্ঘাটন করে তার ধর্মের পবিত্রতা বজায় রাখতে হবে। কিন্তু এসব অলৌকিক ঘটনার রহস্য উদ্ঘাটনের মতো ইলম ও প্রজ্ঞা কিছুই তার ছিল না। সূর্য যখন অনেকটা উপরে উঠে গেল, তখন একটি ঘোড়ার পিঠে সওয়ার হয়ে সে একাকীই বেরিয়ে পড়ল। সে চুপি চুপি ধামের মানুষের ঘরের পেছনে দাঁড়িয়ে তাদের কথাবার্তা শোনার চেষ্টা করল।

সে সময় কাশীরের এই এলাকাটি ছিল ঘন গাছ গাছালীতে ভরা। ঘন বনজঙ্গলে প্রায়ই হিংস্র জীব-জন্মকে ঘুরে বেড়াতে দেখা যেতো। মাঝেমধ্যে হরিণও পাওয়া যেতো। তীর-ধনুক আজমীরের সাথেই ছিল। একটি বর্ণাও থাকতো তার সাথে সব সময়।

যেতে যেতে চৌকি থেকে অনেকটা দূরে একটি জঙ্গলের মধ্যে চলে গেল সে। জঙ্গলের পাশ দিয়েই প্রবাহিত হচ্ছিল পাহাড়ী নদী। হঠাৎ তার কানে ভেসে এলো নারী-কঠের হাসির আওয়াজ। অতি সন্তর্পণে গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে নদীর দিকে তাকালো আজমীর। তার নজরে পড়ল নদীতে তিনটি ঝরপসী তরুণী জলকেলী করছে আর হাসাহাসি করছে। একজন অপরজনের গায়ে পানি ছিটিয়ে দিচ্ছে। অঙ্গুত সুন্দর তরুণী তিনজন। কোমর থেকে তাদের উর্ধ্বাংশ সম্পূর্ণ বন্ধুহীন। নিম্নাঙ্গে যদিও একখণ্ড কাপড় আছে, কিন্তু তাও এতোটাই পাতলা যে, শরীরের পশমগুলো পর্যন্ত দিব্যি দূর থেকে বোৰা যাচ্ছে।

তরুণীদের অঙ্গাভাবিক ঝরপসৌন্দর্যে বিস্মিত হলো না আজমীর। কারণ, আল্লাহ তাআলা প্রকৃতিগতভাবেই এই এলাকাটিকে দুনিয়ার মধ্যে সবচেয়ে

সুন্দর করে বানিয়েছেন। এখানকার সব মানুষই সুন্দর। আজমীরকে যে বিষয়টি অবাক করলো, তা হলো, এখানকার ধারে কাছে কোন জনবসতি নেই। দূরের জনবসতি থেকে কেউ এখানে গোসল করতে আসে না। তাছাড়া তরুণীদের দেখে নিকটবর্তী গ্রামের অধিবাসী মনে করার কোনই যুক্তি নেই। এদের জুপ-সৌন্দর্যের সাথে আশপাশের গ্রামের তরুণীদের কোন তুলনাই হতে পারে না। এদেরকে গ্রাম্য তরুণী বলারও কোন অবকাশ নেই। আজমীরের মনে পড়ল, এই এলাকায় জনশ্রুতি আছে, অনেকেই নাকি গ্রাম থেকে দূরে পাহাড়ের ঢালে বা নির্জন স্থানে সুন্দরী নারীদের দেখতে পায়। লোকজনের ভাষায় এরা হয়তো প্রেতাঞ্চা, নয়তো স্বর্গের জিন-পরী।

কমান্ডার আজমীর মুঝ ও বিমোহিত হয়ে তরুণীদের দেখছিল। হঠাৎ এক তরুণী একদিকে তাকিয়ে আর্টিচিকার করে দৌড় দিল। দেখাদেখি আরেক তরুণীও দৌড়ে পালাল। তৃতীয় তরুণীটি নদীর পাড়ে বসা ছিল। সে উঠে দৌড় দিতে গিয়ে নদীতে পড়ে গেল। সেখানে পানি ছিল হাঁটু পরিমাণ। ঠিক এমন সময় একটি বিশালকায় বন্য শূকর গর্জন করতে করতে পানির দিকে অগ্রসর হলো। তরুণী পানি থেকে সোজা হয়ে উঠে যেই ভয়ঙ্কর দাঁতাল বন্য শূকর দেখতে পেল, অমনি আর্টিচিকার করে আবারো পানিতে গড়িয়ে পড়ল। বিশালদেহী বন্য শূকরটি এবার তরুণীকে ধরার জন্য পানিতে নেমে তরুণীর দিকে অগ্রসর হতে লাগল।

আজমীরের কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল এই তরুণী কোন প্রেতাঞ্চা কিংবা জীন পরী নয়- নিতান্তই মর্তের মানুষ। কমান্ডার ঘোড়ার লাগাম টেনে অশ্পৃষ্টে এড়ি দিল। তাড়া খেয়ে ঘোড়া দ্রুতগতিতে এগিয়ে গেল। কমান্ডার আজমীর বর্ণাটিকে ডান হাতে নিয়ে নিশানা নিল। লক্ষ্যভেদী আঘাত হানতে হবে। কারণ, বন্য শূকর লাফিয়ে লাফিয়ে নর্তন-কুর্দন করে তীব্র গর্জন করে তরুণীকে শিকার করার জন্য অগ্রসর হচ্ছে। তরুণীকে ধরে ফেলবে ফেলবে অবস্থায় কমান্ডার আজমীর প্রচণ্ড জোরে শূকরের দিকে বর্ণ নিষ্কেপ করলে বর্ণাটি তীরের মতো উড়ে গিয়ে শূকরের পাঁজরে আমূল বিন্দু হল। বিকট চিকার করে শূকরটি লাফিয়ে উঠে পানিতে উল্টে পড়ল। বন্য শূকরটি আবারো পানি থেকে উঠে ঠাঁয় কয়েকটি চক্র দিয়ে পানিতে চলে পড়ল।

আজমীর এক লাফে ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে দৌড়ে নদী থেকে তরুণীকে তুলে আনল। দাঁতাল বন্য শূকরটি তখনও পানিতে পড়ে ধীরে ধীরে গোঁড়াচ্ছে আর পা ছাড়িয়ে দাপাদাপি করছে।

তরুণী বেহঁশ। তার সাথী তরুণীরা কোথায় পালিয়েছে পাতা নেই। আজমীর সংজ্ঞাহীন তরুণীকে পাজাকোলা করে এনে ঘোড়ার পিঠে শুইয়ে দিল এবং নদীর তীরে পড়ে থাকা কাপড়গুলো এনে তরুণীর উলঙ্গ দেহটা ঢেকে দিয়ে চৌকির দিকে রওনা হলো। সে বেহঁশ তরুণীটিকে বাঁচানোর জন্য চেষ্টা করছিল আর মনে মনে ভাবছিল এই তরুণীদের পরিচয় উদ্ধার করতে পারলে হয়তো অনেক গোপন রহস্য উদ্বাটন করা সম্ভব হবে।

আজমীর ভেবে কুল পাছিল না, এতো সুন্দরী এই তিন তরুণী এখানে কোথেকে এসেছে! আর ওর সাথীরাই বা কোথায় হারিয়ে গেছে। এই নির্জন জঙ্গলের মধ্যে এসে এরা নদীতে বাপাবাপিই বা করছিল কোন উদ্দেশ্যে? এরা কি একবারও ভাবেনি, জঙ্গলের ভেতর থেকে যে কোন সময় কোন হিংস্র জন্ম এসে তাদের জন্য বিপদ হতে পারে? আকাশ-পাতাল ভাবনার কোন কিনার হওয়ার আগেই সংজ্ঞাহীন তরুণীকে নিয়ে চৌকিতে পৌছে গেল কমান্ডার আজমীর।

সেনাচৌকিতে পৌছানোর পর তরুণী ক্ষীণ কর্ষে আওয়াজ করল। তরুণী নিজে থেকেই শয়ন থেকে উঠতে চেষ্টা করছিল। কমান্ডার আজমীর তাকে ঘোড়ার পিঠ থেকে নামিয়ে দিল। তরুণীর জ্ঞান ফিরে এসেছে। কিন্তু নিজেকে এই অচেনা সেনাচৌকিতে দেখে শূকর দেখার চেয়ে আরো বেশী ঘাবড়ে যাওয়ার ভাব চোখে মুখে ফুটে উঠলো। অত্যধিক ভীত হওয়ার কারণে তার মাথা চক্র দিয়ে উঠলো। আজমীর স্থানীয় ভাষায় কথা বললে বুঝতে পারল তরুণী। আজমীর তাকে পরিধেয় কাপড়-চোপড় ঠিকঠাক করে নিতে বলল।

“আপনিই কি আমাকে জংলী দাঁতাল শূকরের কবল থেকে বাঁচিয়েছেন?”  
ধরা গলায় আজমীরের উদ্দেশে বলল তরুণী।

“আমি যদি সেখানে না থাকতাম এবং আমার হাতে যদি বর্ণ না থাকতো, তাহলে তোমার পক্ষে জীবন বাঁচানোই মুশকিল ছিল। এতোক্ষণে বন্য শূকরের আঘাতে তোমার ক্ষত-বিক্ষত দেহ নদীর স্রোতে ভেসে যেতো। আমিই সেই হিংস্র শূকরটিকে হত্যা করেছি। এখন আর তোমার কোন ভয়

নেই। তুমি নিরাপদ। তুমি যেখানে যেতে চাও তোমাকে নিরাপদে সেখানেই পৌছে দেয়া হবে। আতঙ্কিত তরুণীকে আশ্বস্ত করার উদ্দেশ্যে বলল ‘কমাড়ার আজমীর।

কাপড় পরার জন্য তরুণী অপর একটি খালি কক্ষে ঢেলে গেল। আজমীর এতোক্ষণ দেখছিল তরুণীকে। মানুষও এতো সুন্দর হতে পারে? এ যেনে কল্পনাকেও হার মানায়!

কাপড় পরে ফিরে এসে তরুণী আজমীরের কাছে জানতে চাইলো, “এখন আমার সাথে কী ধরনের আচরণ করা হবে?”

“যার আশঙ্কা তুমি করছো, এমনটি করতে চাইলে সেই নদীর তীরেই আমি করতে পারতাম।” বলল আজমীর।

আমি তোমার সম্পূর্ণ উলঙ্গ শরীর কাপড় দিয়ে ঢেকে দিয়েছি। এখানে কোন বদ মতলবে তোমাকে নিয়ে আসিনি। তোমার জীবন রক্ষার তাগিদেই তোমাকে এখানে নিয়ে আসতে বাধ্য হয়েছি। এখন বল, কোথায় যেতে চাও তুমি? যেখানে যেতে চাও, সেখানেই তোমাকে রেখে আসবো।”

“আমি বুঝতে পেরেছি, তুমি এই এলাকার কোন লোক নও। তোমার কথাবার্তা এই এলাকার মনে হয় না। তোমার চালচলনও এই অঞ্চলের মানুষের সাথে মিলে না। তাছাড়া তুমি কোন গরীব গ্রাম্য বাবার সন্তানও নও।”

“আমি যদি আপনাদের কোন প্রশ্নেরই জবাব না দিই, তাহলে আমার সাথে কী আচরণ করা হবে?”

“তোমাকে কিছু জিজ্ঞাসাবাদ ছাড়া ছেড়ে দেবো না।” তোমাকে পবিত্র আমানতের মতো স্বত্ত্বে এখানে রাখবো।” বললো আজমীর।

থিক থিক করে হেসে ফেলল তরুণী। হঠাতে সে আজমীরের সাথে এভাবে কথা বলতে শুরু করল, আজমীর তার কতো দিনের চেনা-জানা লোক। সে স্বেচ্ছায় আজমীরের কাছে নিজেকে সঁপে দিছিল।

তরুণীর এই বিগলিত ও স্বেচ্ছা সমর্পণের মনোভাব দেখে আজমীর বললো, “আমি একজন মুসলমান। আমি আমার সুলতান ও দায়িত্বের সাথে গান্দারী করতে পারি না। তুমি ভাবাবেগ সম্পর্কে আমাকে একটা পাথর মনে করতে পার।”

তরুণী আজমীরকে তার মায়াজালে আবদ্ধ করার জন্য আরো কিছু কৌশল প্রয়োগ করল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে বুঝতে পারল, প্রকৃতপক্ষেই আজমীর একটা পাথর।

অবশেষে তরুণী আজমীরের উদ্দেশ্যে বলল, আপনি আমার জীবন বাঁচিয়েছেন। আমি যেমনটি আপনাকে ভেবেছিলাম, আপনি মোটেও তেমন নন। এখন আমার কর্তব্য আমার সত্ত্বিকার অবস্থা আপনাকে জানানো। এরপর আপনার যা ইচ্ছা আপনি করতে পারেন।...

“আমি সেই প্রেতাঞ্চাদের একজন, যারা সাধারণ মানুষের দৃষ্টিতে সুন্দরী তরুণীর বেশে গোচরীভূত হয়। কিন্তু আমি প্রেতাঞ্চা নই মানুষ। আমার সাথে আরো যে দু'জন তরুণী ছিল, তারাও মানুষ। কালাঞ্জর দুর্ঘ আমাদের ঠিকানা। আমাদের অস্থায়ী ঠিকানা যেখান থেকে আপনি আমাকে উঠিয়ে এনেছেন, সেখান থেকে কিছুটা দূরের পাহাড়ের উপর। আজ রাত আমাদের উপর দায়িত্ব ছিল বিপরীত পাশে অবস্থিত পাহাড়ের উপর থেকে বিজলী চমকানো এবং আলোকরশ্মির বিচ্ছুরণ ঘটানো।

“বিজলী চমকানোর রহস্যটা আসলে কী?”

“আপনি ইচ্ছা করলে ওইসব লোকদের পাকড়াও করতে পারেন। অবশ্য সমস্যা হলো, ওরা এতোক্ষণে হয়তো আমাকে খুঁজতে বেরিয়ে পড়েছে। ওরা যদি আমাকে জীবিত বা মৃত উদ্ধার করতে না পারে, তাহলে তাদের গোপন রহস্য প্রকাশ হয়ে যাওয়ার আশঙ্কায় তারা এ জায়গা ছেড়ে চলে যেতে পারে। আপনি কি এদের পাকড়াও করার ব্যাপারে কিছু ভাবছেন?”

‘যেখান থেকে আমি তোমাকে তুলে এনেছি, আমি তোমাকে সেখানে ছেড়ে দিয়ে আড়ালে বসে থাকবো। ওরা হয়তো তোমাকে খুঁজতে আসবে, তখন ওদের আমি পাকড়াও করবো।’ বলল আজমীর।

তুমি যদি আমাকে ধোঁকা দিতে চেষ্টা করো, তাহলে মনে রাখবে তুমি সব সময় আমার তীরের নিশানার মধ্যেই থাকবে।”

“আমি আপনাকে ধোঁকা দেবো না। আপনি আমার জীবন বাঁচিয়েছেন। আমি আপনাকে এর প্রতিদান দেবো।”

কমান্ডার আজমীর তরঁণীকে যেখান থেকে তুলে এনেছিল, সেখানে পৌছে দিল। আজমীরের বর্ষার আঘাতে নিহত বন্য শূকরটি মরে সেখানেই পড়ে আছে। অল্প পানি থাকায় স্রোত সেটিকে ভাসিয়ে নিতে পারেনি।

তরঁণী ছাড়া পেয়ে নদীর তীর ধরে উজানের দিকে অগ্রসর হতে এবং এদিক-ওদিক তাকিয়ে তাদের লোকজনকে তালাশ করতে লাগল। কিছুক্ষণ পর নদীর অপর তীরে দু'জন পুরুষকে দেখতে পেল তরঁণী। তারা তরঁণীকে ডাকল। তরঁণী তাদেরকে হাতের ইশারায় এ পাড়ে আসার জন্য ডাকল। উভয়ে পাহাড়ী নদীর হাঁটুসমান পানি ভেঙে এ পাড়ে এসে তরঁণীকে জিজ্ঞেস করল, “তুমি কোথেকে এসেছো, এতোক্ষণ কোথায় ছিলে?”

এরা যখন দাঁড়িয়ে পরস্পর কথা বলছিল, তখন নদীর তীরের ঘন ঝঁপের আড়াল থেকে চারসঙ্গী সিপাহীসহ আজমীর যয়দানে বেরিয়ে এলো। তরঁণীর পরিচিত পুরুষ দু'জন আজমীরকে দেখে ঘাবড়ে গেল। আজমীরের হাতে তাক করা তীর-ধনুক। সে হৃষ্কির স্বরে ওদের বলল, “পালাতে চেষ্টা করো না, যেখানে আছো, সেখানেই দাঁড়িয়ে থাক।”

আজমীরের হৃষ্কি ও তার সাথে সশন্ত সঙ্গীদের দেখে তরঁণীর দলের লোকজন ঘাবড়ে গিয়ে এদিক-ওদিক তাকাতে লাগল। ইতোমধ্যে আজমীরের সাথীরা তাদের ঘিরে ফেলল।

“আমাদেরকে তোমাদের আস্তানায় নিয়ে চল।” তরঁণীর দলের লোক দুজনকে নির্দেশের স্বরে বলল আজমীর।

তারা আজমীরের কথার কিছুই বুঝতে পারেনি এমন হাবভাব দেখিয়ে কৌশলে নির্দেশটি এড়িয়ে যাওয়ার ফন্দী করল। কিন্তু আজমীর তাদের বলল, কোন ছল-চতুরীর আশ্রয় নিলে তোমাদের হত্যা করা হবে। যদি তালো চাও, তবে আমার নির্দেশ মতো তোমাদের আস্তানায় নিয়ে যাও।

আজমীরের কাছে তাদের সব চক্রান্তের জাল ফাঁস হয়ে যাওয়ায় তরঁণীকে তাদের আঞ্চলিক ভাষায় গালমন্দ ও তিরক্ষার করতে লাগল দুই পুরুষ। “হারামজাদী, তুই আমাদের সবকিছু প্রকাশ করে দিয়েছিস!”

ওদের কথাবার্তায় পাতা না দিয়ে আজমীর তরবারী কোষমুক্ত করে তাড়া দিয়ে বলল, বাঁচতে চাও তো আগে আগে আমাদের নিয়ে চলো।

আজমীরের নির্দেশে আগে আগে পথ দেখিয়ে ঘন জঙ্গলের মধ্য দিয়ে  
আরো গহীন জঙ্গলের দিকে যেতে লাগল লোক দুজন। কিছুক্ষণ পর লোক  
দু'জন একটি টিলার উপরের দিকে চড়তে লাগল। ঘন গাছ গাছালী ও  
লতাগুল্যে আকীর্ণ জায়গাটিতে কোন জনমানুষের পা পড়েনি। অনেকক্ষণ  
পাহাড়ের ঢাল বেয়ে উপরে উঠার পরও পাহাড়ের ঢূঢ়ায় পৌছানো গেল না।  
অনেকটা উপরে এসে দেখা গেল এ জায়গাটায় পাহাড় দেয়ালের মতো খাড়া।  
এ জায়গায় পাহাড়ের উপর শুকনো কাঠ দিয়ে তৈরী করা হয়েছে একটি  
বুপড়ী। বুপড়ীর কাছে বিশাল একটি শুকনো কাঠের স্তুপ। বুপড়ীর বাইরে  
লোকজনের কথাবার্তা শনে বুপড়ী থেকে দুই তরুণী বেরিয়ে এলো। আজমীর  
উভয় তরুণীকে নদীতে জলকেলী করতে দেখেছিল। এরা বাইরে বেরিয়ে  
তাদের লোকজনকে ঘিরে রাখা সৈনিকদের দেখে ঘাবড়ে গেল।

কমান্ডার আজমীর বুপড়ীতে উঁকি দিয়ে দেখলো, বুপড়ীর ভেতরে একটি  
বিশালকায় কাঠের ফ্রেমে স্বচ্ছ আয়না। আরো আছে আয়নার চেয়েও আরো  
বেশী স্বচ্ছ বিশালাকার গ্লাস।

“এগুলো কী?” পুরুষ দু’জনকে জিজ্ঞেস করল আজমীর।

“এগুলো কিছু না। আমরা এমনিতেই এদিকে এসেছি।”

পুরুষ দুজনকে টালবাহানা করতে দেখে বন্য শূকরের আক্রমণ থেকে প্রাণে  
বাঁচানো তরুণীর দিকে তাকাল আজমীর। এই তরুণী এর আগেই জীবন  
বাঁচানোর জন্য আজমীরের প্রতি কৃতজ্ঞ। সেই সাথে একান্তে পেয়েও তার  
সাথে কোন পাশবিক আচরণ না করে তাকে আমানতের মতো পবিত্র জ্ঞানে  
নিরাপত্তা দেয়ায় সে আজমীরের কাছে ওয়াদা করেছিল, তার কাছে তাদের সব  
রহস্যই প্রকাশ করে দেবে। প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি অনেকটাই ইতোমধ্যে পূরণ করেছে  
সে। বাকীটুকু পূরণ করতে সঙ্গী পুরুষদের উদ্দেশ্যে তরুণী বলল, এখন আর  
টালবাহানা করা নিষ্কল। কারণ, আমাদের অনেক কিছুই জেনে গেছে এরা।

তারা কমান্ডার আজমীরকে উপরে পাহাড়ের ঢূঢ়ায় নিয়ে গেল। পাহাড়ের  
ঢূঢ়ায় গিয়ে চতুর্দিকে তাকিয়ে আজমীর দেখতে পেল, গাছগাছালীর উপর দিয়ে  
তার চোকি দেখা যাচ্ছে। গাছের ফাঁক দিয়ে আজমীর নদীর তীরের যে  
জায়গাটায় গিয়েছিল, সেই জায়গাটাও আবছা মতো দেখতে পেল।

আজমীরকে জানানো হলো, ওই যে শুকনো কাঠের স্তুপ দেখা যাচ্ছে, খাড়া পাহাড়ের এই জায়গায় রাতের বেলায় এই শুকনো কাঠের স্তুপে আগুন জ্বালানো হবে। এই আগুন পাহাড়ের নিচের গ্রামবাসীর দৃষ্টির আড়ালে থাকবে। এরপর বিশাল এই আয়নাটি সমতল পাহাড়ের যে জায়গাটায় তারা দাঁড়িয়ে ছিল সেখানে রাখা হবে। জ্বলন্ত আগুনে ঢেলে দেয়া হবে তেল। তাতে আগুনের শিখা বহু উঁচুতে উঠে যাবে। জ্বলন্ত আগুনের ঝলক পড়বে আয়নার উপর। তখন আয়নাটিকে দু'-তিনবার বিরতি দিয়ে সেনাচৌকি ও গ্রামের দিকে ঘূরানো হবে। জ্বলন্ত আগুনের ঝলক আয়নায় প্রতিবিহিত হয়ে সেনাচৌকি ও গ্রামে প্রতিফলিত হবে। খুব অল্প সময়ে আয়নাটি ঘূরানোর কারণে আয়নায় প্রতিবিহিত আলোর ঝলকানীকে অজ্ঞাত লোকের কাছে বিজলীর ঝলক মনে হবে।

এদের কথার মর্ম উপলক্ষ্মি করা আজমীরের পক্ষে মোটেও কঠিন ছিল না। কারণ, তরুণী তাকে আগেই জানিয়েছিল, আজ রাত তাদের পরিকল্পনা ছিল গ্রামের উপর বিজলী চমকানো এবং পাহাড়ে আগুন জ্বালানো। কয়েক দিন আগে অন্য পাহাড় থেকে গ্রামের উপর বিজলী চমকানোর বিষয়টিও এখন আজমীরের কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল।

“এটা বৃন্দির খেলা” বলল দু’ পুরুষের একজন।

রাতের অঙ্ককারে আগুনের আলো এই আয়নায় প্রতিবিহিত হলে আলোর ঝলক সৃষ্টি করে। আর প্রতিবিহিত আলোকে পাহাড়ের নিচে বসবাসকারী গ্রামের লোকজন দেখে মনে করে আসমানের বিজলী। পাহাড়ের উচ্চতা সম্পর্কে জ্ঞাত লোকেরাও এটা ভাবতে পারে না, এই আলোর ঝলকানী পাহাড়ের চূড়া থেকে এসেছে। রাতের অঙ্ককারে আলোর ঝলক দেখিয়ে দিনের বেলায় আমাদের প্রশিক্ষিত লোকজন গ্রামের মানুষের মধ্যে এই আলোকে কেন্দ্র করে নানা ধরনের অলৌকিক কাহিনী প্রচার করে। আর লোকদের মধ্যে এসব কাহিনী বাতাসের মতো ছড়িয়ে পড়ে, জন্ম নেয় কল্পনা আর অবাস্তবতা মিলিয়ে ভৌতিক সব কল্পকাহিনীর গুরু।

আমাদের লোকেরা সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রচলিত বিভিন্ন কুসংস্কার ও অলৌকিক বিশ্বাসকে কেন্দ্র করে প্রচারণা চালায়, দেবদেবীদের ধর্ম ত্যাগ করার কারণে দেবতাগণ তোমাদের উপর ঝুঁষ্ট হয়েছেন। তোমরা আবার স্বধর্মে ফিরে

না এলে গ্যব নেমে আসবে। বিভিন্ন রকম বিপদাপদে পতিত হবে তোমরা। এসব থেকে বাঁচার একটাই উপায়, তওবা করে আবার স্বর্ধর্মে ফিরে এসো এবং দেবদেবীদের সন্তুষ্ট করার জন্য বেশী করে পূজা-অর্চনা করা।

লোকজন নির্জন স্থানে সুন্দরী উলঙ্গ পরীর বেশে যাদের দেখে প্রেতাভা কিংবা পরী মনে করেছে, এ তিন তরুণীই ছিল কথিত পরী বা প্রেতাভা। এরা এই এলাকার অধিবাসী নয়। লাহোর ও বাটাড়ার রাজমহলের প্রশিক্ষণপ্রাণ বিশিষ্ট তরুণী এরা।

আগ্নাহ তাআলা কমান্ডার আজমীরের বিগলিত মোনাজাত করুল করেছেন। সে তার ঈমানের দৃতি এখন নিজ চোখেই দেখতে পাচ্ছে। তার কাছে সব অভ্যন্তর ও আসমানী গজবের কাঞ্চকাহিনীর অন্তরালে এসব যোগীদের ভগুমীর ব্যাপারটি পরিষ্কার হয়ে গেছে। এখন বিভ্রান্ত নওমুসলিম গ্রামবাসীকে এ ব্যাপারে অবহিত করার প্রয়োজন বোধ করল কমান্ডার আজমীর। দুই যোগী পুরুষ ও তিন তরুণীকে পাকড়াও করে সেনাচৌকিতে এনে কঠোর প্রহরায় রাখল আজমীর। সেই সাথে তাদের জিজেস করল, আর কোন কোন জায়গায় তাদের লোকজন এমন কাঞ্চকারখানা ঘটাচ্ছে?

\* \* \*

এদিকে সেনাপতি সরওয়াগের কাফেলা পথে পাওয়া দুই গাইডের দেখানো পথে অগ্রসর হচ্ছিল। ইমাম সাহেব কয়েকবার দুই গাইডকে উদ্বিগ্নিকষ্টে বললেন, কী ব্যাপার! এতো সময় লাগছে কেন? এতো দিনে তো আমাদের গন্তব্যে পৌছে যাওয়ার কথা!

জবাবে দুই গাইড ইমামকে বোঝালো, অত্যধিক নিরাপত্তার কারণে তারা দীর্ঘপথে অগ্রসর হচ্ছে। কারণ, এ পথটি সবচেয়ে নিরাপদ ও সহজ।

আসলে গাইডদের নিয়ে যাওয়া পথ মোটেও সহজ ছিল না। গাইডদ্বয় কাফেলাকে বিভ্রান্ত করে অচেনা দুর্গম দীর্ঘ পথে নিয়ে যাচ্ছিল।

একদিন রাতের বেলা এক জায়গায় বিশ্রাম করার জন্য যাত্রাবিরতি করল কাফেলা। তখন গাইড দু'জন কাফেলার প্রধান সরওয়াগকে জানাল, “আগামীকাল দ্বিপ্রহরের আগেই তারা গন্তব্যে পৌছে যাবে। বিরতিইনভাবে

দুর্গম পথ পায়ে হেঁটে অতিক্রম করার ফলে কাফেলার সবাই ছিল খুবই ঝন্ট। যাত্রাবিরতি দিয়ে হাকা কিছু খাওয়া-দাওয়ার পর গা এলিয়ে দিতেই সবাই ঘুমের ঘোরে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ল।

সকালে যখন তাদের ঘূম ভাঙল, তখন উভয় গাইড উধাও। খোঁজাখুঁজি করে তাদের কোথাও পাওয়া গেল না। খোঁজাখুঁজি করাও সহজ ছিল না। চতুর্দিকে উঁচু পাহাড়। ঘন ঝোপ-ঝাড়ে ঢাকা পাহাড়। গাছ গাছালী ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়ে না। তারা কোথায় এসেছে, কোন দিকে যেতে হবে কিছুই জানে না তারা। যে পথে এসেছে এই পথে ফিরে যওয়া ছাড়া আর কোন পথ তাদের জানা নেই।

আফসোস! হিন্দুদের চক্রান্তের শিকার হয়েছি আমরা। এরা দু'জন জানতো, আপনি আমাদের এই এলাকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের নানা গন্ধ বলছিলেন, এরা এই সুযোগটাকেই কাজে লাগিয়েছে। ইমামের উদ্দেশ্যে বললেন সেনাপতি সরওয়াগ।

“আমরা যখন বালনাথ দুর্গের পাশ দিয়ে আসছিলাম, তখন আমি দু'জন অশ্঵ারোহীকে দূরে দেখতে পেয়েছিলাম। আমি মনে করেছিলাম, ওরা হয়তো কোন পথিক। কে জানে ওরাই কি সেই পথিক কি-না!” বললো এক সিপাহী।

“প্রথম যখন আমরা সাপ দেখি, তখন আমি ওদের দেখেছিলাম, কিন্তু তাদের চেহারা দেখা যাচ্ছিল না।” বললো অপর এক সিপাহী।

“তোমাদের দেখা লোকেরা এরাই হোক বা অন্য কেউ হোক, তাতে কী আসে যায়?” বললেন সারওয়াগ। আসল কথা হলো, আমরা এক ভয়ানক প্রতারণার শিকার হয়েছি। এখন এখান থেকে কিভাবে বের হওয়া যায় চিন্তা কর। আর একটা কাজ কর, আমাদের পুটলীতে খাওয়ার মতো যা কিছু আছে সব ফেলে দাও। এতে ওরা বিষ মিশিয়ে রেখে যেতে পারে। সেনাপতির নির্দেশে খাবার যা কিছু ছিল বিষ সব ফেলে দেয়া হলো।

এবার শুরু হলো অজানা-অচেনা পথে কঠিন এক সফর। এদিক ওদিক ঘূরে ঘূরে সারা দিন কেটে গেল। রাতটা কোনমতে কেটে গেল বটে; কিন্তু অত্যধিক ঠাণ্ডায় কেউই স্বস্তি পেল না। পরদিনও এভাবেই অজানা অচেনা পথে ঘূরে ঘূরে কেটে গেল। পরদিন রাতে যে সময় সারওয়াগের কাফেলা ঠাণ্ডা থেকে বাঁচার জন্য একটু উষ্ণ জায়গা খুঁজছিল, ঠিক সেই সময় প্রতারক দুই

হিন্দু গাইড লোহাকোট দুর্গে বসে দুর্গপতির কাছে তাদের কাজের বর্ণনা দিচ্ছিল, কিভাবে তারা সারওয়াগের কাফেলাকে অচেনা পাহাড়ী জায়গায় ফেলে এসেছে। সেখান থেকে ওদের বেরিয়ে যাওয়া মোটেও সহজ ব্যাপার নয়।

“তোমরা ওদের হত্যা করে এলে না কেন?” দুর্গপতি আফসোস করে বলল। সুলতান মাহমুদ কোন সাধারণ লোককে আঞ্চলিক কমান্ডারের দায়িত্ব দেয়নি। তোমরা খুবই মূল্যবান শিকার হাতে পেয়েছিলে। তোমাদের কাজে আমি খুবই খুশী। কিন্তু ওদের ইহলীলা সাঙ্গ করে আসতে পারলে বেশী খুশী হতাম।”

“কালাঞ্জর থেকে আমাদের নির্দেশ দেয়া হয়েছে, কোন মুসলমান সেনাকে যেন কেউ হত্যা না করে। আমরা জানি না এ নির্দেশ কেন দেয়া হয়েছে। নয়তো খুব সহজেই আমরা ওদের খাবারে বিষ মিশিয়ে দিতে পারতাম।

“কালাঞ্জরের মহারাজা ভেবেচিন্তেই বলেছেন, তিনি হয়তো সুলতান মাহমুদকে এই বার্তাই দিতে চান, চুক্তি অনুযায়ী এখানে তার সৈন্যরা নিরাপদেই আছে। তবে তারা নিজেরাই যদি অচেনা জায়গায় গিয়ে ঘুরে ঘুরে মারা যায়, তাতে আমাদের কি করার আছে?”

আসলেও তাই হলো। সারওয়াগকে তার কাফেলাসহ অচেনা পথে ঘুরে ঘুরে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাওয়া থেকে কে রক্ষা করবে? তারা নিজেরাই তো এখানে গিয়েছে। দুদিন একটানা ঘুরেও তারা না পেল কোন পথের সন্ধান, না পেল কোন জনবসতির চিহ্ন। দূরে কাছে কোথাও কোন জনমানবের চিহ্ন তাদের চোখে পড়ল না। পানাহারবিহীন এই নির্জন জঙ্গলে প্রায়ই তাদের চোখে পড়ে জোড়ায় জোড়ায় পাহাড়ী বাঘ। সিংহের গর্জনও কানে আসে। পৃথিবীর এতো সৌন্দর্যমণ্ডিত মায়াবী এই জমিন তাদের কাছে এখন মৃত্যুপূরীতে পরিণত হলো।

খুবই কার্যকর একটা চাল দিয়েছে হিন্দু চক্রান্তকারীরা। সারওয়াগ ছিলেন এই এলাকার আঞ্চলিক সেনাপ্রধান। প্রধান সেনাধ্যক্ষের অনুপস্থিতিতে নওমুসলিমদেরকে পুনরায় হিন্দু ধর্মে ফিরিয়ে আনার জন্য তারা যে চক্রান্তের আয়োজন করেছিল, সারওয়াগের অনুপস্থিতিতে সেই কর্মকাণ্ড চালানোর প্রধান প্রতিবন্ধকতা দূর হয়ে গেল। হিন্দু যোগী-সন্ন্যাসী ও পুরোহিতরা চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্রের ব্যাপারে খুবই দক্ষ ও নিপুণ। মন্দিরগুলোতে পুরোহিতরা পূজারীদের

বলতে লাগল, গোমা-তা যেমন পবিত্র, মুসলমানরা তেমনই অপবিত্র। মুসলমানদের হত্যা করে ইসলামকে নিশ্চহ করা ধর্মের প্রধান কাজ। মন্দিরের পুরোহিতরা মুসলমান হত্যাকে ধর্মের সবচেয়ে বড় পুণ্যের কাজ বলে ঘোষণা করে। সেই দিনের পুরোহিত আর নব্য ভারতের হিন্দু নেতাদের নীতির আদর্শের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। আজো ভারতকে মুসলমানশূন্য করার ব্যাপারে সকল হিন্দুই এক ও অভিন্ন মত পোষণ করে।

১০১৪ খ্রিস্টাব্দের একদিন। রাজা নন্দরায় কালাঞ্জর দুর্গে বসে দৃষ্টতকারী দলপতির কাছ থেকে তাদের কর্মকাণ্ডের রিপোর্ট শুনছিলেন। রাজা নন্দরায় দৃষ্টতকারীদের দ্বারা বিজিত এলাকাসমূহের নওমুসলিমদের বিভাস করে পুনরায় হিন্দুধর্মে ফিরিয়ে আনা এবং মুসলিম শাসকদের উৎখাত করার চক্রান্তের জাল বুনেছিলেন, তা মুসলিম সৈন্য ও শাসকদের কাছে ধরা পড়ে যায়। তারা যাদুটোনা এবং সুন্দরী নারীদেরকে প্রেতাভ্যাসুপে থামের অশিক্ষিত মানুষের কাছে হিন্দু দেবদেবীদের গঘবের আলামত হিসেবে উপস্থাপন করতে পাহাড়ের উপর থেকে কৃত্রিম আলো ফেলে বিজলী তৈরী করে। দৃষ্টতকারী দলের নেতা বলছিলো, আমাদের প্রশিক্ষিত দলের দুই পুরুষ সদস্য ও তিনি কিশোরীকে মুসলিম সৈন্যরা আসবাবপত্রসহ পাকড়াও করেছে এবং তাদেরকে গ্রামে গ্রামে নিয়ে গিয়ে মানুষকে সবকিছু দেখিয়ে বলেছে, এরাই হলো তোমাদের দেখা আসমানী গঘবের প্রতীকী প্রেতাভ্যা আর এইসব আসবাব হলো আসমানী বিজলীর রসদ।

কমান্ডার আজমীর যে কয়জনকে প্রেফতার করেছিল, তাদের জীবন ভিক্ষা এবং বিনা শাস্তিতে যুক্তি দেয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে কুচক্ষী দলের অন্য সদস্যদেরও ঠিকানা-পরিচয় জেনে নিয়েছিল।

তরুণীকে ব্যবহার করে আজমীর তার পুরুষ ও অন্য সাথীদের যেভাবে পাকড়াও করে, ঠিক একই কৌশলে অন্যান্য কুচক্ষীদেরও সে পাকড়াও করতে সমর্থ হয়।

একদিন আজমীর কয়েক গ্রামের লোকজনকে একত্রিত করে কুচক্ষী দলকে তাদের সামনে দাঁড় করিয়ে বলতে বাধ্য করল, এ পর্যন্ত দেবদেবীদের নামে তাদের কাছে যা প্রচার করা হয়েছে, তার সবই ছিলো শুধুই গুজব, ভিত্তিহীন ও মিথ্যা। গ্রামের অনেকেই অপকর্মকারীদের চিনে ফেলল। চক্রান্তকারীরা গ্রামের

লোকদের কাছে তাদের আসল পরিচয় প্রকাশ করে দেয়। সন্ধ্যার পর আজমীর কুচকুচনীদেরকে রাতের বিজলী চমকানোর মহড়া দিতে এবং তরুণীদেরকে প্রেতাঞ্চালুপে অবির্ভূত হয়ে দেখাতে বাধ্য করে।

মহারাজা নন্দরায় যখন দেখতে পেলেন, তার চক্রান্ত ভঙ্গল হয়ে গেছে, তখন তিনি যেসব ইয়াম ও প্রশিক্ষক নওমুসলিমদেরকে ইসলাম শিক্ষা দিচ্ছে এবং ইবাদত-বন্দেগীর তালিম দিচ্ছে, তাদের হত্যা করে লাশগুলো এমনভাবে শুম করার নির্দেশ দেন, যাতে এর কোন আলামত কেউ খুঁজে না পায়। যেসব ক্যাম্পে গয়নী বাহিনীর সৈন্যরা অবস্থান করছে, তাদেরকে ক্যাম্প থেকে একজন দু'জন করে বিচ্ছিন্ন করে হত্যা করে লাশ শুম করে ফেলার নির্দেশ দেন রাজা নন্দরায়।

এক রাতে আজমীর তার ক্যাম্পের একটি কক্ষে একাকী বসে ছিল। তার পাশেই একটি কক্ষে চক্রান্তকারী পুরুষ ও তরুণীদের আটকে রাখা হয়েছিল। ওদের কক্ষের সামনে কমান্ডার আজমীর প্রহরার ব্যবস্থাও করে দিয়েছিল। বন্দীদের একথাও বলে দিয়েছিল সে আগামীকালই তোমাদের দলের পুরুষদের বালনাথ পাঠিয়ে দেয়া হবে। আঞ্চলিক কমান্ডার সেনাপতি সারওয়াগের হাতে তোদের ভাগ্য নির্ধারিত হবে। আর তরুণীদেরকে সেনাপ্রহরায় কালাঞ্জর পাঠিয়ে দেয়া হবে।

রাতের মধ্যভাগে এক সিপাহী কমান্ডার আজমীরকে এসে জানালো, এক বন্দী তরুণী আপনার সাথে কথা বলতে চায়।

কমান্ডার আজমীর তরুণীকে ডেকে পাঠাল। সে যে তরুণীকে নদী থেকে তুলে এনেছিল, সে-ই ছিল সাক্ষাত প্রত্যাশী।

“সম্মানিত কমান্ডার, আজ রাতেও কি আপনি আমাকে কাছে ডাকবেন না? অস্তত আজ রাতটি আপনার কাছে কাটাতে ইচ্ছে করছে আমার।”

তরুণীর কথায় হাসি পেল আজমীরের। সে বলল, আমি অনুভব করি, তুমি অস্বাভাবিক সুন্দরী। আল্লাহর কসম, তোমার মতো রূপসী নারী আমি জীবনে দ্বিতীয়টি দেখিনি। তোমার বিশ্বিত হওয়ার বিষয়টিকে আমি বুঝি না এমন নয়। আমার মতো একজন যুবকের পক্ষে দীর্ঘদিন স্তুসঙ্গবিহীন জীবন কাটানোর পর তোমার মতো রূপসীকে হাতের নাগালে পেয়ে একটুও আকৃষ্ণ না হওয়ার ব্যাপারটি তোমাকে অবাক করেছে। অথচ তোমরা প্রত্যাশা কর, আমি

তোমাদের রূপের প্রতি আকৃষ্ট হই। কিন্তু তুমি যদি আমার মতো মুসলমান হতে, তোমার উপরে যদি আমার মতো এমন কঠিন দায়িত্ব ন্যস্ত থাকতো, তুমি যদি ঈমানের তাৎপর্য উপলক্ষ্য করতে সক্ষম হতে, তাহলে আর তোমার কাছে ব্যাপারটি অঙ্গভাবিক মনে হতো না। তোমাদের দৃষ্টি মানুষের দেহের প্রতি, এটা তোমাদের ধর্মের শিক্ষা আর আমাদের দৃষ্টি থাকে আঘাতের প্রতি। আঘাতে কেন্দ্র করেই আমাদের ধর্মবিশ্বাস আবর্তিত। এটাই আমাদের ধর্মের শিক্ষা।”

“তোমার ভালোবাসা পেতে আমি যদি মুসলমান হয়ে যাই?”

“কালনাগিনীর বিষ খুলে নিলেও সে কালনাগিনীই থাকে। তাকে যদি মধুও পান করাও, তবুও তার দেহে বিষই উৎপাদিত হবে এবং এক সময় ঠিক নাগিনীর মতোই ছোবল মারবে। কারণ, এটাই তার ধর্ম।...”

আমি এখানে প্রেমগ্রন্থীর খেলা আর বিয়ে-শাদী করে সুন্দরী নারী নিয়ে ফুর্তি করতে আসিনি। তোমার এই অপরূপ সৌন্দর্য ও আকর্ষণীয় দেহবলুরীর প্রতি আমার বিন্দুমাত্র আকর্ষণ নেই। এটা আমার ঈমানের শক্তি। এ কারণে আমার দৃষ্টি নিজের যৌবনের প্রতি যেমন পড়ে না, তদ্রূপ তোমার মতো ঝুপসীর দেহবলুরীর প্রতিও আমি আকর্ষণ বোধ করি না। শোন সুন্দরী ! আমার ধর্ম আমাকে শিক্ষা দিয়েছে, শক্রপক্ষের কোন অবলা নারী যদি তোমাদের হাতে বন্দী হয়, তখন তাদের অসহায়ত্বের সুযোগে তাদের ঝুপরসের স্বাদ নেয়া মহা অপরাধ। নারী বন্দীদেরকে তোমাদের দৃষ্টিসীমার বাইরে রাখবে।”

আজমীরের কথা শুনে তরুণীর চোখে পানি এসে গেল। সে আজমীরের চৌকিতে তার সাথে গা মিশিয়ে বসল। আজমীরের কাঁধে একটি হাত রেখে তরুণী এমনভাবে তার শরীরে গা এলিয়ে দিয়ে বসল যে, তার এলো চুলগুলো আজমীরের নাকে-মুখে স্পর্শ করছিল। বিগলিত কষ্টে তরুণী আজমীরকে বলল-

“আপনি আমাকে বন্য শূকরের আক্রমণ থেকে বাঁচিয়েছেন। এখন আপনি আমাকে মুক্ত করে পূর্ণ নিরাপত্তা দিয়ে আমার ঠিকানায় পৌছে দিতে চাচ্ছেন। এতোটা দিন আমাদের মতো তিনটি যুবতী মেয়ে সম্পূর্ণ আপনার ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষার উপর আপনার দয়া-অনুগ্রহে কাটালাম, তারপরও আপনি আমাদের প্রতি আকৃষ্ট হওয়া তো দূরে থাক আমাদের ঝুপ যৌবনের প্রতি একটু গভীরভাবে তাকিয়েও দেখেননি। আপনি পাথর হয়ে রইলেন...।”

কথা বলতে বলতে নীরব হয়ে গেল তরুণী। এক পর্যায়ে দুহাতে আজমীরের চেহারা তার দিকে ঘুরালো। মমতা শ্রদ্ধা ও ভালোবাসায় আজমীরের প্রতি তার আস্থানিবেদনের ভাব তরুণীর চোখে-মুখে ফুটে উঠলো।

হঠাৎ তরুণী বললো, “আমি তাজা রক্তের গন্ধ পাইছি। মনে হচ্ছে আপনি কোন গভীর বেদনায় আক্রমিত। আজমীর, আপনি কি আহত?”

আস্তে করে বামহাতটি উপরে উঠালো আজমীর। তার হাতে একটি ধারালো খঙ্গে। খঙ্গের অগ্রভাগ রক্তমাখা। তরুণী তার ডানপাশে বসে ছিল। সে দেখতে পায়নি, সে যখন আজমীরের গলা জড়িয়ে গায়ে গা এলিয়ে দিয়ে আজমীরের দেহে কামনার আশুন জ্বালাতে চেষ্টা করছিল, এই প্রমোদনা থেকে নিজেকে বাঁচানোর জন্য অতি সন্তর্পণে আজমীর তার কোমরে রক্ষিত খঙ্গের কোষমুক্ত করে ধীরে খোলাপায়ের উপরিভাগে বিন্দু করল। তরুণী রক্তমাখা থেকে দেখে বসা থেকে উঠে আজমীরের মুখোমুখি দাঁড়াল। তখন আজমীরের পায়ের ক্ষতস্থানের দিকে তার নজর পড়ল। ফিনকী দিয়ে সেখান থেকে রক্ত বেরোচ্ছে। অবাক বিশয়ে সেদিকে কতোক্ষণ তাকিয়ে রইল তরুণী।

“এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই সুন্দরী।” আমি মানুষ, ফেরেশতা নই। আমি পুরোপুরি সক্ষম একজন যুবক। তোমার শরীরের স্পর্শ ও রেশমী চুলের ছোঁয়া আমাকে স্বীয় কর্তব্য থেকে দূরে সরিয়ে নিছিল। আমি শুধু সুলতানের চাকুরী করি না, আল্লাহর দরবারেও আমার কর্তব্য সম্পর্কে আমাকে জবাবদিহি করতে হবে। এ ভূখণ্ডে একজন সুলতান আর মহারাজাদের সংঘাত রাজ্য দখল নিয়ে নয়, এটি সত্য ও ন্যায় এবং অসত্য ও অন্যায় মতবাদের সংঘাত।

আমি সাময়িক একটু সুখ ভোগের জন্য আমার আজীবন লালিত স্বপ্ন ও আদর্শকে জলাঞ্জলী দিতে পারি না। তোমার রূপ-সৌন্দর্য ও সমর্পিত নিবেদন উপেক্ষা করে মনের মধ্যে চাপও সৃষ্টি করতে চাই না। এজন্য তোমার দিকে থেকে দৃষ্টি ফেরাতে নিজের পায়েই খঙ্গের বিন্দু করেছি।... ঠিক আছে তুমি এখন নিজের কক্ষে চলে যাও।...

তরুণী আজমীরের একটি হাত টেনে নিয়ে তার চোখে স্পর্শ করাল এবং তাতে চুমো খেয়ে নিজ কক্ষে চলে গেল।

পরদিন সকালে তিন তরুণীকে তিনটি ঘোড়ায় সওয়ার করে দশজন অশ্বারোহী সহযোদ্ধাকে সাথে নিয়ে কমান্ডার আজমীর কালাঞ্জরের পথে রওনা

হয়ে গেল। তরুণীরা বারবার তাদের ঘোড়া আজমীরের ঘোড়ার পাশে নিয়ে আসছিল। কিন্তু আজমীর তাদের প্রতি মুচকি হাসি উপহার দেয়া ছাড়া কোন কথা বলেনি।

মধ্যরাতের পরে কালাঞ্জর দুর্গের প্রধান ফটকের সামনে পৌছলো আজমীরের কাফেলা। দুর্গের অন্তিমদূরে তরুণীদের নামিয়ে দিয়ে সঙ্গীদের নিয়ে ফিরে আসতে উদ্যত হলো আজমীর।

জীবন বাঁচানোর কৃতজ্ঞতায় আজমীরের কাছে নিজেকে সমর্পণকারী মেয়েটি আজমীরের পথ আগলে দাঁড়িয়ে বিনীত কঠে বললো, “আপনার উপকারের কোন প্রতিদান আমি দিতে পারিনি। আমার দেহ ছাড়া আপনাকে দেয়ার মতো আর কিছু ছিলো না আমার। এজন্য আজীবন একটা দুঃখবোধ আমাকে বয়ে বেড়াতে হবে।”

“আমি কোন প্রতিদান চাই না। আমাকে আমার প্রত্ন উত্তম প্রতিদান দিবেন। তৃষ্ণি তোমাদের রাজাকে গিয়ে বলো, যুদ্ধ হয় রণাঙ্গনে পুরুষে-পুরুষে। নারীকে দিয়ে কখনো যুদ্ধ জেতা যায় না।”

সহযোদ্ধাদের নিয়ে ফিরে আসার পথে আজমীরের মন ছিল ঝুরফুরে। আল্লাহর দরবারে কায়মনোবাকে নিজেকে সমর্পণ করার পর আল্লাহ তার আবেদন ষঙ্গে করেছেন। তার ঈমানের নূর সে প্রত্যক্ষ করেছে। সেই সাথে অর্পিত দায়িত্ব সৃষ্টি ও সুন্দরভাবে পালন করতে পেরেছে সে।

এদিকে সেনাপতি সারওয়াগ অচেনা পাহাড়ের ঘূর্ণিপাকে ঘুরে ঘুরে হয়রান। তিন-চারদিন বিরতিহীন ঘুরে-ফিরেও পাহাড়ের বেষ্টনী থেকে বেরিয়ে গত্বে পৌছার কোন পথ পায়নি তারা। এই এলাকায় যদি খাওয়ার উপযোগী সুমিষ্ট ফলজ গাছের সমারোহ এবং সুপেয় পানির প্রার্থতা না থাকতো, তাহলে এতোদিনে তাদের পক্ষে জীবন বাঁচানোই অসম্ভব হয়ে যেতো।

লোহাকোট দুর্গের হিন্দু রাজাকে প্রথম এ খবরটি দেয়া হলো যে, বালনাথ দুর্গের মুসলিম দুর্গপতি এবং গ্যন্নী সুলতানের আঞ্চলিক প্রশাসক সেনাপতি সারওয়াগ একজন ইমাম ও কয়েকজন সৈন্য নিয়ে পাহাড়ের মধ্যে ঘূরপাক খাচ্ছে। তাদেরকে হিন্দুরা বিভ্রান্ত করে পাহাড়ের মধ্যে এনে ছেড়ে দিয়েছে। লোহাকোট দুর্গের দুর্গপতি কালবিলম্ব না করে এ খবরটি রাজা নন্দরায়কে জানাল। রাজা নন্দরায় এ খবর শনেই নির্দেশ দিলেন, ওদের সবাইকে পাকড়াও করে দুর্গে নিয়ে আসা হোক।

এক দিন পর পার্শ্ববর্তী একটি মুসলিম সেনাচৌকির এক সিপাহী কমাত্তার আজমীরের চৌকিতে এসে সেই চৌকির কমাত্তারের গুর্ক থেকে জানাল-

“আমি খবর পেয়েছি, কালাঞ্জির দুর্গের একটি সেনাদল আমাদের সেনাবাহিনীর একটি ছোট কাফেলাকে প্রেফতার করে কালাঞ্জির নিয়ে যাচ্ছে। আমার পক্ষে এটা জানা সম্ভব হয়নি যে, এই মুসলিম সৈন্যরা কারা এবং কোন চৌকির সৈনিক? আমি ওদের উদ্ধার করতে যাচ্ছি, কিন্তু আমার জনবল খুবই কম। যথাসম্ভব জনবল দিয়ে আমাকে সহযোগিতা করুন।”

“সংবাদ পাওয়ার সাথে সাথে তার চৌকির বাছাই করা দশজন সিপাহীকে নিয়ে আজমীর নিজেই রওনা হলো। পথ ছিল দুর্গম এবড়ো-খেবড়ো। তারপরও আজমীর ও সাথীরা চার-পাঁচ ঘন্টার মধ্যে সংবাদ প্রেরণকারী চৌকির কমাত্তারের কাছে পৌছে গেল।

গমনী বাহিনীর কয়েকজন সদস্যক কালাঞ্জিরের সৈন্যরা প্রেফতার করার খবরটি দিয়েছিল স্থানীয় একজন অধিবাসী। সে জানালো, হিন্দুদের দলের সৈন্য সংখ্যা পঞ্চাশ-ষাটজনের কম হবে না। আজমীর ও সংবাদদাতা কমাত্তার ত্রিশজন সিপাহী নিয়ে উদ্ধার অভিযানে রওনা হলো। সংবাদদাতা লোকটিই ছিল তাদের গাইড। বেশী দূর যেতে হলো না তাদের। ঘন্টাবানিক অগ্রসর হওয়ার পর ময়দান পেরিয়ে একটি পাহাড়ী উপত্যকায় পৌছে তারা দেখতে পেল হিন্দুবাহিনীর বেষ্টনীতে গমনকারী কয়েকজন মুসলিম যোদ্ধাকে। দূর থেকেই তারা সেনাপতি সারওয়াগকে চিনতে পারল। সেই সাথে অন্য সিপাহীরাও ছিল তাদের পরিচিত।

কাছাকাছি গিয়ে আজমীর হিন্দুদের শাসিয়ে বল্ল, “বন্দীদের এখানেই ছেড়ে দিয়ে তোমরা চলে যাও।”

হিন্দুরা আজমীরের হৃষকির কোন মৌখিক জবাব না দিয়ে মোকাবেলার প্রস্তুতিতে সারিবদ্ধ হয়ে গেল। সাথে সাথে আজমীরের নেতৃত্বে সহযোদ্ধারা হিন্দুদের উপর হামলে পড়লো। হিন্দু ও মুসলমান উভয় পক্ষের সবাই ছিল অশ্঵ারোহী। হিন্দুদের হাতে বন্দী সারওয়াগের সাথীদের সবাইকে ওরা পায়ে হেঁটে যেতে বাধ্য করেছিল। শুরু হয়ে গেল দু’পক্ষের মধ্যে তুমুল সংঘর্ষ। অল্পক্ষণের মধ্যে বন্দীদেরকে মুক্ত করতে সক্ষম হলো আজমীরের দল। উভয় পক্ষের মধ্যেই হতাহতের ঘটনা ঘটলো।

এক পর্যায়ে হিন্দুবাহিনী পালিয়ে গেলে বন্দীদশা থেকে মুক্তিপ্রাপ্ত সারওয়াগ ও তার সাথীরা নিহত যোদ্ধাদের ঘোড়াগুলো ধরে সেগুলোতে সওয়ার হয়ে নিকটবর্তী মুসলিম সেনাচৌকির দিকে রওয়ানা হলো। কিন্তু এই দলের মধ্যে কমান্ডার আজমীরকে দেখা গেল না।

কমান্ডার আজমীরের ঘোড়া আহত হয়ে বণাঙ্গন থেকে দূরে সরে গিয়েছিল। আজমীর ঘোড়া না ছেড়ে এটিকে নিয়ে চৌকিতে ফেরার চেষ্টা করছিল। কিন্তু পলায়নপর সাত-আটজন হিন্দু সৈন্য পেয়ে গেলো তাকে। ওরা আজমীরকে একাকী পেয়ে ঘেরাও করে ফেলল। ঘোড়াটি দুর্বল হয়ে পড়ায় তার পক্ষে পালানো সম্ভব ছিলো না। একাকী এতোজনের ঘোকাবেলা করাও সম্ভব ছিলো না তার। অগত্যা অসহায় আজমীরকে ঘ্রেফতারী বরণ করতে হলো। হিন্দুরা তাকে ঘোড়ার পিঠে বেধে কালাঞ্জর নিয়ে গেল। পথিমধ্যে আরো হিন্দু সৈন্য এদের সাথে মিলিত হলো। তারাও দু'জন মুসলিম সৈন্যকে বন্দী করে নিয়ে যাচ্ছিল।

মুহূর্তের মধ্যে দুর্গে রটে গেল, কয়েকজন মুসলিম সৈন্যকে বন্দী করা হয়েছে। রাজমহলের ভেতরের রক্ষিতা ও নর্তকীদের কাছে চলে গেল মুসলিম সৈন্য ঘ্রেফতার করে আনার খবর। বন্য শূকরের আক্রমণ থেকে আজমীরের উদ্ধার করা নর্তকী এ খবর শুনে তৎক্ষণাত বের হয়ে এলো। কারণ, মুসলমান সৈন্যদের বন্দীশালায় বেশ কিছুদিন কাটিয়েছে সে। মুসলমানদের উন্নত মানসিকতা, ধর্মনিষ্ঠা, কর্তব্যপরায়ণতা ও সর্বোপরি আদর্শের পরাকাষ্ঠা সে গয়নী বাহিনীর মধ্যে দেখেছে। এখন সেই গয়নী বাহিনীর সৈনিককে হিন্দুদের হাতে ঘ্রেফতার হওয়ার খবরে সে তাদের নিজ চোখে দেখার আগ্রহ দমাতে পারলো না। কমান্ডার আজমীরের বীরত্ব, হৃদয়তা, মানবিকতা, উন্নত নৈতিকতার কারণে গোটা গয়নী বাহিনীর প্রতিই সেই তরঙ্গীর হৃদয়ে শৃঙ্খলা ও ভক্তির আসন সৃষ্টি হয়েছিল। ধর্মীয় চাপে মুসলমানদের প্রতি যতই হিংসা থাকুক না কেন, হৃদয়ের গভীরে শৃঙ্খলার আসনটিকে সে সরিয়ে দিতে পারছিলো না। তাই নিজ চোখে মুসলমান বন্দীদের দেখার জন্য যখন সে বন্দীদের কাছে পৌছল, আজমীরকে দেখে হতচকিয়ে গেল তরঙ্গী, তখন মুহূর্তের মধ্যে সে সিদ্ধান্ত নিল, যে লোক হিংস্র জন্মের আক্রমণ থেকে আমাকে বাঁচিয়েছে, তাকে বাঁচাতে আমি সঞ্চাব্য সব কিছুই করবো। যেই ভাবনা সেই কাজ।

হিন্দু সৈনিকদের কমান্ডারকে হাতের ইশারায় একটু দূরে সরিয়ে নিয়ে তরুণী তার কানে কানে আজমীরকে ছেড়ে দিতে অনুরোধ করলো। সে কমান্ডারকে জানালো, এই মুসলিম সৈনিক কিভাবে তার জীবন বাঁচিয়েছিলো এবং এর প্রতিদানে নিজেকে পেশ করার পরও সে তা ধ্রুণ করেনি। তরুণী কমান্ডারকে বললো, তুমি এ কাজ করলে তোমাকে প্রত্যাশার চেয়েও অনেক বেশী পুরস্কার দেবো এবং তাকে এমনভাবে দুর্গের বাইরে পাঠাবো যে, কেউ ঘুণাক্ষরেও তা জানতে পারবে না।

তখনও পর্যন্ত বন্দীরদেরকে কোন সরকারী উচ্চ মহলের কাছে পেশ করা হয়নি। তখন সম্ম্যার অন্ধকার গাঢ় হয়ে গেছে। বন্দীদেরকে তখন বন্দীশালায় রেখে দেয়ার কথা। হিন্দু কমান্ডারকে ছলে-বলে-কৌশলে আজমীরের মুক্তিদানে সম্মত করিয়ে তরুণী অন্ধকারের সুযোগ নিয়ে আজমীরকে একটি ঘন ঝোপ-ঝাড় ও গাছগালাছীর আড়ালে নিয়ে গেল। আজমীরকে এখানে বসিয়ে রেখে তরুণী দৌড়ে চলে গেল এবং কিছুক্ষণের মধ্যে কিছু কাপড় ও একটি ঘোড়া নিয়ে এলো। তাড়াতাড়ি আজমীরের গায়ে পরিয়ে দিল হিন্দু ঝঁঝি-পুরোহিতদের কাপড় এবং তাকে একজন বয়ক পুরোহিতের পোশাকে সজ্জিত করে মাথায় বিশেষ পাগড়ী বেধে দিল এবং ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে অঞ্চল হতে বলে নিজে আগে আগে চলল।

শাহী নর্তকী এগিয়ে গিয়ে প্রধান ফটকে প্রহরারত দায়িত্বশীল অফিসারকে বললো, “বাবাজি আমাদের কাছে এসেছিলেন। এখন জরুরী কাজে তাকে দুর্গের বাইরে অবস্থিত কাছের গ্রামে যেতে হচ্ছে। সেখানে দু’জন লোক মারা গেছে। তিনি পৌছুলে পরেই শুরু হবে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া। অন্দরমহল থেকে আমাকে দ্বার খুলিয়ে দেয়ার জন্য বলা হয়েছে।”

দ্বাররক্ষী জানতো, এই তরুণী রাজমহলের নর্তকী। রাজপ্রাসাদ ও মহলে এই তরুণী প্রভাব-প্রতিপত্তি সম্পর্কেও অবহিত দ্বাররক্ষী। তাই কোন ধরনের দ্বিধা-চিন্তা না করে দ্বার খুলে দিল সে। পুরোহিতবেশী আজমীর বিনা বাধায় ফটক পেরিয়ে গেল। তাকে বের করে দিয়ে পুনরায় বন্ধ করে দিল ফটক। আজমীর দুর্গ থেকে বেরিয়ে ঘোড়া না হাঁকিয়ে ধীরে ধীরে অঞ্চল হলো। দুর্গ থেকে অনেক দূরে গিয়ে সে পুরোহিতের বেশধারী জামা খুলে ফেলল এবং পেট মোটা করার জন্য জামার নিচে গুঁজে দেয়া কাপড়ও ছুঁড়ে ফেলে দিল। মাথার

বিশেষ পাগড়ীও ফেলে দিয়ে স্বাভাবিক হয়ে চৌকির উদ্দেশ্যে ঘোড়া হাঁকাল আজমীর।

একটানা ঘোড়া হাঁকিয়ে পরদিন অপরাহ্নে নিজের চৌকিতে পৌছল আজমীর। সেনাপতি সারওয়াগ ও তার যেসব সঙ্গী হিন্দুদের হাতে বন্দী হয়েছিল, তারা মুক্ত হয়ে আজমীরের সেনাচৌকিতে এসে আশ্রয় নিয়েছে। কারণ, সব কাছের চৌকির মধ্যে আজমীরের চৌকিই ছিল সবচেয়ে মজবুত ও নিরাপদ।

“আরে আজমীর যে! এ দু’দিন তুমি কোথায় ছিলে? এখন কোথেকে এলে? দু’দিন পর আজমীরকে চৌকিতে ফিরতে দেখে জানতে চাইলেন সেনাপতি সারওয়াগ।

“আগে জরুরী কথা শুনুন।” বললো কমান্ডার আজমীর। আমার ঘোড়া অচল হয়ে গিয়ে আপনাদের কাছ থেকে দূরে সরে গিয়েছিলাম। আমার একাকীভু ও ঘোড়ার অচলাবস্থা আমাকে বন্দিত্ব বরণ করতে বাধ্য করে। একজনের সহায়তায় আমি কালাঞ্জর দুর্গ থেকে বেরিয়ে এসেছি। এখানকার অবস্থা খুবই খারাপ। কালাঞ্জরের রাজা এখানকার মুসলমানদের বিরুদ্ধে যে চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার করে রেখেছিল, আপনি তার প্রত্যক্ষ সাক্ষী। আল্লাহর মেহেরবানী যে, তাদের এ চক্রান্ত ভগ্নুল হয়ে গেছে। আপনাকে ফ্রেফতার করে কালাঞ্জর নিয়ে যাওয়ার চেষ্টাই প্রমাণ করে, এখানকার ছোট ছোট সব হিন্দু রাজারা আর আমাদের করদারাজা হিসেবে থাকতে রাজি নয়। এরা গোপনে সামরিক প্রস্তুতি নিচ্ছে। কালাঞ্জর দুর্গ থেকে আমি জানতে পেরেছি, কালাঞ্জর দুর্গে দু-তিনজন রাজার সকল সৈন্য একত্রিত হচ্ছে। লাহোরের মহারাজা ভীমপাল নিজে বিপুল সংখ্যক সৈন্য নিয়ে কালাঞ্জর দুর্গে আসছেন। সম্ভবত সম্মিলিত বাহিনীর কমান্ড ভীমপালের হাতে থাকবে। মহারাজারা কালাঞ্জর দুর্গে একত্রিত হয়েই সুলতানকে কর দিতে অস্তীকৃতি জানিয়ে পয়গাম পাঠাবে। এরপর আমাদের ছোট ছোট চৌকিগুলো ধ্বংসের কাজ শুরু হবে।”

“এমনটা হওয়াই তো স্বাভাবিক।” বললেন সেনাপতি সারওয়াগ। যে কোন পরাজিত শক্তি প্রতিশোধ নিতে চেষ্টা করতেই পারে। হিন্দু এমন এক দ্বিমুখী জাতি যে, এরা পরাজয় অবশ্যভাবী মনে হলে তোমার সামনে তরবারী

ফেলে দিয়ে পায়ে পড়ে, ভিক্ষুকের মতো প্রাণভিক্ষা চাইবে। তখন যদি ওদের মুক্তির বিনিময়ে বলো তোমাদের সকল কন্যা, জাগীর, ভগ্নিকে আমাদের হাতে তুলে দিতে হবে, তাতে বিন্দুমাত্র কৃষ্টাবোধ করবে না। কিন্তু কোনমতে তোমার তরবারীর কজামুক্ত হতে পারলেই বিমাক্ত সাপের মতো ছোবল ঘারবে। হিন্দুদের সাথে আমাদের যুদ্ধ রাজত্বের সীমা কিংবা ধন-সম্পদ নিয়ে নয়, আমাদের সাথে হিন্দুদের সংঘাতের একমাত্র কারণ ধর্মীয় বিশ্বাস। এ যুদ্ধ যতদিন পর্যন্ত হিন্দুস্তানে একজন হিন্দু কিংবা মুসলমান থাকবে, ততদিন পর্যন্তই অব্যাহত থাকবে। কিন্তু এখন দেখার বিষয় হচ্ছে, হিন্দুরা কখন আমাদের আক্রমণ করে।”

“আমি আপনাকে অনুরোধ করবো, হিন্দুদের আক্রমণ দেখার জন্য আমাদের নিষ্কায় বসে থাকা ঠিক হবে না। আজই একজন দৃত গয়নী সুলতানের কাছে এই আশঙ্কার সংবাদ দিয়ে পাঠানো দরকার। আমাদের উচিত হবে শক্রদের শক্তি ও সামর্থের ব্যাপারে আস্তত্ত্বের চেকুর না তোলা। কারণ, যখন ওদের আক্রমণ শুরু হয়ে যাবে, তখন অল্প কজন লোক দিয়ে আপনি ওদের বিশাল বাহিনীর মোকাবেলা কিভাবে করবেন? বললো কমাডার আজমীর।

আজমীরের প্রস্তাব খুবই যৌক্তিক মনে হলো সেনাপতি সারওয়াগের। তিনি তখনই মৌখিক পয়গাম দিয়ে গয়নীর উদ্দেশ্য দু'জন সৈনিক পাঠানোর ব্যবস্থা করলেন। তাদেরকে বলা হলো, পথিমধ্যে যথাসম্ভব কম বিশ্বাস নেবে এবং প্রয়োজন হলে প্রত্যেক চৌকি থেকে ঘোড়া বদল করে নেবে।

প্রত্যাশার চেয়েও কম সময়ে দৃত গয়নী পৌছে গেল। সুলতান মাহমুদ তার সেনাবাহিনীর সকল সৈনিকের মধ্যেই এ বিষয়টি বুঝিয়ে দিতে পেরেছিলেন যে, কয়েক মিনিটের বিলম্ব অনেক ক্ষেত্রে গোটা বাহিনীর পরাজয়ের কারণ হতে পারে। সুলতানের এই শিক্ষার কারণে সংবাদবাহক প্রত্যাশার চেয়েও দ্রুত গয়নী পৌছে গেল। সংবাদবাহক যখন সুলতানকে কাশ্মীরের অবস্থা সম্পর্কে অবহিত করছিল, তখন তার ঘবান চললেও মাথা দোল খাচ্ছিল আর যন্ত্রণায় তার চোখ বক্ষ হয়ে আসছিল। ক্ষুধা-পিপাসা এবং বিরতিহীন ক্লান্তিতে তার দেহ অবসন্ন হয়ে পড়েছিল।

এ প্রসঙ্গে ইংরেজ ইতিহাস গবেষক স্যার হেনরী হোয়ার্থ ১৮৯৮ সালে

শ্রী প্রকৃতি প্রক্রিয়া

“কাশীরের গোলযোগ ও সেনাপতি সারওয়াগের ফ্রেফতারী এবং রাজা নন্দরায় ও ভীমপালের চক্রান্তের ব্বৰ শুনে সাথে সাথেই সুলতান সেনাবাহিনীকে অভিযানে রওনা হওয়ার নির্দেশ দেন। এর আগে কখনো অভিযানের মক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও কৌশল সম্পর্কে সৈন্যদের অবহিত করা ছাড়া তাকে অভিযানের নির্দেশ দিতে দেখা যায়নি। এর কারণ সম্পর্কে বিশ্বেষকগণ বলেছেন, ইসলামের নীতি-আদর্শের প্রশ়্নে সুলতান ছিলেন খুবই আপোসহীন ও আবেগপ্রবণ। তিনি তখন বলেন, দক্ষিণ কাশীরের যে এলাকায় তিনি ঘোষিকভাবে ইসলামী শাসন জারী করে এসেছিলেন এবং স্থানীয় অধিবাসীদের ইসলাম গ্রহণের নির্দেশ দিয়েছিলেন, সেই নির্দেশ মান্য করে স্থানীয় অধিবাসীদের সিংহভাগ ইসলাম গ্রহণ করেছিলো এবং নওমুসলিমদের শিক্ষাদীক্ষার জন্য তার নির্দেশে বহু মসজিদ-মক্কুল স্থাপিত হয়েছিল। বহু সংখ্যক ইমাম ও শিক্ষক লাহোর বাটাড়া ও অন্যান্য জায়গা থেকে কাশীরে পাঠানো হয়। কিন্তু পরাজিত হিন্দু রাজারা বহুমুখী চক্রান্তের জাল বিত্তার করে নওমুসলিমদের বিভাস করে ফেলেছে। শুধু তা-ই নয়, আঞ্চলিক প্রশাসক সেনাপতি সারওয়াগকে চক্রান্তকারীরা বন্দী করেছে। সেই সাথে সুলতানের বিরুদ্ধে পুনরায় যুদ্ধ ঘোষণার প্রস্তুতি নিষ্কে। তখন সুলতান এতটাই স্কুর্ক হয়েছিলেন যে, স্বত্বাব্জাত যুদ্ধ চিন্তা ও পরিকল্পনা করে নেয়ার অবকাশ তার হয়নি। স্বাভাবিক অবস্থায় নিজেকে ফিরিয়ে এনে তিনি ভাবতেই পারেননি, কোথায় কোন অবস্থায় কাদের সাথে ঘোকাবেলায় রওনা হচ্ছেন তিনি। ফলে তার বাহিনী কাশীরে পৌছার আগেই সেখানে প্রচণ্ড শীত ও তুষারপাত শুরু হয়ে যাবে এদিকটি তিনি চিন্তা করেননি। তিনি ভাবতেই পারেননি, অত্যধিক ঠাণ্ডা আর তুষারপাত তার পরাজয়ের কারণ হতে পারে কিংবা অভিযানকে ব্যর্থতায় পর্যবসিত করতে পারে।

ঐতিহাসিক হায়দার কিরগানী ‘তারিখে রাশেদী’ গ্রন্থে লিখেছেন, “হতে পারে অতীতের অব্যাহত বিজয়ের মনোবল ও শক্রদের চক্রান্তের স্কুর্কতায় সুলতান অভিযানের সময়, ক্ষেত্র, অবস্থা ও প্রতিবন্ধকভার কথা বিবেচনা না করেই সৈন্যদের রওনা হওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন। কিংবা কাশীরের প্রাকৃতিক অবস্থা, শীতকালে সেখানকার প্রাকৃতিক পরিবেশ-পরিস্থিতির ব্যাপারে তাঁর বাস্তব কোন ধারণা ছিল না। কাশীরের পথঘাট সম্পর্কেও তাঁর ধারণা ছিল অস্বচ্ছ।

বস্তুত পেশোয়ার থেকে আরো কিছু সৈন্য সাথে নিয়ে হ্রভাবজাত দ্রুততার চেয়ে আরো বেশী ক্ষিপ্তায় তিনি কাশীরের সীমানায় পৌছেন। ১০১৫ সালের জানুয়ারী মাসের প্রথম দশকে সুলতান তার সৈন্যদল নিয়ে কাশীর পৌছেন। তখন পাহাড় ও সমতল সবজায়গা তুষারপাতের কারণে বরফে ঢাকা পড়ে গেল। সুলতানকে তাঁর গোয়েন্দা সূত্র খবর দিল, রাজা ভীমপাল ও নন্দরায় এখন কালাঞ্জির দুর্গে নয়, লোহাকোট দুর্গে অবস্থান করছে। কালাঞ্জির দুর্গ অবরোধ করে কালক্ষেপণ না করে লোহাকোট দুর্গ অবরোধের পরামর্শ দেয়া হলো। কারণ, লোহাকোট দুর্গ দখলে এসে গেলে কালাঞ্জির অবরোধ ছাড়াই দখলে এসে যাবে।

এদিকে লোহাকোট দুর্গে অবস্থানকারী মহারাজাদের কাছে খবর এলো, সুলতান মাহমুদ এসে গেছে। মহারাজা নন্দরায় চক্রান্ত ও দুর্জ্জিতিকারী দলের প্রধানকে ডেকে বললেন, “তোমার সেই লোকদের নিয়ে এসো।” কিছুক্ষণের মধ্যে রাজা নন্দরায়ের সামনে দশ-বারোজন লোকের একটি দলকে এনে দাঁড় করানো হলো।

“তোমাদের কী করতে হবে তা কি তোমাদের জানা আছে?” সামনে দণ্ডয়মান লোকদের জিজ্ঞেস করলেন রাজা নন্দরায়।

“জি মহারাজ! আমরা আমাদের কর্তব্য সম্পর্কে পুরোপুরি অবহিত। আমরা সুলতানের কাছে গিয়ে বলবো, আমরা এই এলাকার মুসলমান। এই অঞ্চলের পোশাক পরেই আমরা তার সামনে যাবো। আমরা তার কাছে আবেদন করবো, আমরা আপনার অভিযানে শরীক হতে চাই এবং আপনার সেনাদের গাইড দেয়ার প্রয়োজনেই আমরা এসেছি। কারণ, মৌসুমী তুষারপাত পথঘাট সবই তলিয়ে দিয়েছে। বহুল ব্যবহৃত পথের কোনই চিহ্ন নেই। এমন অবস্থায় লোহাকোট কোন পথে যাওয়া যাবে আমরা সেই পথ জানি। আমরা নিষ্ঠাবান মুসলমানের মতোই কথাবার্তা বলবো। তাদের বিশ্বাস অর্জনের জন্য আমরা শুন্দি উচ্চারণে কলেমা ও নামায শিখে নিয়েছি।”

“সাবাস! যেভাবেই হোক তোমরা ওকে লোহাকোট নিয়ে আসবে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, লোহাকোট থেকে তাকে ব্যর্থ হয়েই ফিরতে হবে। কিরে যাওয়ার পথে তোমরাই হবে তাদের পথপ্রদর্শক। তখন তোমরা তোমাদের আসল উত্তাদী দেখাবে।”

এই দশ-বারোজন লোক ছিল কট্টর হিন্দু। এরা ছিল প্রশিক্ষিত দুষ্কৃতিকারী। এরা সুলতান মাহমুদকে বিভ্রান্ত করার জন্য দাঢ়ি রেখেছিল। চালচলন, কথাবার্তা, পোশাক-পরিচ্ছদে তারা প্রত্যেকেই সাক্ষা মুসলমানরূপে নিজেদের উপস্থাপন করার সব কৌশল রঞ্জ করেছিল।

লোহাকোট দুর্গের দিকে অভিযানের নির্দেশ দিয়েছিলেন সুলতান। পথের দুর্গমতা, অত্যধিক ঠাণ্ডা এবং তুষারপাতকে উপেক্ষা করলেন তিনি। কাশ্মীরে তাঁর যেসব সেনাচৌকি ছিল, তারা লোহাকোটে পৌছানোর জন্য অভিজ্ঞ গাইড বাছাই করে রেখেছিল। কারণ, সেই যুগের রীতি ছিল কোন সেনাবাহিনী যদি কোন অঞ্চনা জায়গায় আক্রমণ চালাতো, তখন স্থানীয় লোকদের থেকে গাইড সংগ্রহ করতো।

লোহাকোটের দিকে অগ্রসর হলে পথিমধ্যে দশ-বারোজনের একটি কাফেলা এসে সুলতানের বাহিনীতে যোগ দিল। এই দলের লোকেরা সুলতানের সহযোগিতার ব্যাপারে খুবই উচ্ছাস দেখাচ্ছিল। তারা নিজেদেরকে নিষ্ঠাবান মুসলমান হিসেবে সুলতানের সামনে নিখুঁতভাবে পেশ করে। তারা এও বলে, আমরা দীর্ঘদিন এসব হিন্দুরাজাদের দ্বারা নির্যাতিত হয়েছি। আজ আমরা ওদের জুলুমের প্রতিশোধ নিতে বন্ধপরিকর। তাদের আবেগময় আবেদন আর মুসলমান হিসেবে নিখুঁত ভাবভঙ্গিমায় আশ্বস্ত হয়ে তাদের একেকজনকে গাইড হিসেবে প্রত্যেকটি সেনা ইউনিটে ভাগ করে দিলেন সুলতান। সেনাপ্রতিদের বললেন, তাদের কথামতো অগ্রসর হতে।

লোহাকোট দুর্গ সম্পর্কে অনেক কাহিনীই শুনেছিলেন সুলতান। কিন্তু যখন লোহাকোট দুর্গকে প্রত্যক্ষ করলেন, তখন তার মনে হলো, তাকে লোহাকোট দুর্গ সম্পর্কে খুব কমই বলা হয়েছে।

সুলতান মাহমুদ ছিলেন দুর্গজয়ের উত্তাদ। কিন্তু লোহাকোট দুর্গ দেখে তিনি বিরাট এক ধাক্কা খেলেন। দেখেই তিনি বুঝতে পারলেন কেন লোহাকোট দুর্গ অজেয় দুর্গ হিসেবে খ্যাত। দুর্গটি ছিল বিশাল এক পাহাড়ের উপর অবস্থিত। এটি যেমন ছিল দুর্ভেদ্য, অদ্রপ এর গঠনও ছিল মজবুত। সম্পূর্ণ পাথর ও মাটির মিশ্রণে বিশাল পুরুত্বে তৈরি ছিল দুর্গের প্রাচীর। তাছাড়া দুর্গের চারকোণে ছিল চারটি সুউচ্চ বুরুজ। এই বুরুজ থেকে যে কোন আক্রমণকারী দলকে সহজেই তীরের আঘাতে ঘায়েল করা সহজ ছিল।

সবচেয়ে বিশ্বায়কর ব্যাপার ছিল, প্রাকৃতিকভাবেই দুর্গের চতুর্দিকে ছিল গভীর খাদ। প্রতিটি ফটকের সামনের চতুর ছিল অনেক ঢালু। ফটকগুলো বিশালকায় লোহার ডাঙা দিয়ে তৈরি। হাতির কাঁধে শক্ত গাছের কাণ্ড রেখে এগুলোকে আঘাত করলেও ভাঙা সম্ভব ছিল না।

সুলতান মাহমূদ দুর্গকে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করে সকল সৈন্যকে এক জায়গায় একত্রিত করলেন। একটি অশ্বপৃষ্ঠে সওয়ার হয়ে কাছের একটি টিলার উপরে দাঁড়িয়ে তিনি তার সৈন্যদের সাহস জোগানো এবং হিস্তি বাড়ানোর উদ্দেশ্যে বললেন, হে আল্লাহর সৈনিকেরা! তোমরা গবনী সালাতানের জন্য নয়, আল্লাহ ও রাসূল সা. এর উদ্দেশ্যে যুদ্ধে এসেছো। আমরা এই এলাকার লোকজনকে ইসলামের দীক্ষা দিয়ে আল্লাহর নাফরমানী থেকে ফিরিয়ে এনেছিলাম। কিন্তু শুধু মুসলমান হওয়ার অপরাধে এখানকার বেঙ্গমান রাজা-মহারাজারা এদের উপর নির্যাতনের তুফান চালাচ্ছে। আজকে তোমাদেরকে এই বেঙ্গমানদের রক্তে ইসলামের প্রদীপ জ্বালাতে হবে।

“ওই যে দুর্গ তোমরা দেখছো, এই দুর্গ তোমাদের দেখে উপহাস করছে। এখানকার মৌসুমও তোমাদের জ্ঞানুটি করছে। তোমরা মরুময় পাথুরে ময়দানে লড়াই করে অভ্যন্ত। আজ এখানে প্রমাণ করে দাও, শীত ও বরফে যদি আসমান-জমিন সব কিছুও জমাট বেধে যায়, তারপরও মুসলমানের রক্ত জমে না। ঈমানের উষ্ণতা বরফের পাহাড়কেও গলিয়ে পানি করে দিতে পারে।

দেখো, আমরা বহুদূর থেকে এসেছি। আমরা এখানে এসেছি আল্লাহর পয়গাম তার বান্দাদের কাছে পৌছে দিতে। আল্লাহকে সাক্ষী রেখে শপথ নাও, কঠিন দুর্ভেদ্য এ দুর্গে ইসলামের পতাকা না উঠিয়ে আমরা ফিরে যাবো না।”

সরাসরি সৈন্যদের সামনে এমন আবেগী ভাষণ সুলতান তেমন দিতেন না। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তিনি কমাভারদের মাধ্যমে সৈনিকদের উজ্জীবিত করার পয়গাম দিতেন। কঠিন ও কঠোর ট্রেনিং দিয়ে সুলতান মাহমূদ তার প্রতিজন সৈন্যকে সর্বোচ্চ পর্যায়ের ত্যাগী, কষ্ট সহিষ্ণু ও সাহসী করে গড়ে তুলতেন। তাদেরকে আবেগী বৃক্তা দিয়ে উজ্জীবিত করার তেমন কোন প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু লোহাকোট দুর্গের অবস্থা ও তুষারপাতের বিন্দুপ পরিস্থিতি সুলতানের মনে যুদ্ধজয়ের সম্ভাবনাকে এতোটাই দুঃসাধ্য করে তুলেছিল যে, কঠিন থেকে কঠিনতর বিপদেও যার মধ্যে কখনো কোন ভাবান্তর দেখা যায়নি, রণাঙ্গনের

কঠিন পরিস্থিতিও যাকে পেরেশান, উত্থিগু ও আশাইত করতে পারেনি, সেই পাহাড়সম সাহসিকতার অধিকারী সুলতানের হস্যে শোহাকোট দুর্গ জয় এতোটাই দৃঢ়সাধ্য মনে হচ্ছিল যে, তার কঠের আওয়াজ ক্ষীণ হয়ে গিয়েছিল। ভাষণ দিতে গিয়ে তাঁকে বারবার থামতে হচ্ছিল। মনে হচ্ছিল, তিনি যথার্থ শব্দটি বলার জন্য স্মৃতিপট হাতড়ে বেড়াচ্ছেন।

যে কোন রংক্ষেত্রে যুদ্ধ শুরুর আগে সুলতান দুর্রাকাত নফল নামায পড়তেন। কিন্তু এদিন ঘোড়া থেকে নেমে তিনি তা করেননি। এমন কিছুও বলেননি যে, আমি জয়ের ইঙ্গিত পেয়েছি, বিজয় আমাদেরই হবে। অনেক রণাঙ্গনে তিনি এমন ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন। ভাষণ শেষে তিনি তাঁর ঘোড়াকে টিলার উপর থেকে নিচে নামিয়ে আনলেন।

শোহাকোট দুর্গের চারপাশে আল্লাহ আকবার খনি উচ্চকিত হতে লাগলো। যে পাহাড়ের উপর দুর্গ অবস্থিত এর বাইরে উচু নীচু অসংখ্য টিলা। এসব টিলা ও সমতল সব জায়গাতেই প্রচুর গাছগাছালী। দুর্গের বাইরের ঢালুতেও প্রচুর বৃক্ষাদি ছিল। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যে দুর্গের ঢালের বৃক্ষাদি কেটে সাফ করা হয়েছে।

সুলতান মাহমুদ দুর্গের চতুর্দিক ঘুরে পর্যবেক্ষণ করলেন। দুর্গ প্রাচীর ও বুরুজের উপর থেকে হিন্দু সৈন্যরা তাঁকে হমকি দিছিলো এবং নানা তিরক্ষারসূচক বাক্য ছুঁড়ে দিছিলো। হিন্দু সৈন্যরা তাছিল্যের স্বরে বলছিল, “মাহমুদ! তোমার খোদা তোমার ভাগ্যে বরফের কবর লিখে রেখেছে।”

চতুর্দিকের টিলা ও পাহাড়ের উপর তীরন্দাজ নিযুক্ত করে সুলতান দুর্গপ্রাচীরে অবস্থানকারী সৈন্যদের উপর তীর নিক্ষেপের নির্দেশ দিলেন। তীরন্দাজদের তীরের সহায়তা নিয়ে প্রাচীর ভাঙায় পারদশী সৈন্যদেরকে তিনি দুর্গ প্রাচীরের নিচে সুড়ং খননের জন্য নির্দেশ দিলেন। তিনি জানতেন, কাশ্মীরের পাহাড়গুলো নিরেট পাথরের নয়, পাথুরে মাটির হয়ে থাকে। কাজেই এতে খননকাজ তেমন কঠিন হবে না। সুলতান মাহমুদ ভেবেছিলেন, কয়েক গজ সুড়ং খনন করতে পারলেই খননকারীরা দুর্গ প্রাচীরের উপরের তীর থেকে নিজেদের হেফাজত করতে পারবে এবং নির্বিষ্ণু খননকাজ চালাতে পারবে।

প্রাচীর ভাঙা ও সুড়ং খননকারী দল নির্দেশ পেয়েই খননকাজে এগিয়ে গেল। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই তাদের তৎপরতা থেমে গেল। একজনের

পক্ষেও জীবন নিয়ে ফিরে আসা সম্ভব হলো না। দুর্গ প্রাচীর থেকে বৃষ্টির মতো তীর এসে তাদের সবাইকে বিন্দ করলো। সুলতানের তীরন্দাজরা আশপাশের পাহাড় ও টিলার উপর থেকে যেসব তীর নিষ্কেপ করছিলো, বেশী দূরত্বের কারণে তা দিয়ে দুর্গ প্রাচীরের শক্তি তীরন্দাজদের দমানো সম্ভব হলো না।

কয়েক সৈনিক জীবনবাজী রেখে প্রধান ফটকে অগ্নিসংযোগ করার জন্য দাহ্য পদার্থ এবং ফটক ভাঙার জন্যে হাতুড়ি-শাবল নিয়ে ফটকের দিকে অগ্রসর হলো। কিন্তু ফটকের সামনের চতুর ছিলো ঢালু এবং বরফে ঢাকা। মুসলিম সৈন্যরা ঢালু বেয়ে উপরে উঠতে গিয়ে পা পিছলে বরফের মধ্যে পড়তে লাগল আর উপর থেকে শক্তদের নিষ্কিঞ্চ তীরবিন্দি হয়ে গাঢ়িয়ে নিচে পড়তে লাগল। তাদের মধ্যেও দু'-চারজন ছাড়া কারো পক্ষে ফিরে আসা সম্ভব হলো না।

অন্যান্য ফটকেও অনুরূপ হামলা করার চেষ্টা হলো। একটি ফটকে কিছু জানবাজ আঘাত করতে শুরু করেছিল। কিন্তু দুর্গপ্রাচীরের উপর থেকে ফটক ভাঙ্গচুরকারীদের উপর জুলত কাঠ এবং আগুনের সলিতা নিষ্কেপ করলো শক্তবাহিনী। তাদের সবার শরীরই ঝলসে গেলো।

ঐতিহাসিক উত্তী, গারদিজী, ইবনুল আছীর এবং দুজন ইউরোপীয় ইতিহাসবিদ লিখেছেন, রাতের বেলায়ও সুলতানের সৈন্যরা দুর্গ প্রাচীরের নিচে সুড়ং খননের চেষ্টা অব্যাহত রেখেছিল। কিন্তু দিনের বেলায় সুলতান দেখতে পেলেন, দুর্গ প্রাচীরের নিচের খাড়িতে মুসলিম সৈন্যদের লাশের স্তুপ জমে গেছে। অবস্থা দেখে সুলতানের চেহারা রাগে-ক্ষেত্রে কালো হয়ে গেলো। তিনি পাগলের মতো দুর্গের চতুর্দিকে দৌড়াচ্ছিলেন আর সুড়ং খননের জন্য নির্দেশ দিচ্ছিলেন। সুলতানের নির্দেশে মুসলিম কমান্ডার ও সৈন্যরা অকাতরে তাদের জীবন বিসর্জন দিচ্ছিল।

পরদিন সন্ধ্যার আগেই চতুর্দিকে প্রচণ্ড অঙ্ককার নেমে এলো। হিমশীতল রাতের অঙ্ককারে শুরু হলো প্রবল তুষারপাত আর সেই সাথে ঝড়ো হাওয়া। তীব্র ঝড়ো হাওয়া আর প্রচণ্ড তুষারপাতে মানুষ তো দূরে থাক প্রশিক্ষণগ্রাণ্ট জঙ্গি ঘোড়াগুলোও টিকতে পারছিলো না। জীবন বাঁচানোর জন্য জঙ্গি ঘোড়াগুলো এদিক-সেদিক ছোটাছুটি করতে শুরু করলো; কিন্তু আশ্রয় নেয়ার মতো কোথাও কোন আড়াল ছিলো না।

সমতল-অসমতল সব জায়গা বরফে ঢাকা পড়ে যাচ্ছিল। কোনটা খাদ কোনটা টিলা বোঝা যাচ্ছিল না। তুষারপাত ও ঝড়ের গতি যেদিকে ছিল,

সেদিকে ছিল কাশীরের বিখ্যাত ঝিলম নদী। প্রবল বাতাসের ধাক্কা অশ্বারোহী ও ভারবাহী সব জন্ম ওদিকেই হটতে বাধ্য হচ্ছিল। ঝিলম নদীর তীর ছিল সরু; কিন্তু উঁচু ও খাড়া। নদী ছিল অপ্রশস্ত, গভীর ও তীব্র স্নোতিস্থিতি। নদী তীরের সবকিছু বরফে ঢাকা পড়ে গেল। বাতাসের ধাক্কায় অশ্বারোহী, আরোহীহীন জন্ম সবই নদী গর্জে গড়িয়ে পড়ছিল। তীব্র স্নোত আর বরফঢাকা খাড়া তীর বেয়ে কারো পক্ষে উপরে উঠে আসার উপায় ছিল না। সেই রাতের অন্দরকারে কতো সিপাহী আর কতো ভারবাহী জন্ম ঝিলম নদীর স্নোতে ভেসে গিয়েছিল, তার প্রকৃত হিসেব রাখা সম্ভব ছিল না।

রাত শেষে যখন ভোরের সূর্য উচিত হল, তখন কারো পক্ষে বলার উপায় ছিলো না, এটিই গতকালের ঝিলম তীর আর লোহাকোট দুর্গের চারপাশ। হাজার হাজার মুসলিম যোদ্ধা বরফের নিচে তলিয়ে গেল। উঁচু বরফের আন্তরণ পড়ে গেল সবখানে। সুলতানকে বেঁচে থাকা কমান্ডারগণ বিনয়ের সাথে বললেন-টানা বিজয়ের নেশায় আমরা এই অভিযানকে সেইভাবে বিবেচনা করিনি। এটাই হয়তো আল্লাহর ইচ্ছা ছিলো। এবার ক্ষান্ত হওয়া যাক। আল্লাহ চাহে তো আমরা আবার আসবো। যারা এখনও বেঁচে আছে, তাদের জীবন রক্ষার দিকটিই প্রাধান্য দেয়া হোক।

সুলতান মাহমুদ কমান্ডারদের পরামর্শ মেনে নিয়ে সৈন্যদের ফিরে যাওয়ার নির্দেশ দিলেন। ব্যর্থতার দায়ও নিজের কাঁধেই তুলে নিলেন তিনি। কিন্তু ফিরে যাওয়ারও পথ ছিলো না। সবকিছু বরফে তলিয়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। এমন বেগতিক অবস্থায় পথিমধ্যে যোগ দেয়া গাইডেরা এগিয়ে এলো। তারা এই দুঃসময়ে সুলতানকে আশ্বাস দিলো, মাননীয় সুলতান! দৃশ্টিস্তার কোন কারণ নেই, এখনো ফেরার একটি পথ পরিষ্কার আছে।

সেনাবাহিনী তখন বিক্ষিপ্ত। তারা প্রধান তিনটি অংশে বিভক্ত। পরিচয় গোপনকারী হিন্দু গাইডেরা তিনভাগে বিভক্ত হয়ে গাইডের ভূমিকায় অবতীর্ণ হলো।

তীব্র তুষারপাত রাতের বরফে তুফান আর সুডং খননের ব্যর্থ অভিযানে অর্ধেকের চেয়ে বেশী সৈন্য আগেই নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিল। বাকী অর্ধেকের কম সৈন্য তিনভাগে বিভক্ত হয়ে পরিচয় গোপনকারী শক্র গাইডের দেখানো পথে যখন গয়নী ফিরতে রওনা হলো, এর পরিপতি সম্পর্কে ঐতিহাসিক কারিশ্মা লিখেছেন-

“তীব্র তুষারপাত ও তুষার ঝড়ের পরদিন সুলতান মাহমুদ অবরোধ প্রত্যাহার করে ফিরে আসতে বাধ্য হলেন। কিন্তু ফেরার পথে হিন্দু পথপ্রদর্শকরা তাদেরকে ভুল পথে নিয়ে এতোটাই বিভ্রান্ত করতে সক্ষম হয় যে, টানা এক সঙ্গাহ গোটা বাহিনীকে তারা অচেনা-অজানা তুষার পথে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে হত্যা করে। তীব্র ঠাণ্ডা, অপর্যাপ্ত পানাহার, ব্যর্থতার প্লান আর সহযোগ্য হারানোর শোকে এমনিতেই মুসলিম যোদ্ধারা ছিলো ক্লান্ত, হতোদয়ম ও মনোবলহারা। এমতাবস্থায় বরফে ঢাকা পিছিল পথে বেশিরভাগ সৈন্যকে পায়ে হেঁটে অতিক্রম করতে হচ্ছিল। যুদ্ধান্ত ও জরুরী সামানপত্র কাঁধে করে বহন করতে হচ্ছিল তাদের। শক্ত পক্ষের গুপ্ত গাইড বিলম্ব নদীর সংকীর্ণ তীর ধরে তাদের নিয়ে যাচ্ছিল। অঘসর হতে গিয়ে বারংবার পা পিছলে গভীর নদীর অতলে গড়িয়ে পড়ছিল মুসলিম যোদ্ধারা। তাছাড়া জায়গা জায়গায় ছিল বরফের ফাঁদ। দৃশ্যত সমতল দেখা গেলেও হালকা বরফের নিচে লুকিয়ে ছিল গভীর গর্ত। এসব ফাঁদে পা দিয়ে বহু যোদ্ধা বরফের চোরাবালিতে তলিয়ে যেতে থাকে। বহু ঘোড়া ও ভারবাহী জন্মে বরফের চোরাবালিতে পড়ে জীবন ত্যাগ করতে থাকে। তীব্র ঠাণ্ডায় যেসব যোদ্ধা চলার শক্তি হারিয়ে বসে পড়তো, তার পক্ষে আর সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে অঘসর হওয়া সম্ভব হতো না। এভাবে সুলতানের অসংখ্য যোদ্ধাকে জীবন দিতে হলো। অথচ এরা প্রত্যেকেই ছিল সুলতান মাহমুদের বাহিনীর চৌকস যোদ্ধা।

দুর্গজয় তো সম্ভব হলোই না, তদুপরি ব্যর্থতা মেনে নিয়ে ফিরতে গিয়ে শক্ত গাইডের পাল্লায় পড়ে শত শত যোদ্ধাকে কুরবানী দিতে হলো। বন্ধুবেশী শক্ত গাইডেরা এক দিন গোটা বাহিনীকে ত্যাগ করে পালিয়ে যায়। বরফচাকা পাহাড়ী পথে চক্র খেয়ে সিংহভাগ সহযোগ্যাকে হারিয়ে সুলতান মাহমুদ যখন টিলায়ুগিয়ায় অবস্থিত সেনাপতি সারওয়াগের সেনাক্যাম্পে পৌছলেন, তখন তার সাথে মাত্র হাতে গোনা কয়েকশত যোদ্ধা। ব্যর্থ, ক্লান্ত, শোকাহত সুলতান কয়েকদিন সারওয়াগের ক্যাম্পে অবস্থান করে গয়নী ফিরে এলেন।

## ଲକ୍ଷ୍ୟ ସଥନ କ୍ଷମତା ଓ ସିଂହାସନ

୧୦୧୭ ଖୃଷ୍ଟାବେଦର ତୂରା ଜୁଲାଇ ମୋତାବେକ ୪୦୮ ହିଜରୀ ସନେର ୫ ସଫର । ସ୍ଵଗୋତ୍ରୀୟ ଦୈମାନ ବିକ୍ରେତାଦେର ସଖିଲିତ ଚକ୍ରାଷ୍ଟର ବିରଳକ୍ଷେତ୍ର ସୁଲତାନ ମାହମୂଦକେ ଏକ ଭୟାନକ ରକ୍ଷକ୍ଷୟୀ ସଂଘାତେ ଲିଙ୍ଗ ହତେ ହଲୋ । ଏହି ସଂଘାତ ଛିଲ ସୁଲତାନ ମାହମୂଦର ବିରଳକ୍ଷେତ୍ର ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରଭାବ ସୃତିକାରୀ । ଯେ ସଂଘାତେର ନେପଥ୍ୟେ ଛିଲ ଇହନୀ, ଖୃଷ୍ଟାନ ଓ ମୁସଲିମ କୁଚକ୍ରିଦେର ଜୋଟବନ୍ଧ ସଢ୍ୟତ୍ର ।

୧୦୧୫ ସାଲେ ଅପୂର୍ବୀୟ କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ଶିକାର ହୟେ ବ୍ୟର୍ଥ ଓ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୟେ କାଶ୍ମୀର ଥେକେ ହାତେଗୋନା ମୁଣ୍ଡମେୟ ସହ୍ୟୋଦ୍ଧାକେ ନିଯେ ପରାଜିତେର ବେଶେ ସୁଲତାନେର ଗଯନୀ ଫିରତେ ହୟେଛି । ବିଶାଲ ଏହି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ସାମଲେ ଉଠାର ଜନ୍ୟ ଏବଂ ସେନାବାହିନୀକେ ପୁନଗଠନେର ଜନ୍ୟ ଟାନା କରେକଟି ବର୍ତ୍ତର ପ୍ରୋଜନ ଛିଲ ସୁଲତାନେର । କାରଣ, କାଶ୍ମୀରେର ଲୋହାକୋଟ ଦୁର୍ଗେର ବ୍ୟର୍ଥତା ପ୍ରାକ୍ତିକ ବୈରିତା ଏବଂ ଚକ୍ରାଷ୍ଟକାରୀ ହିନ୍ଦୁ ଗାଇଡେର ଚକ୍ରାଷ୍ଟେ ସୁଲତାନ ମାହମୂଦର ସାମରିକ ଶକ୍ତି ଏକେବାରେଇ ବିପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୟେ ପଡ଼େଛି । ତଥନ ସାଧାରଣ କୋନ ଯୁଦ୍ଧର ମୋକାବେଲା କରାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଓ ତାର ବାହିନୀର ଛିଲୋ ନା । ରାଜଧାନୀ ଗଯନୀର ନିରାପତ୍ତା ରକ୍ଷାଯ ନିଯୋଜିତ ସୈନିକ ଏବଂ ସୀମାଷ୍ଟେର ଅନ୍ଧାୟୀ ଟୋକିଗୁଲୋତେ ପ୍ରହରାରତ ଯୋଦ୍ଧାରା ଛାଡ଼ା ତାଁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କମାନ୍ତ ପ୍ରାୟ ଜନବଳଶୂନ୍ୟ ହୟେ ପଡ଼େଛି । ଏମତାବନ୍ଧୁଯ ବହିରାକ୍ରମ ପ୍ରତିହତ କରାର ସାମର୍ଥ ତାଁ ଥାକଲେଓ ପ୍ରତିଆକ୍ରମ କରାର ମତୋ ଜନବଳ ସେନାବାହିନୀତେ ଛିଲୋ ନା ।

ହିନ୍ଦୁଦେର ପକ୍ଷ ଥେକେ ଆକ୍ରମଣେର ତେମନ ଆଶଙ୍କା ତାଁର ଛିଲୋ ନା । କାରଣ, ତଥନୋ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହିନ୍ଦୁଦେର ମଧ୍ୟେ ଆତକ ବିରାଜ କରଛି । କାଶ୍ମୀରେର ଲୋହାକୋଟ ଦୁର୍ଗେ ପରାଜ୍ୟ ମେନେ ନିଯେ ମୁଣ୍ଡମେୟ ସୈନ୍ୟ ନିଯେ ଟିଲାୟୁଗିଯା କ୍ୟାମ୍ପେ କରେକ ଦିନ ଅବସ୍ଥାନ କରଲେଓ ରାଜା ଭୀମପାଲ ଓ ନନ୍ଦରାଯ ତାଁର ଉପର ଆକ୍ରମଣେର ସାହସ ପାଇଁନି । ଅର୍ଥଚ ଏ ସମୟ ବିପୁଲ ସଂଖ୍ୟାଧିକ୍ୟେ ପ୍ରବଳ ହିନ୍ଦୁବାହିନୀ ଆକ୍ରମଣ କରଲେ ହୟତୋ ତାଦେର ହାତେ ସୁଲତାନକେ ବନ୍ଦିତ୍ଵ ବରଣ, ନୟତୋ ଶାହାଦାତେର ପେଯାଲା ପାନ କରତେ ହେତେ । କିନ୍ତୁ ହିନ୍ଦୁ ରାଜା-ମହାରାଜାରା ତାଁକେ ଆହତ ବାଘେର ମତୋଇ ଭୟାନକ ଭେବେ ତାଁର କାହ ଥେକେ ନିଜେଦେରକେ ନିରାପଦ ଦୂରତ୍ତେ ବେଥେଛେ ।

এমতাবস্থায় চিহ্নিত শক্র হিন্দুদের পক্ষ থেকে কোন ঝুঁকির আশঙ্কা না থাকলেও বাংলায় মুসলিম ক্ষমতালিঙ্গ প্রতিবেশী ক্ষুদ্র শাসকদের পক্ষ থেকে ঝুঁকির আশঙ্কা প্রবল হতে থাকলো। অধিকাংশ প্রতিবেশী মুসলিম শাসক এককভাবে কিংবা ঘোষভাবে সুলতানের বিরুদ্ধে লড়াই করে এক বা একাধিকবার পরাজিত হয়েছিল। বাংলায় এসব ক্ষমতালিঙ্গদের প্রতিবারই সুলতান ক্ষমা করে দিয়ে শাস্তি-পূর্ণ সহাবস্থানের প্রত্যাশায় ছেড়ে দিয়েছেন। কিন্তু মসনদ ও ক্ষমতার পূজারী, নীতি-আদর্শবিচ্যুত এসব শাসক সুলতানের শক্তিশালী অবস্থানকে সব সময় তাদের বিপদ জ্ঞান করতো। তারা শয়নে-স্বপনে, নিরায়-জাগরণে সব সময়ই সুলতানের ধ্বংস কামনা করতো। সুলতানকে ইনবল ও নিশ্চিহ্ন করার জন্য তাঁর বিরুদ্ধে পরম্পর চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তারে লিখ থাকতো। কৃচক্রী প্রতিবেশীদের জন্য সুলতানের এই বিপর্যয় মহাসুযোগ সৃষ্টি করে দিল। এই সুযোগকে কাজে লাগাতে উঠে-পড়ে লেগে গেল তারা।

কাশীরের ব্যর্থ অভিযান শেষে সুলতান মাহমুদ যখন গফনীতে ফিরে এলেন, তখন তাঁর অবস্থা অনেকটাই ডোরকাটা ঘূড়ির মতো। বাতাসের দয়ার উপর ভর করে ঘূড়ি যেমন উড়তে থাকে, সে জানে না জমিনে পড়বে না কোন গাছের ডালে পড়ে ফেটে যাবে। সুলতান মাহমুদের সাথে কাশীর অভিযান শেষে যে সামান্যসংখ্যক সৈন্য ছিলো, তারা শোক-মিছিলের আবহে রাজধানীতে ফিরছিলো। গফনীর যেসব লোক সেনাবাহিনীর আগমনবার্তা পেয়ে রাস্তায় তাদের অভ্যর্থনা জানানোর জন্য জড়ো হয়েছিলো, সৈন্যদের বিপর্যস্ত অবস্থা দেখে তাদের মুখে আর কোন শব্দ উচ্চারিত হলো না। বিজয়োল্লাসের তাকবীর ধনি তাদের বুকের পাঁজরে যেন আটকে গিয়েছিল। যেসব নারী দরজা-জানালায় দাঁড়িয়ে সেনাবাহিনীর প্রত্যাবর্তন দেখছিলো, সৈন্যদের বিপর্যস্ত দৃশ্য দেখে তারা দাঁতে আঙুল কামড়ে ধরলো।

সুলতান মাহমুদ রাজধানীর অধিবাসীদের এমন শোকাবহ নীরবতা দেখে ঘোড়া থামিয়ে তাঁর প্রধান সেনাপতি আলতানতাশকে ডেকে পাঠালেন।

“আলতানতাশ! কী হয়েছে, রাজধানীর উৎসুক সব মানুষ নীরব হয়ে গেলো কেন? সৈন্যদের মৃত্যুতে ওদের স্নোগান হারিয়ে গেলো কেন? তাদের বলো, জাতির প্রয়োজনেই সৈন্য বেঁচে থাকে। এজন্য তোমাদের সবার মরে

গেলে চলবে না। তোমাদের স্নেগান বাঁচিয়ে রাখতে হবে। তোমরা স্নেগান দাও, “ইসলাম জিন্দাবাদ” “সালতানাতে গয়নী জিন্দাবাদ”। তোমরা আহত সৈন্যদের উজ্জীবিত করো। তোমাদের উৎসাহ ও প্রাণেচ্ছলতা তাদেরকে উঠে দাঁড়াতে সাহায্য করবে। যারা শাহাদাত বরণ করেছে, তারা তাদের জীবন জাতির সেবায় দান করে গেছে। তাদের কুরবানীর মর্যাদা আমাদের রক্ষা করতে হবে।”

সেনাপতি আলতানতাশ উচ্চ আওয়াজে সুলতানের কথাগুলোর পুনরাবৃত্তি করলেন। মাঝে মাঝে গয়নীর আকাশ-বাতাস ‘সালতানাতে গয়নী জিন্দাবাদ, ইসলাম জিন্দাবাদ, ইসলামের সৈনিকেরা জিন্দাবাদ, মৃত্তি ধর্মসকারী সুলতান জিন্দাবাদ, ইত্যাকার স্নেগানে মুখরিত হয়ে উঠলো।

সুলতান মাহমুদ আবারো সেনাপতির উদ্দেশে বললেন, “মহিলাদের বলো, ইসলাম তোমাদের কাছে তোমাদের ভাই-বেটাদের কুরবানী দাবী করছে। আপনজন হারানোর শোকে মাতম করলে চলবে না। তোমাদেরকে ইসলামের প্রয়োজনে স্বামী-সন্তান, ভাই-পুত্রদেরকেও কুরবানী দিতে হবে।”

সেনাপতি আলতানতাশ সুলতানের একথাগুলোও উচ্চ-আওয়াজে পুনরাবৃত্তি করলেন। একথা শুনে যেসব নারী তাদের সংগ্রহীত ফুল লুকিয়ে ফেলেছিলো, আহত সৈনিকদের উপর তা ছিটিয়ে দিতে শুরু করলো। সেই সাথে নারীদের কষ্ট থেকে ভেসে এলো, “কোন অসুবিধা নেই, ইসলামের প্রয়োজনে আমাদের ভাই-পুত্র-স্বামীদের তোমরা নিয়ে যাও।”

সুলতান মাহমুদ রাজধানীবাসীর মনোবল বাড়িয়ে দিয়ে শোককে শক্তিতে ঝর্পান্তরিত করতে পেরেছিলেন বটে; কিন্তু তাঁর নিজের মনের গভীরে ব্যর্থতা ও হতাশার যে কঁটা বিন্দু হয়েছিলো তা তিনি কিছুতেই সরাতে পারছিলেন না। কাশ্মীর যুদ্ধের সকল ব্যর্থতা তিনি নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন। তিনি বাহিনীর বেঁচে থাকা সেনাপতি এবং গয়নীতে অবস্থানকারী সেনাক্ষমাভারদের ডেকে বললেন, “জয়-পরাজয় মূলত আল্লাহর হাতে। কিন্তু লোহাকোট অভিযানের যাবতীয় ব্যর্থতার দায় আমার। আমি এর সকল দায়-দায়িত্ব নিজ কাঁধে তুলে নিছি। কারণ, আমি সেখানকার মৌসুমী প্রভাবকে মোটেও বিবেচনায় নিইনি। স্থানীয় সংবাদ প্রেরকদের কাছ থেকে ওখানকার অবস্থা যাচাই করিনি। সর্বोপরি হিন্দু প্রতারকদের ধোকায় আমি প্রতারিত হয়েছি।

জাতির এই কলঙ্ক, এই ক্ষয়ক্ষতিকে বিজয়ে ঝুপান্তরিত করে দেখানোর দায়-দায়িত্ব এখন আমি কাঁধে তুলে নিছি।

রাজা হিসেবে রাজ্য শাসন করা আমার কাজ নয়। আমার কাজ ইসলামের বাণী বিশ্বময় ছড়িয়ে দেয়। তোমরা আমার একটি কথা খুব মনে রেখো। তা হচ্ছে, এখন যদি কেউ তোমাদেরকে পরাজয়ের জন্য তিরঙ্গার করে, তবে সেই তিরঙ্গারকে হাসিমুখে বরণ করে নিয়ে তাকে আশ্বস্ত করো, তোমাদের সমর্থন-সহযোগিতা থাকলে গয়নী বাহিনী অটোরেই পরাজয়ের গ্লানি মুছে দেবে।

ব্যর্থতার পুরো দায়ভার নিজের কাঁধে তুলে নেয়ার পরও স্বত্ত্ব পাছিলেন না সুলতান মাহমুদ। ক্রমেই তার মন অত্যন্ত অস্ত্রিভায় পেরেশান হয়ে উঠছিলো। মনের অস্বত্ত্ব অস্ত্রিভাব ও পেরেশানী থেকে মুক্তি পেতে অবশ্যে তিনি তার শায়খ আবুল হাসান খারকানীর সাক্ষাতে রওনা হলেন।

গয়নী থেকে একদিন ও অর্ধেক রাতের দূরত্বে অবস্থান করতেন খারকানী। অল্প কজন নিরাপত্তারক্ষী নিয়ে অস্বাভাবিক দ্রুতবেগে সীয় মুর্শিদের কাছে পৌছলেন সুলতান মাহমুদ।

বিমর্শ, ভগ্নহৃদয় ও মানসিকভাবে বিপর্যস্ত সুলতানকে দেখে খারকানী বললেন, “অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে, সুলতান পরাজিত হয়ে এসেছেন। কিন্তু তাই বলে তার চোখে পানি কেন?”

“অপমান আর ব্যর্থতার গ্লানি মুর্শিদ” বললেন সুলতান। আমি মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছি। আমি হাজার হাজার সহযোদ্ধাকে কাশ্মীরের বরফের নিচে রেখে এসেছি, এদের রুহ আমাকে রাতে ঘুমোতে দেয় না। ওরা যেন আমাকে কানে কানে বলে যায়, “একি করলেন সুলতান! কোন অপরাধে আমাদের কাশ্মীরে এনে বরফ চাপা দিলেন! আমরা তো মর্দে-ময়দান ছিলাম, আমরা তো আপনার কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে বেঙ্গমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতাম।”

“বিভ্রান্তি। মানসিক অপরাধবোধ থেকে এই বিভ্রান্তির শিকার হয়েছেন আপনি। যে যোদ্ধারা সহযোদ্ধাদের রক্তের প্রতিশোধ নিতে অঙ্গীকারাবদ্ধ শাহাদত বরণকারীদের আত্মা তাদেরকে বিভ্রান্ত করে না, কোন ধরনের পেরেশানী সৃষ্টি করে না। দেখবেন, এই শহীদদের আত্মা জীবন্ত সৈনিকে ঝুপান্তরিত হবে। আল্লাহর নামে এখন থেকে আপনারা যেখানেই লড়াই

করবেন, এসব ক্রহ আপনাদের শক্তি জোগাবে। আপনার মতো একজন দৃঢ়চেতা লড়াকু রণনায়কের পথে এ ধরনের বিভ্রান্তি প্রতিবন্ধক হতে পারে না। এসব নিতান্তই আবেগাশ্রয়ী বিষয় সুলতান। হতোদ্যম হবেন না। হিন্দুস্তানের অসংখ্য মজলুম আপনার পথ চেয়ে আছে, শত শত নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়া মসজিদ আপনার আগমন অপেক্ষায় প্রহর শুণছে।”

“আমি মারাওক ধোকায় পড়ে গিয়েছিলাম। প্রথমত মৌসুম আমাকে ধোকা দেয়, দ্বিতীয়ত প্রশিক্ষিত কুচক্রী হিন্দুরা মুসলমান সেজে আমাকে গাইড হিসিবে ধোকায় ফেলে।”

“হিন্দুদের এসব ধোকাবাজী কোন নতুন বিষয় নয় সুলতান!” বললেন খারকানী। ইসলামের গোড়া থেকেই কুফরীশক্তি মুসলমানদের ধোকা দিচ্ছে। ভবিষ্যতেও এই ধোকাবাজী অব্যাহত থাকবে। আপনার কাজ হলো ভবিষ্যতে যাতে এমন ধোকার শিকার হতে না হয়, এ ব্যাপারে সতর্ক থাকা। ভারতের আগেই হয়তো আপনাকে নিজ ভূমিতে ব্রহ্মগোত্রীয়দের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হবে।

ইহুদী ও খৃষ্টশক্তি সম্প্রিলিভভাবে মুসলমানদের মৈত্রী ও ঐক্যের শিকড় কেটে দিচ্ছে। যে খলীফা ছিলেন মুসলমানদের ঐক্য ও সংহতির প্রতীক, সেই খলীফাই এখন ক্ষমতা ও মসনদের লিঙ্গায় অঙ্ক। মুসলিম উদ্বাহর কেন্দ্রীয় শক্তি ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে। আপনি যদি ইসলামের স্বার্থে যুদ্ধ-জিহাদে আগ্রহী হয়ে থাকেন। তাহলে সুলতানীর উষ্ণতা মন থেকে ঝোড়ে ফেলুন। চেনা-অচেনা শক্রদের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখুন। ব্রজাতি ও ব্রহ্মদেশের জনগোষ্ঠীকে ভীতসন্ত্বন্ত না করে সামরিক শক্তি দিয়ে শক্রদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে দিন। তাজ ও তরবারী সহাবস্থান করতে পারে না। ভালোবাসা হয় তরবারীর সাথে থাকবে, নয়তো তখতের সাথে। যে তরবারী তাজ ও তক্তের হেফায়তের জন্য ব্যবহৃত হয়, সেই তরবারী ঘৃণ্য। মাত্র একটি পরাজয়ে হতোদ্যম হয়ে যাবেন না সুলতান! উঠে সে-ই, যে হোঁচট খেয়ে পড়ে যায়। এই হোঁচট খাওয়ার পর পুনরায় গা ঝাড়া দিয়ে আবার সেই শক্তি নিয়ে দাঁড়ান, যে অবস্থায় আপনি পড়ে গিয়েছিলেন। নিজের ভুলক্রটি নিজের কাঁধে নিন, এ ব্যাপারে জাতিকে ভুল তথ্য পরিবেশ করবেন না।”

“আপনি বলেছেন, ইহুদী ও খৃষ্টানরা আমাদের শিকড় কাটছে? এটা বলে আপনি কী বোঝাতে চাচ্ছেন?” খারকানীর দিকে প্রশ্ন ছুঁড়ে দিলেন সুলতান।

“ইসলামের সবচেয়ে বড় শক্র ইহুদী জাতি।” বললেন শায়খ আবুল হাসান খারকানী। ইহুদীরা মসজিদে আকসাকে তাদের ইবাদতখানা মনে করে। ইহুদীরা চেষ্টা করছে, ফিলিস্তিনকে তাদের নিজস্ব রাষ্ট্রে পরিণত করে কাবাকে দখল করে নিতে এবং মুসলমানদের একক ইবাদতগাহকে ধ্বংস করে দিতে। ইহুদীরা মুখোমুখী সংঘর্ষের জাতি নয়। এরা কখনো মুখোমুখী সংঘর্ষে জড়াতে চায় না। ওদের হাতে আছে অটেল সম্পদ। এই সম্পদ ব্যবহার করে তারা মুসলমানদের শিকড় কাটছে। হিন্দুদের মতো ইহুদীরা মুসলিমদের ক্ষতিসাধনে কন্যা-জ্যায়াদের ব্যবহার করে। মুসলমানদের বিরুদ্ধে খৃষ্টানদেরও সহায়তা দিচ্ছে ইহুদীরা। যে কারামতী জনগোষ্ঠীর ব্রহ্মপ আপনি উন্মোচন করে সাধারণ মানুষকে ওদের ধোকাবাজী পরিহার করে সঠিক ইসলামে দীক্ষা নেয়ার সুযোগ করে দিয়েছেন, কুফরী মিশ্রিত কথিত মুসলিম নামের এই গোষ্ঠীর জন্মাতা ইহুদী পঞ্জিতেরা। আপনার বিরুদ্ধে যেসব মুসলিম শাসক অব্যাহত চক্রান্তে লিঙ্গ, পর্দার অন্তরালে তাদের সাথে গাঁটছড়া বেঁধেছে ইহুদীরা। আপনাকে গৃহযুদ্ধে জড়িয়ে রাখার নেপথ্যে ইহুদীরা জড়িত...।

অটিরেই হয়তো নিজ ভূমিতেই স্বগোত্রীয় প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে আপনাকে লড়াই করতে হবে। প্রতিবেশী প্রতিপক্ষগুলোকে পক্ষে নিয়ে আসার চেষ্টা করুন।

মহান আল্লাহর উপর ভরসা রাখুন এবং সব সময় সতর্ক থাকুন। নিজ দেশের জনগণকে আপনার সাথে রাখুন। সেনাবাহিনীকে পুনর্গঠনের চেষ্টা ত্বরিত করুন এবং খাওয়ারিজমের প্রতি বিশেষ মনোযোগ নিবন্ধ রাখুন। আমি শুনতে পেরেছি, খাওয়ারিজমে ইতোমধ্যে ইহুদীদের কারসাজী জোরে-শোরে চলছে।”

সেই সময় খাওয়ারিজম ছিল একটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্র। জুরজানিয়া ছিল খাওয়ারিজমের রাজধানী। বুখারা ছিল খাওয়ারিজমের একটি প্রদেশ। খাওয়ারিজম রাষ্ট্রে মামুনী খান্দানের রাজত্ব ছিল। অনেক পূর্ব থেকেই খাওয়ারিজম ছিল মুসলিম অধ্যুষিত রাষ্ট্র। ১৯৫ খ্রিস্টাব্দে আবু আলী মামুন বিন মুহাম্মদ ইবন আলী খাওয়ারিজমে হামলা করে বাদশা আবু আব্দুল্লাহকে বন্দী করেন এবং গোটা খাওয়ারিজম রাষ্ট্রই দখল করেন নেন। দু'বছর নিজ কজায় রাখার পর ১৯৭ সালে আবু আলী মামুন নিহত হন। কিন্তু হত্যাকারী আবু

আলী মামুনের খান্দানের কাছ থেকে শাসন ক্ষমতা ছিলিয়ে নিতে পারেনি। পিতার নিহত হওয়ার পর আবু আলী মামুনের পুত্র আবুল হাসান আলী মামুন মসনদে আসীন হন। বারো বছর রাজত্ব করার পর ১০০৯ সালে অপরিণত বয়সে তিনি ইন্ডেকাল করেন। মৃত্যুর তিনি বছর আগে সুলতান মাহমুদের সাথে মেঠী সম্পর্ক আরো শক্তিশালী করতে তিনি সুলতানের ছোট বোনকে বিবাহ করেন। স্বামীর মৃত্যুর পর সুলতানের বোন খাওয়ারিজম ত্যাগ করে সুলতানের কাছে চলে এসেছিলেন।

আবুল হাসান আলী মামুনের ইন্ডেকালের পর তার ছোট ভাই আবুল আকবাস মামুন ক্ষমতাসীন হন। তখন তার বয়স ছিল মাত্র পঁচিশ বছর। আবুল আকবাসের ছিল দুই স্ত্রী। খাওয়ারিজম রাষ্ট্রের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন আবুল হারেস বিন মুহাম্মদ। আবুল আকবাসের পিতা আবু আলী মামুনের সময় থেকেই তিনি মন্ত্রী পদে আসীন ছিলেন। এই বয়স্ক মন্ত্রীর গভীর হৃদয়তা ছিলো মামুনী খান্দানের সাথে। আবুল হারেস ছিলেন সত্যিকারের একজন মুসলমান। মুসলমানদের প্রতি তার হৃদয়ে ছিলো অকৃত্রিম ভালোবাসা। বয়সে প্রবীণ ও ঝঙ্গু এই লোকটির কোলে-পিঠেই বড় হয়েছিলেন মামুনের দুই ছেলে। তাই তিনি পিতার মতোই তাদেরকে কল্যাণজনক পরামর্শ দিতেন এবং যে কোন অকল্যাণ ও অপ্রীতিকর কর্মকাণ্ড থেকে বিরত থাকতে বলতেন। খাওয়ারিজম রাষ্ট্রের বুখারা প্রদেশের গভর্নর আলাফতোগীন ছিলেন মধ্যবয়সী ও অভিজ্ঞতায় ঝন্দ চতুর একজন শাসক। এই লোকটিকে আলহারেস পছন্দ করতেন না। দৃশ্যত আলাফতোগীন খাওয়ারিজম রাষ্ট্রের এবং মামুনী খান্দানের আনুগত্য করলেও তার সামগ্রিক কর্মকাণ্ড ছিলো সন্দেহজনক।

আবুল আকবাস ক্ষমতাসীন হওয়ার পর একদিন নির্ভরযোগ্য বয়োজ্যেষ্ঠ প্রবীণ মন্ত্রী আলহারেসকে একান্তে ডেকে পাঠালেন। আবুল আকবাস একান্তে আল হারেস এর সাথে রাষ্ট্রের নিরাপত্তা, প্রজাদের অবস্থা তথা প্রশাসনিক বিষয় নিয়ে মতবিনিময় করছিলেন। মতবিনিময়ের এক পর্যায়ে আলহারেসের উদ্দেশ্যে আবুল আকবাস বললেন-

“আমার পিতা নিহত হয়েছেন, বড় ভাইও মৃত্যুবরণ করেছেন। আমি খুবই একাকীভু অনুভব করছি। এই নিঃসঙ্গ অবস্থায় মনের মধ্যে একটি গোপন কথা কঁটার মতো কষ্ট দিছে। আপনি কি এই রহস্যের কিনারা করতে পারবেন?”

“যে সব রহস্যের জাল এই বুঢ়োর চোখ ভেদ করতে পারবে, এমনটি আর কারো পক্ষে সম্ভব হবে না। মামুনী খান্দানের অতীত-বর্তমান কোনকিছুই আমার কাছে গোপন নয়। তোমার মনের মধ্যে যদি কোন গোপন কাঁটা বিদ্ধ হয়ে থাকে, তা আমাকে দেখাও, হয়তো আমি সেটিকে অপসারণ করতে পারবো।” বললেন বয়োজ্যেষ্ঠ মন্ত্রী আল হারেস।

“আপনি তো জানেন, ভাইয়ের মৃত্যুর পর বুখারার গভর্নর আলাফতোগীন এখানে এসেছিলেন। তিনি তখন আমাকে একান্তে বলেছিলেন, আপনার বড় ভাইয়ের মৃত্যুতে গভীর সমবেদনা জানাচ্ছি এবং আপনাকে খাওয়ারিজমের নতুন বাদশা হিসেবে মোবারকবাদ দিচ্ছি। সেই সাথে আজ আপনার কাছে একটি গোপন রহস্য উন্মোচন করে দেয়া কর্তব্য মনে করছি। আপনি জানেন, আপনার পিতাকে হত্যা করা হয়েছিলো। হত্যাকারীদেরও আপনি জানেন। কিন্তু আপনি হয়তো জানেন না, আপনার ভাইও কিন্তু হত্যার শিকার হয়েছেন। তাঁর স্বাভাবিক মৃত্যু হয়নি।

এ খবর শুনে আমি খুব একটা পেরেশান হইনি। কারণ, আমাদের শক্রদের আমি জানি। কিন্তু আলাফতোগীন আমাকে বললেন, “ভাইকে এমন এক ধরনের বিষ খাওয়ানো হয়েছিল, যার প্রতিক্রিয়া ছিলো পেটের পীড়ার মতো। ধীরে ধীরে তার শরীরে এই বিষক্রিয়া চলতে থাকে; কিন্তু ডাক্তারের পক্ষে পেটের পীড়া ছাড়া ওই বিষক্রিয়াকে সনাত্ত করা সম্ভব ছিলো না।”

“এমনটি অসম্ভব কিছু নয়। শক্ররা অনেক কিছুই তো করতে পারে।” বললেন উজীর আবুল হারেস। আপনাদের শক্ররা আপনাদের সামরিক শক্তিমন্ত্রার ভয়ে ভীত। তাই তারা এ ধরনের চক্রান্তের আশ্রয় নিতেই পারে।”

কিন্তু ব্যাপারটি শুধু এতেই শেষ নয় সম্মানিত উজীর। বললেন নতুন শাসক আবুল আব্রাস। আলাফতোগীন আমাকে সংশয়হীনভাবে বলেছেন, ভাইকে বিষ প্রয়োগ করেছিলেন সুলতান মাহমুদ। আর সেই বিষ খাইয়েছে সুলতানের বোন এবং আমার ভাবী স্বয়ং। এই বিষ প্রয়োগের কারণ হিসেবে বলেছেন, সুলতান মাহমুদ ভাইকে তার অধীনতা মেনে নিতে বলেছিলেন; কিন্তু ভাই সে প্রস্তাৱ প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। এখন আমি কি আলাফতোগীনের কথা বিশ্বাস করবো?”

“না, তুমি বিশ্বাস করবে না।” বললেন বয়স্ক আলহারেস। আলাফতোগীনের কথা বলেই আমি এটিকে ঠিক মনে করি না। এ ছাড়াও আমি এটিকে সত্য মনে করি না এজন্য যে, সুলতান মাহমুদ রঙ্গে-মাংসে একজন মর্দে মুজাহিদ। তাঁকে বিষ প্রয়োগ করার কথা বিশ্বাস করা যায়; কিন্তু তিনি কাউকে বিষ প্রয়োগ করাবেন এটা বিশ্বাস করা যায় না। ব্যক্তিগতভাবে আমি তাঁকে চিনি। তিনি যদি রাজত্ব এবং রাজ্যের সীমানা বৃদ্ধিতে আগ্রহী হতেন, তাহলে বেঁচে থাকার সর্বয় চেষ্টা থাকতো তাঁর সব কাজে। কিন্তু তাঁর কাজকর্ম দেখলে তুমিও বলবে, দীর্ঘদিন বেঁচে থেকে রাজত্ব করা তাঁর শখ নয়। তুমি তো জানো, কতোবার তিনি গয়নী থেকে কতো দূরে হিন্দুস্তানে গিয়ে যুদ্ধ করেছেন। এখনও তিনি গয়নী থেকে শত শত মাইল দূরে হিন্দুস্তানের সবচেয়ে দুর্গম এলাকায় যুদ্ধ করতে গেছেন। তিনি ইসলামের সৈনিক, ইসলামের প্রচার-প্রসারে লিঙ্গ একজন ধর্মপ্রচারক। তিনি একজন সফল মৃত্তি খৎসকারী।”

“নতুন বাদশা আবুল আববাস আর বয়োজ্যেষ্ঠ উজির যখন পরম্পর এসব কথাবার্তা বলছিলেন, সুলতান মাহমুদ তখন দক্ষিণ কাশ্মীরের লোহাকোট দুর্গ অবরোধ করে বৈরী মওসুম ও দুর্ভেদ্য দুর্গপ্রাচীরের ফাঁদে আটকে গেছেন। তৈরি তুষারপাতে চাপা পড়ে অকালে প্রাণ হারাচ্ছে তার সহযোদ্ধারা।”

তুমি তো দেখতে পাচ্ছো, কতোবার বেছায় মৃত্যুর্ফাঁদে পা দিয়েছেন সুলতান। বললেন হারেস। হিন্দুস্তানের রাজা-মহারাজাদের সামরিকশক্তি কোন মায়লী ব্যাপার নয়। হিন্দুস্তানের রাজশক্তির বিরুদ্ধে বর্তমান মুসলিম জগতের মধ্যে শুধু সুলতান মাহমুদই টকর দিতে পারেন এবং তিনি তা দিচ্ছেনও। এ ধরনের লড়াকু যোদ্ধারা কখনো কাউকে বিষপ্রয়োগে হত্যা করেন না।”

“আমি নিহত হতে চাই না।” বললেন আবুল আববাস। যে আমাকে জীবিত রাখতে চাইবে এবং নিজেও জীবিত থাকতে চায়, আমি তাকে মিত্র বানাতে চাই। আপনি আমাকে পরামর্শ দিন, আমি কি তুর্কিস্তানের খানদেরকে মিত্র বানাবো, না সুলতান মাহমুদকে মিত্র বানাবোঁ?

সুলতান মাহমুদকেই আমার সবচেয়ে বেশী শক্তিশালী মনে হয়। সুলতান মাহমুদ সম্পর্কে আপনার বিশ্বাস যা-ই থাকুক না কেন, যেভাবে তিনি শক্তির

জোরে শক্রদের পদানত করে তাদের এলাকা গয়নী সালতানাতের অন্তর্ভুক্ত করেছে, একদিন হয়তো আমাকেও বলে বসতে পারে আমার আনুগত্য স্বীকার করে নাও। তাছাড়া আমার চতুর্পার্ষের শক্রদের আক্রমণ থেকে নিরাপদ থাকার জন্য আমার দরকার একজন শক্তিশালী মিত্র।”

সেই শক্তি ও মিত্রের দাবী পূরণ করার ক্ষমতা একমাত্র সুলতান মাহমুদেরই রয়েছে।” বললেন উজীর আল হারেস।

“আমার মনের কথাগুলো আজ আপনার কাছে বলতে চাই সম্মানিত উজীর।” বললেন আবুল আকবাস। শুধু কথা আর অঙ্গীকারের দ্বারা বক্তৃত্বের সম্পর্ক ততোটা দীর্ঘস্থায়ী হয় না। আমার মনে মিত্রতা দীর্ঘস্থায়ী ও শক্তিশালী করার একটা চমৎকার কৌশল এসেছে। আমি সুলতান মাহমুদের বিধবা বোনকে বিয়ে করার প্রস্তাব দেবো। সে আমার বড় ভাইয়ের বিধবা। তাকে তখনই আমার খুব ভালো লাগতো। বয়সে সে হয়তো আমার চেয়ে এক অর্ধ বছরের বড় হবে; কিন্তু সুলতান মাহমুদ কি আমার সাথে তাঁর বোনের বিয়ের ব্যাপারে রাজী হবেন?”

“শ্বিত হেসে আবুল হারেস বললেন, “এ ব্যাপারে আমি কিছুই বলতে পারবো না। তবে আপনি কি এই ঝুঁকির ব্যাপারটি ভাবেন না? আপনার ভাইকে যদি সে বিষ দিতে পারে, তবে আপনাকেও সে বিষপ্রয়োগে হত্যা করতে পারে।”

“না, নাহিদা আমাকে বিষ দিতে পারে না।” আকাশের দিকে দৃষ্টি প্রসারিত করে স্বগতোক্তির মতো করে বললেন আবুল আকবাস। না, লাবণী আমাকে বিষ প্রয়োগে হত্যা করতে পারবে না। কিছুটা উচ্চেঁহরেই উচ্চারণ করলেন আকবাস। আবুল হারেসের দিকে তাকিয়ে বললেন, লাবণী জানতো আমি তাকে কতোটা ভালোবাসি। আমি ছিলাম তার স্বামীর ছোট ভাই, দেবর।

সে আমাকে খুবই ভালোবাসতো। আদর করে আমাকে শাহজাদা ডাকতো।... সত্য কথা বলতে কি, ভাইয়ের মৃত্যুর পর আমার মনে হয়েছে, আমি ভাইয়ের শূন্যতাকে সহ্য করতে পেরেছি; কিন্তু লাবণীর চলে যাওয়াকে সহ্য করতে পারছি না।”

“আপনি কি নাহিদার ভালোবাসার টানে তাকে বিয়ে করতে চান, নাকি সুলতানের সাথে বন্ধুত্ব ও মিত্রতা মজবুত করার জন্য?”

“উভয়টিই আমার লক্ষ্য।” উজিরের জিজ্ঞাসার জবাবে বললেন আবুল আকবাস। তবে নাহিদার প্রতি আমার ভালোবাস হয়তো প্রাধান্য পাবে। আসল কথা হলো, নাহিদাও আমাকে ভালবাসতো। কিন্তু তার ও আমার এই ভালোবাসার মধ্যে কোন কর্দমতা ছিলো না। আমাদের মধ্যে সম্পর্ক ছিলো অনেকটা ভাই-বোনের মতো অথবা গুণবত্তী ভাবী আর মেহশীল দেবরের মধ্যে যেমনটি হয়ে থাকে।

অবশ্য এখন অবস্থা অনেকটাই বদলে গেছে। তখন নাহিদার সাথে আমার এতোটাই গভীর হৃদয়তা ছিলো যে, আমার দ্বিতীয়া স্ত্রী আলনূরী এ ব্যাপারে আমার প্রতি খুবই অসম্মত ছিল। আল নূরীর পিতা আবু ইসহাককে আপনি জানেন। তিনি আমাদের সেনাবাহিনীর একজন শীর্ষ কর্মান্বাদ এবং সেনাপতি। তিনি আমাকে বলেছিলেন, আল নূরী নাকি তার কাছে আমার ব্যাপারে নালিশ করেছে। আমি শুন্তর সাহেবকে বলেছি, আলনূরী আমাকে ও আমার ভাইয়ের বিধবা স্ত্রীকে নিয়ে ডিভিহীন অভিযোগ উঠাপন করেছে। তবিষ্যতে যেন সে আর এমন দৃঃসাহস না করে। আমার এই কথা বলার পর তার চেহারার যে অবস্থা আমি দেখলাম, তা মোটেও ভালো মনে হলো না।”

“সুলতান মাহমুদকে হিন্দুস্তান থেকে ফিরে আসতে দাও। তোমার এই প্রস্তাবে যেমন তোমার প্রেম-ভালোবাসা রয়েছে, তদ্দুপ এতে কৌশলী রাজনীতিও রয়েছে। এ ব্যাপারে তুমি আরো চিন্তা করো, আমিও ব্যাপারটি নিয়ে আরো ভাবি। বললেন উজির।

আবুল আকবাস আর তার প্রধান উজির আবুল হারেস যখন সুলতান মাহমুদের সাথে মৈত্রী ও আঙ্গীয়তার সম্পর্ক স্থাপন নিয়ে মতবিনিময় করছিলেন, সুলতান মাহমুদ তখন কাশীরের বৈরী পরিবেশে ব্যর্থতার গ্রানিটে বিপর্যস্ত হচ্ছিলেন। তার অজ্ঞেয় বাহিনীর সৈন্যরা খিলম নদীর শীতল পানিতে তেসে যাচ্ছিল আর তুষারপাতে বরফের নিচে তলিয়ে যাচ্ছিল।

এ ঘটনার প্রায় ছয় মাস পর উজির আবুল হারেস একদিন বাদশা আবুল আকবাসকে একান্তে বললেন, গায়নী থেকে বিশ্বয়কর খবর এসেছে! সুলতান মাহমুদ কাশীর থেকে এমন শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়ে এসেছেন যে, তার সাথে এক-দশমাংশ সৈন্যও ফিরে আসেনি। যারা ফিরে এসেছে এদের অধিকাংশই মারাঞ্জকভাবে আহত। এবারের ফিরে আসায় মাহমুদের সাথে

হিন্দুস্তানের সোনা দানা বোঝাই জঙ্গী হাতি যেমন ছিলো না, কোন হিন্দু বন্দীও ছিলো না। তাঁর শোটা সামরিক শক্তিই সেখানে ধ্রংস হয়ে গেছে।”

“এরপরও আমি তাঁর বোনকে বিয়ে করতে চাই।” বললেন আবুল আকবাস। আপনি অভিজ্ঞ ব্যক্তি। আপনার মতো অভিজ্ঞতা আমার নেই। কিন্তু আপনি মনে হয় আমার কথা সমর্থন করবেন। আমি যদি দুঃসময়ে সুলতান মাহমুদের দিকে বন্ধুত্বের হাত বাড়াই, সে নিশ্চয়ই আমার প্রতি কৃতজ্ঞ ও হিতাকাঙ্ক্ষী থাকবে। কখনো যদি আমাদের উপর কোন বিপদ এসে পড়ে, তখন সে নিশ্চয়ই আমাদের সহযোগিতায় এগিয়ে আসবে।

আপনি বলুন তার কাছে আমার প্রস্তাব পাঠানোর উপযুক্ত সময় কোনটি হতে পারে? আমাকে কি নিজে যেতে হবে?”

“এখনই উপযুক্ত সময়।” বললেন, আবুল হারেস। তার এই শোচনীয় পরাজয়ে সহমর্মিতা জানানো দরকার। তা ছাড়া কূটনৈতিক রীতি রক্ষায় এটাও বলা যেতে পারে যে, আমরা তার সহযোগিতা করতে প্রস্তুত। এ ক্ষেত্রে তোমার যাওয়া জরুরী নয়। আমিই যাবো এবং বিয়ের প্রস্তাবও তাকে দিয়ে আসবো।

কয়েক দিন পর খাওয়ারিজমের প্রবীণ উজীর আবুল হারেস দু'জন দৃত এবং কয়েকজন নিরাপত্তারক্ষীসহ কয়েকটি উপটোকন বোঝাই উট নিয়ে গয়নী পৌছলেন। সুলতান মাহমুদের কাছে খবর গেলো, খাওয়ারিজমের বাদশা আবুল আকবাসের উজির সুলতানের সাথে দেখা করতে এসেছেন। খবর শুনে তাৎক্ষণিকভাবেই উজিরকে সুলতানের কাছে নিয়ে আসার নির্দেশ দেয়া হলো।

খাওয়ারিজমের বাদশা শাহ আবুল আকবাস মাঝুন সুলতানে আলী মাকাম এর খেদমতে কিছু উপটোকন পাঠিয়েছেন। সেই সাথে কাশীর অভিযানে আপনার অপূরণীয় ক্ষয়ক্ষতি ও পরাজয়ের জন্যে আন্তরিক সমবেদনা প্রকাশ করেছেন। শাহে খাওয়ারিজম আরো বলেছেন, আল্লাহ তাআলা সুলতানকে এতোগুলো বিস্ময়কর বিজয়ে পর একটি মাত্র ব্যর্থতা দিয়েছেন, এটিও ধারাবাহিক সাফল্যেরই অংশ। আল্লাহ তাআলা গয়নী সুলতানকে যে মনোবল ও সাহস দিয়েছেন, আশা করি পরাজয় তাকে কাবু করতে পারবে না। শাহ বলেছেন, আমি প্রয়োজনে যে কোন ধরনের সাহায্য ও সহযোগিতা দিতে প্রস্তুত। কেননা, বিপদেই তো ভাই ভাইয়ের কাজে লাগে।”

আমাদের এখানকার রীতি ও শিষ্টাচার এটাকে সমর্থন করে না যে, একজন মুসলমান বাদশাহৰ সম্মানিত উজির সুলতানের সামনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথা বলবে। আপনি আমার পাশের আসনে বসুন।” আবুল আকবাসকে সম্মানের সাথে কথাগুলো বললেন সুলতান।

সুলতানের আবদারে প্রবীণ কৃটনীতিক ও মন্ত্রী আবুল হারেস আসনে বসলেন। অতঃপর সুলতান মাহমুদ বললেন, “আমি খাওয়ারিজম বাদশাকে মোবারকবাদ জানাচ্ছি। আমি যখন আমার প্রতিবেশীদের কাছ থেকে আমার এই দৃঃসময়ের সুযোগে স্বার্থসিদ্ধির আশক্তা করছি, ঠিক সেই মুহূর্তে তিনি বঙ্গুত্ত্ব ও মৈত্রীর হাত বাড়িয়েছেন। তাকে আমার সালাম জানিয়ে বলবেন, নিঃসন্দেহে নির্ভরযোগ্য বঙ্গুর আমার খুব প্রয়োজন। কিন্তু আল্লাহ ছাড়া আর কারো কাছে আমি সাহায্য-সহযোগিতা চাই না।”

খাওয়ারিজমের অভ্যন্তরীণ অবস্থার ব্যাপারে আমারও প্রবল আগ্রহ আছে। আবুল আকবাস একেবারেই তরুণ। সাগর উপকূলে বৃথারায় কী ঘটছে, এসব ব্যাপার কি সে বোঝে? সে কি জানে গভর্নর আলফতোগীনের দৃষ্টিভঙ্গী কী?

“সে না জানলেও এসব ব্যাপার আমার অজানা নয় সুলতান।” বললেন, উজীর আবুল হারেস। গভর্নর আলফতোগীনের কর্মকাণ্ড আমার কাছেও সন্দেহজনক মনে হয়। কিন্তু সেনাবাহিনীর প্রতি আমাদের আস্থা আছে।

আমি যতোটুকু জানি, তাতে বলতে পারি, সেনাদের উপর আপনাদের বেশী আস্থা রাখা মোটেও ঠিক নয়। বললেন সুলতান। সেনাবাহিনীতে সাধারণ সৈনিকদের নীতি নির্ধারণে কোন ভূমিকা থাকে না। মূলত সেনাপতি ও ডেপুটি সেনাপতিরাই সেনাবাহিনীর মূলশক্তি। তারাই নীতি নির্ধারণ করে, সাধারণ সৈনিকরা হয় তাদের ঘুটি। এদেরকে ব্যবহার করা হয় মাত্র। অনেক সময় সেনা কর্মকর্তাদের মধ্যে শাসক হওয়ার নেশা চাপে আর তাদের উচ্চাকাঙ্ক্ষার বলির পাঠায় পরিণত হয় সাধারণ সৈনিকরা। দুর্নামটাও এসে পড়ে সাধারণ সৈনিকদের উপর। জনসাধারণের যতো ক্ষেত্র-নিন্দা সব পড়ে সাধারণ সৈনিকদের উপর। শাস্তি ও পেতে হয় তাদেরই। কর্মকর্তারা থাকে পর্দার আড়ালে, জনতার ধরা-ছেঁয়ার বাইরে। আপনাকে সেনাকর্মকর্তাদের প্রতি কড়া নজর রাখতে হবে।”

নানা বিষয় নিয়ে দীর্ঘ সময় উজীর ও সুলতান মতবিনিময় করছিলেন। উজীর আবুল হারেস ছিলেন অভিজ্ঞ ও দূরদর্শী লোক। তিনি কথায় কথায় বিয়ের প্রস্তাব দেয়ার সুযোগ সৃষ্টি করে ফেললেন।

“সম্মানিত সুলতান! আবুল আবাস আপনাকে সহযোগিতার প্রস্তাব করেছেন ঠিকই; কিন্তু সত্যিকার অর্থে তিনিই আপনার সাহায্য প্রত্যাশী। অবশ্য এখনই তার কোন সাহায্যের প্রয়োজনই নেই। তিনি আপনার সাথে দৃঢ় মৈত্রী গড়ে তুলতে আগ্রহী। তিনি এমন একজন শাসকের সাথে মৈত্রী গড়ে তুলতে চান, যে তাকে কখনো ধোকা দেবে না। আর এমন ব্যক্তি আপনি ছাড়া আর কেউ নেই। স্থায়ী ও অটুট মৈত্রী বন্ধনের জন্য তিনি আপনার বোন, তার মৃত ভাইয়ের বিধবা স্ত্রীকে বিয়ে করতে চান। সুলতান যেন তার এই আবেদন গ্রহণ করেন একান্তভাবে তিনি তা কামনা করেন।”

“বিয়ের ফয়সালা আমার বোন নিজে করবেন। বললেন সুলতান। প্রশাসনিক স্বার্থ রক্ষার জন্য আমি বোনকে ব্যবহার করতে মোটেও রাজি নই। আমি তাকে পরামর্শ দিতে পারি, খাওয়ারিজম ও গয়নীর সম্পর্কের গুরুত্ব বোঝাতে পারি; কিন্তু আমার সিদ্ধান্ত তার উপর চাপিয়ে দিতে পারি না। কারণ, বিয়ের বিষয়টি একান্তই তার মনের ব্যাপার। আপনাকে এর জবাব পেতে হলে কিছুদিন সময় দিতে হবে।”

“খাওয়ারিজমের মসনদে আসীন হওয়ার আগ পর্যন্ত আবুল আবাসকে একজন সুন্দর মনের মানুষ হিসেবেই আমি জানতাম।” সুলতানকে বললো তার বিধবা বোন। “তখন সে ছিল নিতান্তই বালক। এখন সে যুবক। সেই সাথে মসনদে আসীন বাদশা। এ পর্যায়ে তাকে পর্যবেক্ষণ বা তার সম্পর্কে কিছু বলা মুশকিল। নিশ্চয়ই এখন তার মধ্যে অনেক পরিবর্তন এসেছে।”

“তার এই পয়গামের জবাব তুমি দেবে। আমি তার প্রতিনিধিকে জানিয়ে দিয়েছি, আমি বোনের উপর এ ব্যাপারে কোন সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দেবো না।”

“সে কথা হয়তো ঠিকই আছে। কিন্তু এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে হলে আপনার পরামর্শ আমার দরকার আছে। আপনি যদি মনে করেন, খাওয়ারিজমের বাদশাকে আমি বিয়ে করলে গয়নীর কোন উপকার হবে, তাহলে তাকে আমি বিয়ে করতে মোটেও কুঠাবোধ করবো না। কোন বাদশাকে বিয়ে করে তার প্রাসাদের রওনক বাড়ানোর আগ্রহ আমার নেই।

অদ্বপ কোন শাহের বউ হয়ে সম্রাজ্ঞী সাজার অভিলাষও আমার হয় না। যে ভাইয়ের প্রতিটি দিবানিশি কাটে অশ্বপৃষ্ঠে সওয়ার হয়ে জিহাদের অবস্থায়, তার বোন কোন শাহের রাজপ্রাসাদে রাজরাণী হয়ে বিলাস-ব্যসনে বিভোর হতে পারে না। আমাকে আপনি পরিষ্কার করে বলুন, খাওয়ারিজম শাহের তৃতীয় স্তৰী হিসেবে তার সাথে আমার বিয়ে হলে এখানকার মুসলিম ও গয়নী সালতানাতের কোন কল্যাণ হবে কি? যদি তা হয়, তবে যে কোন দিন আমি আবুল আবাসকে বিয়ে করতে সম্মত আছি।”

“খাওয়ারিজমের সৈন্যদেরকে জিহাদে ব্যবহার করার সুযোগ আছে।”  
বললেন সুলতান মাহমুদ। ছোট ছোট মুসলিম রাজ্যের শাসক এবং মুসলিম  
রাজা-বাদশাহরা পরম্পর বিরোধে লিপ্ত। কোন শক্তিশালী প্রতিপক্ষের আক্রমণ  
আশঙ্কা ঘনীভূত হলেই কেবল মুসলিম বাদশাহরা কয়েকজন মিলে মৈত্রী গড়ে  
তোলে। ইসলামের স্বার্থে এরা কখনো কোন জোট বা মৈত্রী গড়তে আগ্রহী  
নয়।

মুসলিম শাসকরা পরম্পর বিরোধে লিপ্ত। এই সংঘর্ষ আর বিরোধকে অতি  
সংগোপনে ইঙ্গন জোগাছে ইহুদী-নাসারা গোষ্ঠী। আমি পরম্পর বিচ্ছিন্ন  
মুসলিম শাসকদেরকে কাফেরদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ করতে চাই। খাওয়ারিজম  
একটি শক্তিশালী রাষ্ট্র। কিন্তু আমি খবর পাচ্ছি, খাওয়ারিজমের ডেতরে  
ডেতরে চক্রান্ত শুরু হয়ে গেছে। মনে হয় আবুল আবাস এ ব্যাপারে মোটেও  
অবগত নয়। আমার আশঙ্কা হচ্ছে, বুখারার গভর্নর আলাফতোগান আবুল  
আবাসকে আমার বিরুদ্ধে দাঁড় করাতে পারে। এমনও হতে পারে, আমি যখন  
আমার সৈন্যঘাটতি পূরণে ব্যস্ত, এই সুযোগে খাওয়ারিজমের সৈন্যরা গয়নী  
আক্রমণ করে বসবে। আমি যে কোন অবস্থায় ওদের প্রতিরোধ করতে পারবো;  
কিন্তু আমার সৈন্য সংখ্যা নিতান্তই কম। তা ছাড়া এটা তো হবে স্বেফ  
গৃহ্যন্বয়। দুটি মুসলিম রাষ্ট্রের যুদ্ধে ইসলামের শক্তি ক্ষয় হবে আর এই স্ববিধা  
নেবে অমুসলিমরা। সবচেয়ে বড় কথা হলো, এখন গয়নীর সাথে যে কোন  
মুসলিম রাষ্ট্রের যুদ্ধে সবচেয়ে উপকৃত হবে হিন্দুস্তানের পৌর্ণলিঙ্ক শাসকরা।”

“আপনি যদি মনে করেন, আবুল আবাসের স্তৰী হয়ে আমি তাকে  
আলাফতোগানের কুমন্ত্রণা ও চক্রান্ত থেকে রক্ষা করতে পারবো, তাহলে এই  
বিয়েতে আমার কোন আপত্তি নেই।” বললো নাহিদ।

“এটি তুমিই ভালো বলতে পারবে। আচ্ছা, তুমি যখন তার ভাইয়ের স্তী ছিলে, তখন তার উপর তোমার কেমন প্রভাব ছিলো? তখন কি তার সাথে তোমার কোন জানাশোনা ছিলো?” বললেন সুলতান।

“তখন ছিলো আমার একনিষ্ঠ ভক্ত।” বললো নাহিদ।

ওকে আমি খুবই আদর করতাম। সে আমার মেহ-মমতার জন্যে উদয়ীব ছিলো। কারণ, অনেক আগেই তার মাতৃবিয়োগ ঘটে। এরপর তার পিতা নিহত হন। ছেষ আবুল আববাসকে মাত্তু ও পিতৃত্বের শূন্যতা অনুভব করতে দিইনি আমি। সে বেশির ভাগ সময় আমার কাছেই থাকতো। শাহজাদা ছিলো সে। কিন্তু শাহজাদা হলেও মানবিক মায়ামমতার ঘাটতি শান-শওকত দিয়ে পূরণ হয় না। সে আমাকে মা ও বড় বোনের মতোই শুন্দি করতো। প্রথমে সে বিয়ে করলো। কিন্তু দুবার মনের প্রশান্তির জন্য প্রাণ খুলে দুঃখ-সুখের কথা বলতে সে আমার কাছেই ছুটে আসতো। কিন্তু তার ভাইয়ের ইন্তেকালের চার মাস পর যখন আমি তাদের প্রাসাদ ছেড়ে আসার জন্য প্রস্তুতি নিছিলাম, ভাইজান, আপনি কল্পনাও করতে পারবেন না, পরিণত একটি যুবক হয়েও সে তখন শিশুর মতো চিংকার করে কাঁদছিলো। তার ভাইয়ের মৃত্যুত্তেও সে এতেটা কান্নাকাটি করেনি।”

“তাহলে তুমি তাকে বুঝিয়ে-সুবিয়ে নিজের কজায় নিয়ে আসতে পারবে। তার হৃদয়ে শুধু গয়নী সালতানাতের নয়— ইসলামের মমতা তৈরী করতে হবে। আমার সালতানাতকে ঝুঁকিমুক্ত করার চেয়ে ইসলামের বিরুদ্ধে গজিয়ে ওঠা হিংস্র শয়তানগুলোকে কাবু করাই আমার কাছে বেশী গুরুত্বপূর্ণ।”

“তার মন-দেমাগ যদি বাদশাহীর ত্বর্তে বসে বিগড়ে না গিয়ে থাকে, তাহলে আশা করি, আমি তাকে পথে আনতে পারবো। বললো নাহিদ। আপনার সদিচ্ছা পূরণে এবং ইসলামের মর্যাদা রক্ষার জন্য আমি আমার আবেগ-অনুভূতি কুরবানী দিতে মোটেও কুঠাবোধ করবো না। আমি খাওয়ারিজমের সেনাবাহিনীর দৃষ্টি কাফেরদের প্রতি ঘুরিয়ে দেবো। আমি আপনার সাথে রণাঙ্গনে জিহাদে যেতে পারবো না বটে; কিন্তু আপনার জিহাদে শক্তিবৃদ্ধিতে জীবন তো দিতে পারবো।”

“নাহিদের কথাবার্তা শুনে সেদিনই প্রচুর উপহার-উপটোকন দিয়ে সুলতান মাহমুদ আবুল আকবাস মামুনের কাছে পয়গাম পাঠালেন, পূর্ব প্রস্তাব ঠিক থাকলে সে সুলতানের ছোট বোন নাহিদের সাথে বিয়ে বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারে।

এক মাসের মধ্যে আবুল আকবাস ও নাহিদের বিয়ের ব্যবস্থা হয়ে গেল। কিন্তু এ বিয়ে তো বিয়ে নয়, এই বিয়ে সুলতানের জন্য ভয়াবহ এক টর্নেভোতে ঝর্পাত্তিরিত হলো, যে টর্নেভো গোটা মুসলিম বিশ্বকেই নাড়িয়ে দিল। শুধু ডাঙায় নয়— সুলতান মাহমুদকে এর মূল্য দিতে সমুদ্রেও যুদ্ধ করতে হলো। উভয় পক্ষের হাজারো নৌকা জলযুদ্ধে অংশগ্রহণ করলো। ভয়াবহ এই যুদ্ধে আগে চালানো হলো অতিসূক্ষ্ম চক্রান্তের খেলা। যে কৃটনৈতিক চক্রান্তের ঘুটি উভয়পক্ষই চেলে ছিল বিয়ের আসরে।

বিয়ে হয়ে গেল। অনেকটা সাদামাটাভাবেই সুলতান তার আদরের ছোট বোন নাহিদকে খাওয়ারিজমের তরঙ্গ বাদশা আবুল আকবাসের বন্ধনে তুলে দিলেন। আবুল আকবাস খুশী মনে নতুন বউ নিয়ে বাড়ীতে ফিরে বিশাল আকারে ওলীমার আয়োজন করলেন।

খাওয়ারিজ শাহের এই তৃতীয় বিয়েতে রাজধানী জুরজানিয়াকে এমন আলোকসজ্জায় সাজানো হলো যে, রাতের রাজধানীও দিনের মতোই আলো ঝলমলে ঝর্প পরিগ্রহ করলো। প্রতিবেশী সব মুসলিম শাসকদের দাওয়াত করা হলো। হাজার হাজার মেহমানের পদ্ভাবে স্পন্দিত রাজধানী।

সুলতান মাহমুদের পক্ষ থেকে সুলতানের পরিবর্তে তাঁর সেনাবাহিনীর দুই প্রবীণ সেনাপতি আবু আব্দুল্লাহ আলতাই এবং সেনাপতি আলতানতাশ প্রতিনিধিত্ব করছিলেন। তাদের সাথে ছিলো আরো কয়েকশত সৈনিক। এদের ছাড়াও ছিলেন গোয়েন্দা প্রধান ও নাশকতা প্রতিরোধ ইউনিটের চিফ কমান্ডার।

বিশাল এই আয়োজনে খাওয়ারিজ রাষ্ট্রের অন্যতম প্রদেশ বুখারার গর্ভন্ত আলাফতোগীন হাজির হলেন বিশেষ জাঁকজমক নিয়ে। আবুল আকবাসের সেনাবাহিনীর শুরুত্বপূর্ণ অফিসার ও সেনাপতিরাও এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত। বুখারা অঞ্চলের সেনাপতি খ্রমরতাশ আর সেনাবাহিনীর অন্যতম প্রভাবশালী সেনাপতি আবুল আকবাসের দ্বিতীয় শ্বশুর সেনাপতি আবু ইসহাক গর্বিত ভাবভঙ্গ নিয়ে অনুষ্ঠানে সমাপ্তী। ঘটনাক্রমে খাওয়ারিজমের এই তিনি

মহারথি পাশাপাশি আসনে উপধিষ্ঠ এবং প্রত্যেকের চেহারাতেই আনন্দ-উজ্জ্বলসের বদলে চাপা উজ্জেনা ও ক্ষোভ পরিস্কৃত। দৃশ্যত তারা সবাই সুলতান মাহমুদের দুই প্রতিনিধির সাথে হাসিমুখেই হাত মেলালেন; কিন্তু কুশল বিনিময়ের পরই তারা সুলতানের প্রতিনিধিদের থেকে খানিকটা দূরে গিয়ে আসন নিলেন। তাদের পাশেই গ্রাম্য বেশে আগে থেকেই বসা ছিলেন সুলতান মাহমুদের বিশেষ ইউনিটের দুই দক্ষ পরিচালক। এদেরকে বিশেষ দিক-নির্দেশনা ও দায়িত্ব দিয়ে বিশেষ উদ্দেশ্যে বিয়ে অনুষ্ঠানে পাঠিয়েছিলেন সুলতান মাহমুদ।

“তোমরা মনে করো না, আমার বোনকে বিয়ে করে আবুল আকবাস আমার শুভাকাঙ্ক্ষী হয়ে গেছে।” বললেন সুলতান মাহমুদ। হতে পারে আবুল আকবাস আমার সাথে সত্যিকার অর্থেই সুসম্পর্ক স্থাপন করতে আগ্রহী; কিন্তু তোমরাই তো খবর দিয়েছো, ওখানকার প্রশাসনও সেনাবাহিনীর অভ্যন্তরে অগুৎপাতের জন্য লাভা তৈরী হচ্ছে। চক্রান্ত ও প্রাসাদ-ষড়যন্ত্রের কানাঘুষা চলছে। সেখানে গিয়ে তোমরা নিজেদেরকে আলতানতাশ ও আলতাই এর সফরসঙ্গী হিসেবে পরিচয় দেবে না, বরং তোমরা থাকবে সাধারণ বেশে। পরিচয় দেবে সমরকন্দের ব্যবসায়ী হিসেবে। সেখানে বহু লোকের সমাগম হবে, খেলতামাশা, আতশবাজী হবে। এসব খেলতামাশার প্রতি তোমরা মনোযোগী হবে না। তোমাদের দৃষ্টি থাকবে পর্দার অন্তরালে অতি সংগোপনে যে চক্রান্তের খেলা শুরু হয়েছে, সেদিকে। তিনজন লোকের পেছনে তোমরা ছায়ার মতো লেগে থাকবে। তাদের কথা সরাসরি শুনতে না পারলেও তাদের চালচলন, ভাবভঙ্গ দেখে বুঝতে চেষ্টা করবে তারা আসলে কী করতে চাচ্ছে, তাদের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা কী?

তিনজনের মধ্যে একজন হলো, বুখারার গভর্নর আলাফতোগীন, দ্বিতীয়জন আবুল আকবাসের দ্বিতীয় শুণুর সেনাপতি আবু ইসহাক, তৃতীয়জন বুখারা অঞ্চলের সেনাপতি খমরতাশ।

এই দুজনকে এর চেয়ে বেশী সতর্ক ও জ্ঞান দেয়ার কোনই প্রয়োজন ছিলো না। কারণ এরা উভয়েই দুটি শুরুত্বপূর্ণ গোয়েন্দা শাখার প্রধান। তারাই খাওয়ারিজমের অভ্যন্তরীণ ষড়যন্ত্র ও চক্রান্তের কথা তাদের গোয়েন্দা নেটওয়ার্কের মাধ্যমে জানতে পেরেছিলেন। এই দুই ব্যক্তি যখন জুরজানিয়ার

বিয়ে অনুষ্ঠানে হাজির হলেন, তাদের দেখে কারো বোঝার উপায় ছিলো না, এরা সুলতান মাহমুদের গোয়েন্দা শাখার প্রধান এবং মাটির নিচের ঘটনাবলীও এরা দিব্যচোখে দেখতে পারে। তারা একনজর তাকালেই যে কারো ভেতরের মনোভাবও বুঝতে পারে। তারা উভয়েই ব্যবসায়ীদের মতো চিলেচালা পোশাকে সজ্জিত ছিলো।

উভয়েই আলাফতোগীন, খ্যরতাশ ও আবু ইসহাকের পিছনের সারিতে গিয়ে বসলেন। রাতের প্রজ্ঞালিত মশালের আলোয় ঘোড়দৌড় শুরু হবে হবে অবস্থা। বিশাল মাঠের চতুর্দিকে শামিয়ানা টাঙানো হয়েছে। এক পাশে বিশেষভাবে সাজানো হয়েছে বাদশা, নতুন রাণী এবং রাষ্ট্রীয় অতিথিদের আসন। তরবারী প্রতিযোগিতা, মল্লযুদ্ধ ছাড়া নানা ধরনের সামরিক কলা-কৌশল প্রদর্শনীর আয়োজন সম্পন্ন।

হঠাৎ তীব্র ও উচ্চ রণসঙ্গীত বাজিয়ে জানানো হলো নব বরবেশী বাদশা আবুল আকবাস ও নতুন রাণীবেশী নাহিদার আগমনীবার্তা। আবুল আকবাস নববধূ নাহিদাকে নিয়ে মন্ত্রের দিকে এগিয়ে আসছেন। নাহিদা দীর্ঘাঙ্গি, সুন্দরী যুবতী। তার প্রতিটি পদক্ষেপে রাজকীয় গাঢ়ীর্যতা ও অবয়বে দীপ্তিময় আভা। যুবক বাদশা আবুল আকবাসও অপূর্বসাজে সজ্জিত।

দৃঢ় পদক্ষেপে নাহিদাকে নিয়ে তিনি রাজকীয় আসনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন। সেনাবাহিনীর বাদক দল আকাশ-বাতাস মুখরিত করে আগুন ঝরানো বাজনা দিচ্ছে। চতুর্দিকে লাখো জনতার কঢ়ে হর্ষধনি। মহামান্য বাদশা আবুল আকবাস দীর্ঘজীবী হোক, সুখময় হোক তাদের নতুন দাস্পত্য, দীর্ঘতর হোক মায়ুনী শাসন। আবুল আকবাস ও নাহিদার পিছনে পিছনে আবুল আকবাসের প্রথম ও দ্বিতীয় স্ত্রীও রাণীর পোশাকে সজ্জিত হয়ে আসছিলো। তবে তাদের চেহারায় তেমন কোন জোলুস ছিলো না, ছিলো না, কোন আনন্দ-ফুতি আবেগ ও উচ্ছ্বসের চিহ্ন।

সুলতান মাহমুদ তাঁর বোনের বিনিময়ে শুধু খাওয়ারিজম শাহকে নয়—গোটা খাওয়ারিজম সালতানাতকেই খরিদ করতে চাচ্ছে। বিদ্রুপাত্মক কঢ়ে বললো আবুল আকবাসের দ্বিতীয় শ্বশুর এবং সেনাবাহিনীর অন্যতম সেনাপতি আবু ইসহাক।

ଆବୁ ଇସହାକେର ଏ କଥା ପିଛନେର ଦିକେ ତାକାଳେନ ବୁଖାରାର ଗର୍ଭନର ଆଲାଫତୋଗୀନ । ତାଦେର ପେଛନେଇ ସୁଲତାନ ମାହମୂଦେର ଦୁଇ ଶୀର୍ଷ ଗୋଯେନ୍ଦ୍ର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ବ୍ୟବସାୟୀ ବେଶେ ବସେ ପରମ୍ପର କଥା ବଲଛେ ।

“ଆପନାରା କୋଥେକେ ଏସେହେନ୍?” ଶିତ ହେସେ ପିଛନେର ଦୁଜନକେ ଜିଜ୍ଞେସ କରଲେନ ଗର୍ଭନର ଆଲାଫତୋଗୀନ ।

ଉଭୟେଇ ଶିତହାସ୍ୟ ଆଲାଫତୋଗୀନେର ପ୍ରତ୍ୟେକରେ ମାଥା ଦୋଲାଳେନ । ତାରା ଉଭୟେଇ ମାଥା ନାଡ଼ିଯେ ବୁଝିଯେ ଦିଲେନ ଆଲାଫତୋଗୀନେର ଭାଷା ତାରା ବୁଝାତେ ପାରଛେନ ନା । ଅର୍ଥ ତାଦେର ମାତୃଭାଷାଇ ଛିଲୋ ଫାରସୀ । ଆଲାଫତୋଗୀନ ଫାରସୀ ଭାଷାତେଇ ତାଦେର ପରିଚୟ ଜାନତେ ଚେଯେଛିଲେନ । ଆଲାଫତୋଗୀନ, ଖମରତାଶ ଓ ଆବୁ ଇସହାକ ପ୍ରତ୍ୟେକେଇ ନାନାଭାବେ ତାଦେର ପରିଚୟ ଜାନାର ଚେଷ୍ଟା କରିଛିଲେନ କିନ୍ତୁ ଦୁଇ ଗୋଯେନ୍ଦ୍ର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ନିପୁଣତାର ସାଥେଇ ତାଦେର ବୋଝାତେ ସକ୍ଷମ ହଲେନ, ତାଦେର କୋନ କଥାଇ ତାରା ବୁଝାତେ ପାରଛେନ ନା । ଏକ ପର୍ଯ୍ୟାଯେ ତାଦେର ଏକଜନ ବଲଲେନ, ‘ଫିରକତାଗ’ । ଫିରକତାଗ ଜୁରଜାନିଯା ଥେକେ ପୂର୍ବଦିକେ ଅନେକ ଦୂରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏକଟି ପାହାଡ଼ୀ ଏଲାକାର ନାମ । ଓଖାନକାର ଭାଷା ଛିଲୋ ଭିନ୍ନ ।

“ଏରା ଆମାଦେର ଭାଷା ବୋଝେ ନା” । ଦୁସ୍କ୍ରୀକେ ବଲଲେନ ବୁଖାରାର ଗର୍ଭନର ଆଲାଫତୋଗୀନ । ଆମି ଓଦେର ପରିଚୟ ସମ୍ପର୍କେ ନିଶ୍ଚିତ ହତେ ଚାଙ୍ଗିଲାମ । ଠିକ ଆଛେ... । ଆବୁ ଇସହାକ! ଆପନି କି ଯେନୋ ବଲତେ ଚାଙ୍ଗିଲେନ୍?”

“ବଲିଲାମ, ଏ ବିଯେ ଶୁଧୁ ଆବୁଲ ଆକାଶ ଆର ନାହିଦାର ମଧ୍ୟ ହୟନି । ଏହି ସମ୍ପର୍କେର ମାଧ୍ୟମେ ଗୋଟା ଖାଓୟାରିଜମକେଇ ବୋନେର ବିନିମୟେ ଖରିଦ କରତେ ଚାହେ ସୁଲତାନ ମାହମୂଦ । ଏକାନ ଥେକେ ସୁଲତାନ ମାହମୂଦ ଆର ତାର ବୋନ ଆବୁଲ ଆକାଶକେ ଆଞ୍ଚଲେର ଫାଁକେ ଘୋରାବେ, ଆଞ୍ଚଲେର ଇଶରାୟ ନାଚାବେ । ସେ ବୁଝାତେଇ ପାରବେ ନା ‘ଖାଓୟାରିଜମେର ଉପର ଗୟନୀର କର୍ତ୍ତୃ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୟ ଗେଛେ । ଆପନି କି ଏମନ ନ୍ୟାକ୍ରାରଜନକ ଅଧୀନତା ମେନେ ନେବେନ ଆଲାଫତୋଗୀନ?’

“ଆରେ, ସେଇ ସମୟଟା ଆସତେ ଦାଓ ନା” । ବଲଲେନ ଆଲାଫତୋଗୀନ । ଖାଓୟାରିଜମେର ମାଟିତେ କୋନ ଗୟନୀ ସୈନ୍ୟର ପା ପଡ଼ିଲେ ଓଦେର ଚିକିତ୍ସା କେଉଁ ଝୁଝେ ପାବେ ନା ।”

“ଆଗେ ଥେକେଇ ଏଜନ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୱତି ନେଯା ଦରକାର ।” ବଲଲେନ ସେନାପତି ଖମରତାଶ ।

“সেনাবাহিনী আপনার নিয়ন্ত্রণে। সৈন্যদেরকে আপনি নিজের আয়ত্তে  
রাখুন।”

“দেখো, এসব কথা কি এখানে আলোচনা করা ঠিক হবে?” উত্থিগুকষ্টে  
বললেন সেনাপতি আবু ইসহাক।

“চিন্তার কারণ নেই। আমাদের সবচেয়ে কাছে বসা লোক দু'জন আমাদের  
ভাষা বোঝে না।” বললেন সেনাপতি খমরতাশ।

“ওরা আমাদের ভাষা না বুঝুক, ডানে-বামে কথা চলে যেতে পারে।  
সতর্কতার বিকল্প নেই।” বললেন আলাফতোগীন।

আচ্ছা আবু ইসহাক! আবুল আকাসের উপর আপনার মেয়ের কি কোন  
প্রভাব আছে?”

“আছে বৈকি। কিন্তু এখন কতটুকু থাকবে সেটাই চিন্তার বিষয়।  
মাহমুদের বোন নাহিন খুবই চালাক। মনে হয় এখন আর আমার মেয়ে তার  
প্রভাব অঙ্কুশ রাখতে পারবে না।

“তাদের পিছনে বসে সুলতান মাহমুদের দুই গোয়েন্দা কর্মকর্তা তাদের  
কথাবার্তা শুনছিলো। আলাফতোগীন ও তার সাথীরা যখনই তাদের দিকে  
তাকাতো, তখনই তারা উভয়কেই ময়দানের খেলা দেখায় মগ্ন দেখতে  
পেতো। তৈরি প্রতিযোগিতার কারণে লাখো দর্শক জনতার হৈ চৈ আর উল্লাস  
ধ্বনিতে গোটা এলাকা সরগরম। এরই মধ্যে সুলতান মাহমুদের দুই গোয়েন্দা  
গভর্নর আলাফতোগীন ও তার সাথীদের কর্থাবার্তা শোনার চেষ্টা করছিলো।  
কিন্তু তারা বেশীক্ষণ আর সেই বিষয়ে আলাপ করলো না। প্রসঙ্গ বদল করে  
অতি সাধারণ মজলিসী কথাবার্তা বলতে শুরু করলো। কিন্তু প্রাথমিক  
কথাবার্তা শুনেই সুলতানের গোয়েন্দা কর্মকর্তারা বুঝতে পেরেছিলো এরা এই  
বিয়েতে মোটেই খুশী হতে পারেনি। তয়কর কোন চক্রান্তের আয়োজনে তারা  
ব্যস্ত। অচিরেই তারা বাদশা আবুল আকাসের বিরুদ্ধে কোন পদক্ষেপ নেবে।

মাঝরাত পর্যন্ত চললো আবুল আকাসের বিবাহোন্তর জাকজমকপূর্ণ  
সংবর্ধনা অনুষ্ঠান। মাঝরাতের পর অনুষ্ঠান শেষে সবাই যার যার মতো ঘরের  
পথ ধরলো। দূরের অতিথিরা তাদের জন্য নির্দিষ্ট অতিথিশালায় ঘুমোতে  
গেলো।

সবাই যার যার মতো শয়নকক্ষে চলে গেলেও বুখারার গভর্নর আলাফতোগীন, প্রবীণ সেনাপতি আবু ইসহাক ও সেনাপতি খমরতাশ একই কক্ষে সমবেত হলেন। মধ্যরাতের পর হঠাৎ ভেতর থেকে তাদের কক্ষের দরজা খুলে একজন বোরকা পরিহিত মহিলা প্রবেশ করলো। ঘরে প্রবেশ করেই মহিলা তার চেহারার নেকাব খুলে ফেললো। এই মহিলা আর কেউ নয়, আবুল আকবাসের দ্বিতীয়া স্ত্রী সেনাপতি আবু ইসহাকের কন্যা আলজৌরী।

গতরাতের সব কথাই আমি জানতে পেরেছি। একটি আসনে বসতে বসতে বললো আলজৌরী। নাহিদার বাসর রাতের জন্য যে সেবিকাকে নির্দিষ্ট করা হয়েছিলো, তাকে আমি আগেই হাত করে নিয়েছিলাম। সে আমার কথামতো বাসর রাতে আবুল আকবাস ও নাহিদার কথাবার্তা শোনার জন্য দরজার সাথে কান লাগিয়ে রেখেছিলো। সে রাতে তার দায়িত্ব ছিলো আবুল আকবাসের দরজার পাশে থাকা। ফলে তাকে দরজায় কান লাগিয়ে বসে থাকতে দেখেও কারো কিছু বলার ছিলো না।

সেবিকা বুদ্ধি করে কক্ষের একটি জানালার একটি পাণ্ডা ঈষৎ খুলে রেখেছিলো। কিছুক্ষণ যেতে না যেতেই আবুল আকবাস নিজেই সেবিকাকে ডেকে ভেতরে নিয়ে নেয়। সেবিকার উপস্থিতিতেই নাহিদা ও আবুল আকবাসের কথাবার্তা চলতে থাকে। সেবিকার মুখে যা শুনলাম, তা আমি আপনাদের বলে দিছি। নাহিদা আবুল আকবাসের ঘরে শুধু বউ হয়েই আসেনি— সে একটি কঠিন উদ্দেশ্য এবং ফাঁদ হয়ে এসেছে।

আবুল আকবাসও তাকে শুধু বউ মনে করে না। আবুল আকবাসের কথাবার্তা থেকে অনুমিত হচ্ছে, সে নাহিদার প্রেমে অঙ্গ এবং নাহিদাকেই সে মনে করে মনের সন্ত্বাঞ্জী।

সে যুগের রাজকীয় সংস্কৃতি এবং রাজ-রাজাদের একান্ত সেবিকাদের জন্য তাদের বাসর ঘরের একান্ত কথাবার্তা শোনার বিষয়টি বর্তমানের আলোকে উন্নত মনে হলেও সে যুগে তা মোটেও অস্বাভাবিক ব্যাপার ছিলো না। সেবিকা আলজৌরীর টোপ গিলে আলজৌরীকে আবুল আকবাস ও নাহিদার যেসব অন্তরঙ্গ কথাবার্তা পাচার করেছিলো, তা ছিলো অনেকটা এরকম-

আবুল আকবাসের উদ্দেশে নাহিদা বললো, “আবুল আকবাস! একজন ত্বরীয় স্ত্রীর প্রয়োজনে যদি ভূমি আমাকে বিয়ে করে থাকো, তাহলে খোলাখুলি

আমাকে সেই কথা বলে ফেলো । তোমার প্রেমকে হৃদয়ের মণিকোঠায় ধারণ করে আমি অনুত্তাপের কান্না কেঁদে নেবো ।”

“না না নাহিদা! তোমাকে আমার প্রয়োজন ছিলো । নয়তো স্ত্রী হিসেবে নারীর অভাব আমার ছিলো না । কেননা, তুমি আমার ভাইয়ের স্ত্রী থাকা অবস্থাতেও তো আমাকে প্রাণাধিক মেহ করতে ।”

“তখন ঠিকই তোমাকে ভালোবাসতাম । তবে সেই শ্রে-ভালোবাসা ছিলো ভিন্ন । মূর্তি সংহারী এক মুজাহিদের বোনের মধ্যে চারিত্রিক ঝুলন থাকতে পারে না । স্বামীকে সে ধোকা দিতে পারে না । তখন তোমার চলাফেরা ও কথাবার্তা সবকিছুই আমার ভালো লাগতো । সেটি ছিলো একজন শুণমুঞ্জ ভাবীর দেবরের প্রতি পবিত্র মমত্ববোধ, যার মধ্যে কোন পক্ষিলতা ছিলো না ।”

“তাহলে আমি কি এটাই বুঝবো যে, আমাকে তোমার খুব ভালো লাগতো বলেই তুমি আমাকে বিয়ে করেছো?” নাহিদার উদ্দেশ্যে বললো আবুল আবাস ।

“না, আমি শুধু এজন্য তোমার সাথে বিয়েতে রাজী হইনি । বললো নাহিদা । তোমার যেমন স্ত্রীর অভাব ছিলো না, বিয়ের প্রশ্নে আমারও পুরুষের ঘাটতি ছিলো না । গ্যন্নী সালাতানাতে শত শত বীর বাহাদুর সুন্দী যুবক আমাকে পাওয়ার জন্য উদ্যোগ ছিলো । তোমাকে বিয়ে করার মধ্যে আমার ভালোবাসা ছাড়া আরো উদ্দেশ্য আছে । আমি শুধু তোমার জন্য ভালোবাসাই নিয়ে আসিনি, এনেছি একটি পবিত্র পয়গাম । এ পয়গাম কোন জাগতিক পয়গাম নয় কিংবা আমার ভাইয়ের পক্ষ থেকে কোন রাজকীয় বার্তাও নয় । এ পয়গাম আল্লাহর দেয়া পয়গাম ।

আবুল আবাস! তুমি কি এ ব্যাপারে আমার সাথে একমত হবে না যে, ভবিষ্যৎ প্রজন্ম গ্যন্নীকে মূর্তি সংহারীদের শহর বলে জানবে? একথা কি তুমি অঙ্গীকার করতে পারবে যে, সালতানাতে গ্যন্নী প্রতিবেশী মুসলিম রাজ্যবর্গের জন্য কাঁটা হয়ে বিরাজ করছে? তারা সবাই মিলে ইসলামের এই আলোকিত অধ্যায়কে কালিমাযুক্ত করতে উঠে পড়ে লেগেছে?”

“তোমার এই কথাকে অঙ্গীকার করার উপায় নেই ।” বললো আবুল আবাস । তুমি যা বলছো তার সবই সত্য । কিন্তু এসব বিষয় নিয়ে কথাবার্তা বলার জন্য তো আরো অনেক সময় পাওয়া যাবে । আজকের শুভ রাতে তুমি

এসব জটিল বিষয়ের অবতারণা করছো কেন? তুমি কি আমার প্রেম-ভালোবাসা, আবেগ-উজ্জ্বল সবকিছুকে আজ রাতেই রণাঙ্গনে পাঠিয়ে দিতে চাও?"

"হ্যাঁ, তুমি যদি তাই মনে করো, তবে আজ রাতেই আমি তোমাকে রণাঙ্গনে পাঠিয়ে দিতে চাই। কারণ, বিয়ের প্রথম রজনীটি যে কোন মানুষের জন্য শুধুই পবিত্র ও শুরূত্বপূর্ণ। সে কথা তুমি জানো আবুল আব্বাস! বাসর রাত তোমার জন্য নতুন কিছু ন। আমার জন্যও এ রাতটি জীবনের প্রথম নয়। আমি তোমার প্রেম-ভালোবাসা, আবেগ-উজ্জ্বল কিছুতেই নষ্ট হতে দেবো না। আমাকে পেয়ে যদি তোমার জীবনের স্বপ্নগুলো আরো রঙিন হয়ে থাকে, তাহলে সেই রঙিন স্বপ্নগুলোকে আমি স্বয়ত্ত্বে আরো বর্ণিল করে তুলবো। আমার মনের গহীনে পুষ্যে রাখা জটিল কথাগুলো আমাকে বলতে দাও আর তোমার স্বপ্নগুলো আমাকে বুঝবার অবকাশ দাও। এখনও তো রাত অনেক রয়ে গেছে। জীবনে আরো কতো রাত আসবে। আমি তোমার প্রতিটি রাতকেই মোহনীয় করে তুলবো। কিন্তু একটু দৈর্ঘ্য ধরে আমার কটি কথা শুনে নাও।

আজকের যে রাতে আমরা সুখসাগরে সাঁতার দিতে যাচ্ছি, এ রাতটি গয়নীর হাজারো কন্যা-জয়া-জননীর জন্য বিষাদে ভরা। গয়নীর হাজারো শুবতী আজকের এ রাতেও তাদের প্রাণপ্রিয় স্বামীদের বিরহ যাতনা নিয়ে নির্ঘূম নিষ্পেষণে অতিবাহিত করছে, যাদের স্বামীরা আর কোন দিন তাদের কাছে ফিরে আসবে না। আল্লাহর সেই সৈনিকেরা আল্লাহর পয়গাম পৌছে দিতে আল্লাহ আকবার স্নোগানে আকাশ-বাতাস মুখরিত করে হিন্দুস্তান পিস্তেছিলো। সেখানে গিয়ে তারা সম্পূর্ণ বৈরী আবহাওয়া ও প্রতিকূল পরিবেশে আটকে পড়ে। যেখান থেকে তাদের অনেকের পক্ষেই ফিরে আসা সম্ভবপর হয়নি। যাওয়ার আগে তারা শপথ করে গিয়েছিলো, তারা যেখানেই যাবে, সেখানে মসজিদ আবাদ করবে, আল্লাহর জমিন থেকে মৃত্তিপূজাকে উৎখাত করবে। তারা আল্লাহর পথে জীবন দিয়ে দিয়েছে। আমি আজ রাতের সকল প্রেম-ভালোবাসা, সুখ ও আনন্দকে তাদের পবিত্র ত্যাগের জন্য উৎসর্গ করছি...।

আবুল আব্বাস! এদের বিপরীতে তুমি সেইসব ক্ষমতালিঙ্কু রাজন্যবর্গের রাজসিকতার দিকে ভাকিয়ে দেখ, যাদের ক্ষমতালিঙ্কার জন্য প্রতিটি মুসলিম

জনপদ মুসলমানের রক্তে রঞ্জিত হচ্ছে। প্রতিটি মুসলিম রাজ্যেই বিরাজ করছে গৃহযুদ্ধ। আজকের এই পবিত্র রাতে যদি তুমি আমার কথা দৈর্ঘ্য সহকারে শোন, তাহলে মুসলিম রাজ্যগুলোতে ভাইয়ের তরবারী ভাইয়ের মাথা দ্বিখণ্ডিত করতে থাকবে। ভাইয়ের ধনুক থেকে ছোঁড়া তীরে ভাইয়ের বুক ঝাঁঝরা হতেই থাকবে। আজকের এই পবিত্র রাতে আমার সেইসব মা-বোন ও তরুণী স্ত্রীদের কথা মনে পড়ছে, যাদের সকল সুখ-অঙ্গুলি, স্বপ্ন-সাধনা ক্ষমতালোভী রাজন্যবর্গের অন্যায় বিদ্ধেষের আগুনে জ্বলেপুড়ে ভস্ত হয়ে গেছে। আবুল আব্বাস! তুমি একজন টগবগে শুবক। আমিও শুবতী। এসো, ক্ষণিকের জন্য আমরা বাসর রাতের রঙিন স্বপ্ন ও ঘোবনের উচ্ছাস পাশে রেখে কয়েকটি জরুরী কথা আলোচনা করি।

আবুল আব্বাস! তুমি কি আমাকে বলবে, খাওয়ারিজম শাহ কেন আজো গয়নী আক্রমণ করেনি? তোমার জান্নাতবাসী পিতা কেন হত্যার শিকার হয়েছিলেন? তুমি কি জানো, গয়নী আক্রমণ করার জন্য তাকে উঙ্কানী দেয়া হয়েছিলো। কিন্তু তিনি কিছুতেই গয়নী আক্রমণ করতে সম্মত হননি। ফলে তাকে হত্যা করা হলো। তোমার বড় ভাই পিতার অকাল মৃত্যুতে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়লেন। দিন দিন তার দেমাগ খারাপ হতে শাগলো। আমাকে বিয়ে করার প্রথম রাতেই আমি তাকেও এসব কথাবার্তাই বলেছিলাম। তিনি আমার প্রতিটি কথা হৃদয়ের মণিকোঠায় গেঁথে নিয়েছিলেন।”

“আচ্ছা নাহিদা! তুমি কি একথা জানতে যে, ভাইয়াকে নাকি তোমার ভাই মাহমুদ বিষ পান করিয়েছিলো? সুলতান মাহমুদের অধীনতা সে মেনে নেয়নি বলেই নাকি তাকে বিষ খাইয়ে হত্যা করা হয়েছে?”

“তুমি কি একথায় বিশ্বাস করো?” জিজেস করলো নাহিদা।

“ঠিক বিশ্বাস করতে পারিনি। কিন্তু আমার মধ্যে সংশয় ঠিকই তৈরী হয়েছিলো।” বললো আবুল আব্বাস।

“এখানে সংশয়-সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। যে সমরনায়ক শক্রবাহিনীর সংখ্যার তুলনায় এক-চতুর্থাংশ কিংবা এক-পঞ্চমাংশ সৈন্য নিয়ে সব সময় শক্রদের প্রবল সামরিক শক্তিকে ঢ্যালেঞ্জ করে বিজয় ছিলিয়ে আনতে

সক্ষম, তার মতো বীর বাহাদুর কাউকে বিষ প্রয়োগে হত্যা করতে পারে না। এটা কাপুরুষের কাজ, বীর পুরুষের নয়।

আমার ভাইয়ের যদি প্রয়োজন হতো তোমার ভাইকে দুনিয়া থেকে সরিয়ে দেয়ার, তাহলে তিনি জুরানিয়া এসে এখানকার প্রতিটি ইট বিছিন্ন করে ফেলতে পারতেন এবং তোমার ভাইকে কয়েদ করে জিন্দানখানায় ভরে রাখা তাঁর পক্ষে মোটেও কঠিন ব্যাপার ছিলো না। আমি তোমাকে বলছিলাম, আমাকে বিয়ে করে আনার পর আমি যখন দেখতে পেলাম, এখানে গয়নী সালতানাতের বিরুদ্ধে রণপ্রস্তুতি চলছে, কতিপয় কুচক্ষী তোমার ভাইকে গয়নীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে জড়ানোর উক্তানী দিছে, তখন তোমার ভাইকে আমি এ ভয়াবহতা ও ভ্রাতৃঘাতি যুদ্ধের পরিণতি সম্পর্কে বোঝালাম। তিনি আমার কথায় আশ্চর্ষ হলেন এবং কুচক্ষীদের ঘড়যন্ত্রে পা দিতে রাজী হলেন না।

অবশ্য আমারও এ ব্যাপারে সন্দেহ হতো, তোমার ভাইকে এমন কোন বিষ হয়তো খাওয়ানো হয়েছে, যা খুব ধীরে শরীরের ভেতরে বিষক্রিয়া ঘটিয়েছে। ফলে দিন দিন তার অসুখ বেড়েই যাচ্ছিল। যদি সত্যিই তাকে বিষ খাওয়ানো হয়ে থাকে, তবে সেই কুচক্ষীরাই তাকে বিষ খাইয়েছে, যারা খাওয়ারিজম ও গয়নীর মধ্যে সংঘর্ষ বাঁধানোর চেষ্টা করছিল।

“তোমার মতে কারা সেই কুচক্ষী? কে এই বিষ প্রয়োগের সাথে জড়িত?”  
নাহিদার প্রতি প্রশ্ন ছুঁড়ে দিলো আবুল আকবাস।

“মূল কাজটি মুসলমানরাই করেছে। কিন্তু ওদের পিছনে হাত রয়েছে ইহুদী ও ফিরিস্তীদের” বললো নাহিদা। ইহুদী ও খৃষ্টান চক্রান্তকারীদের সম্পর্কিত চক্রান্তের ফসলই মুসলিম দেশসমূহের মধ্যকার গৃহ্যনুদ্ধ। তাছাড়া কারামতি উপজাতিদেরও এতে হাত আছে। কারণ, আমার ভাই কারামতিদের শীর্ষনেতাকে খতম করে ওদের আখড়া গুড়িয়ে দিয়েছিলেন।”

“নাহিদা! আমি অকালে নিহত হতে চাই না।” উদ্বিগ্ন কষ্টে বললো আবুল আকবাস।

“এমনটি বলো না। বরং বলো, আমি আল্লাহর পথে নিহত হতে চাই।”  
বললো নাহিদা।

“দেখছো না, আমার ভাই বারবার হিন্দুস্তানের প্রতিকূল পরিবেশে গিয়ে নিজের জীবন বিলিয়ে দিতে চায়। আমিও এটিই চাই এবং আল্লাহও তাই

ভালোবাসেন। তুমি আমার ভাইয়ের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে রণাঙ্গন চষে বেড়াও। আল্লাহর পথে তোমাকে উৎসর্গ হতে দেখলে আমি আমার সকল সুখ-স্বপ্ন কুরবান করে দিতেও প্রস্তুত। যদি তুমি এতোটা না-ই পারো, অন্তত গফনী সালতানাতের বিরুদ্ধে কোন তৎপরতা না চালিয়ে গফনীর সাথে মৈত্রী সম্পর্ক শক্তিশালী করো।”

“ঠিকই বলেছো নাহিদা। এ মুহূর্তে সুলতানের একজন শক্তিশালী মিত্র দরকার। কারণ, তাঁর সামরিক শক্তি খুবই দুর্বল হয়ে গেছে।” বললো আবুল আকবাস।

“তোমার কথা পুরোপুরি ঠিক নয়। গফনীর শক্তি এতোটা দুর্বল হয়ে যায়নি, যতোটা তোমরা মনে করছো।” বললো নাহিদা। এখনো যথেষ্ট সৈন্য রয়েছে গফনীতে। তাছাড়া হিন্দুস্তানী সৈন্যদের ব্যারাক সম্পূর্ণ অব্যবহৃত। তাদেরকে কখনো হিন্দুস্তানের কোন যুদ্ধে ব্যবহার করা হয় না। তাদেরকে এদিকে ব্যবহার করার জন্য রিজার্ভ রাখা হয়েছে।

গফনী সুলতানের অধীনে ওরা খুবই সুখে আছে এবং ইসলাম ধর্মে দীক্ষা নিয়ে মুসলমান হচ্ছে। হাজার হাজার গফনীবাসী স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে সেনাবাহিনীতে ভর্তি হয়েছে। এরপরও যে সামান্য ঘাটতি আছে, তাকে পুষিয়ে নেয়ার মতো আস্তশক্তি ও মনোবল গফনী সেনাদের রয়েছে। কাজেই গফনী সালতানাতকে কোন বহিঃঙ্কর আগ্রাসন থেকে রক্ষার জন্য সুলতান মাহমুদের কোন সামরিক শক্তির সাথে মৈত্রী গড়ে তোলা জরুরী এই তুল ধারণা মনের ভেতর থেকে দূর করে দাও। সুলতানের চেয়ে বরং তোমার একজন শক্তিশালী মিত্রের খুব প্রয়োজন।”

“তোমার ভাইয়ের সাথে আমি মৈত্রী স্থাপন করবো ঠিক; কিন্তু তার অধীনতা মেনে নেবো না। সে যদি খুৎবায় তার নাম উচ্চারণের প্রস্তাব করে, তবে তো আমি কখনোই তা মেনে নেবো না। নাহিদা! তোমাকে আজ একথা বলতে ছিধা নেই যে, তোমার প্রতি ভালোবাসা ছাড়াও আমার তোমাকে বিয়ে করার অন্যতম উদ্দেশ্যে তোমার ভাইয়ের সাথে মজবুত মৈত্রী গড়ে তোলা। কারণ, ভেতরে বাইরে আমি চরম শক্তিবেষ্টিত। এমতাবস্থায় তার মতো একজন শক্তিশালী মিত্রের আমার খুবই প্রয়োজন। আমি আশা করি, তিনি বক্সেত্রে হক পুরোপুরিই আদায় করবেন।”

“তাঁর কাছ থেকে বস্তুত্ব ও মৈত্রীর অধিকার আদায় করার দায়িত্ব আমি  
নিজের কাঁধে তুলে নিছি আবুল আকবাস। কিন্তু মৈত্রী বড় কথা নয়। মৈত্রী  
তখনই অর্থবহ হবে, যখন যে কোন দুর্যোগ ও বহিরাক্রমণে খাওয়ারিজম ও  
গযনীর সৈন্যরা একত্রে কাঁধে মিলিয়ে শক্তর মোকাবেলায় অবতীর্ণ হবে।”

“এমনটিই হবে নাহিদা, এমনটিই হবে।” বললেন আবুল আকবাস।

এরপর আবুল আকবাস নাহিদাকে বুকে জড়িয়ে আবেগপূর্ণ কথাবার্তা ও  
আচরণ করতে শুরু করলেন। সেবিকা আলজৌরীকে জানাল, সে মনে  
করেছিল, যে নারী বাসর রাতে রসকমহীন জীবনমৃত্যু যুদ্ধ-জিহাদের মতো  
নীরস ওয়াজ নিয়ে মেতে উঠেছিলো, সেই নারীর মধ্যে প্রেম-ভালোবাসা,  
আবেগ-সোহাগের বালাই থাকতে পারে না। কিন্তু এক পর্যায়ে যুদ্ধ-বিঘ্নের  
কথায় বিরতি দিয়ে নাহিদা ও আবুল আকবাসের কামোদীপক বাসনায় এভাবে  
সাড়া দিলো যে, তার প্রতিটি শব্দ ও বাক্য ছিল উচ্চাস ও উন্নাদনায় ভরপুর।  
অক্ষুক্ষণের মধ্যেই সে আবুল আকবাসকে কামনার উচ্ছিসিত আবেগ ও  
কামোদীপক উত্তেজনাপূর্ণ কথায় নেশাগত্ত করে ফেললো। ত্রিশের কোঠায় পা  
দেয়া নাহিদা যেনো সতেরো বছরের তরঙ্গীতে রূপান্তরিত হলো। তার প্রতিটি  
হাসি ও কথায় যেন টপকে পড়েছিলো মোহনীয় মধুময় সুধা। এমনই যাদুমাখা  
ছিলো নাহিদার প্রতিটি কথা, যেন তা কঠিন সীসাকেও মোমের মতো গলিয়ে  
দিতে সক্ষম ছিলো। কিছুক্ষণের মধ্যে আবুল আকবাসকে শান্ত-সুবোধ শিশুর  
মতোই প্রেমের অঞ্চলাসে বেঁধে ফেলেছিলো নাহিদা। নাহিদার এই দুর্দান্ত  
তৎপরতার কাছে মনে হলো আবুল আকবাস নিতান্তই আনাড়ি বালক।

বুখারার গভর্নর আলাফতোগীন সেবিকাকে দেয়ার জন্য আলজৌরীর হাতে  
দুটি স্বর্ণমুদ্রা দিলেন। আলজৌরীকে বললেন, তুমি সেবিকাকে বাগে রেখে ওর  
কাছ থেকে আবুল আকবাস ও নাহিদার মধ্যকার সব কথাই জানতে চেষ্টা  
করবে। শুরুত্বহীন কথা হলেও তা তন্তে অবহেলা করবে না।”

আলজৌরী এরপর কক্ষ থেকে বেরিয়ে গেল। আলজৌরী চলে যাওয়ার পর  
আলাফতোগীন আবু ইসহাক ও ব্যবরতাশকে বললেন, “আমি আগেই  
তোমাদের বলেছিলাম, এই বিয়ের মধ্যে গভীর উদ্দেশ্য নিহিত রয়েছে। কোন  
উদ্দেশ্য ছাড়া মাহমুদ তার আদরের বোনটিকে আবুল আকবাসের তৃতীয় স্তৰী  
করে দুইটি সতীনের সংসারে পাঠায়নি।”

“এই মৈত্রী কিছুতেই হতে দেয়া যাবে না।” বললেন আবু ইসহাক। খাওয়ারিজম শাহ আবুল আকবাস একটা নারীলোভী তরুণ। একের পর এক নারীসঙ্গ লাভের লিঙ্গ। তাকে অঙ্ক বানিয়ে ফেলেছে। আমরা তার বিশ্বস্ত প্রধান মন্ত্রী আবুল হারেসকে আমাদের পক্ষে নিয়ে নেবো।”

“আরে সাবধান! আবুল হারেস খুবই ভয়ঙ্কর লোক।” বললেন আলাফতোগীন। আবুল হারেসের সাথে এসব নিয়ে কোন কথাই বলা যাবে না। সে মামুনী খান্দানের পোষা লোক। মামুনী খান্দানের প্রতি পরম বিশ্বস্ত। যা কিছু করার আমাদেরকেই করতে হবে। আবুল আকবাস যদি এই নারীর অঙ্কভঙ্গে পরিণত হয়, তবে তাকে বেশী দিন বাঁচিয়ে রাখা যাবে না। আবুল আকবাস রাজনীতিতে এখনো বালক। সে এখনো বুঝতেই পারছে না, মাহমুদ তার বোনের বিনিময়ে খাওয়ারিজম কিনে নিতে চায়।”

“সেনাবাহিনীকে আমাদের হাতে রাখতে হবে।” বললেন সেনাপতি খমরতাশ। সৈন্যদের অধিকাংশই কিন্তু খাওয়ারিজম শহরের প্রতি বিশ্বস্ত। রাজধানী জুরজানিয়ায় সেনাবাহিনী কম। অধিকাংশ সৈন্য আমার অধীনস্ত রাজ্য বুখারা ও দক্ষিণপশ্চিম হাজারাশীপে অবস্থান করছে। এসব সৈন্যকে আমাদের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসতে হবে।

এ ব্যাপারে তোমরা আমাকে একটু সময় দাও। একটা পথ আমি ঠিকই বের করে ফেলব। গৃহযুদ্ধের জন্য সৈন্যদের প্রস্তুত করতে অভিজ্ঞ লোকের দরকার। বললেন আলাফতোগীন।

খাওয়ারিজমের রাজধানী জুরজানিয়া থেকে পশ্চাশ মাইল দূরে সাগরের তীরবর্তী হাজারাশীপে ছিলো সে দেশের সবচেয়ে বড় সেনা শিবির। দীর্ঘদিন ধরেই খাওয়ারিজম রাষ্ট্রের অধিকাংশ সৈন্য সেখানে অলস সময় কাটাচ্ছিল। তখন চতুর্দিকেই ছিল যুদ্ধের ঘনঘটা। কিন্তু খাওয়ারিজম কোন প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সাথে যুদ্ধে না জড়ানোর কারণে এসব সৈনিক দীর্ঘদিন যুদ্ধ থেকে দূরে ছিল। সেনাবাহিনীর কমান্ডার ও সিপাহীরা দিনে-রাতে গঞ্জ-গুজব, আড়া, খেল-তামাশা করে বেকার সময় অতিবাহিত করছিল। যুদ্ধ না থাকায় তাদের চর্চা ও প্রশিক্ষণের ব্যাপারটিও হয়ে পড়েছিল গৌণ। অধিকাংশ সৈনিক ছিলো ধর্মে-কর্মে উদাসীন, আরাম-আয়েশে আসক্ত। কমান্ডারদের সিংহভাগ গা ভাসিয়ে দিয়েছিল বিলাসিতায়।

হঠাৎ একদিন দীর্ঘ শশ্রমগতি আপাদমস্তক সবুজ জুবায় ঢাকা এক দরবেশরপী ফকীর হাজারাশীপ সেনা ব্যারাকের পাশ দিয়ে যাচ্ছিল। দরবেশরপী লোকটির মাথায় সবুজ কাপড়ের পাগড়ী। পাগড়ীতে হাজার দানার দীর্ঘ তসবীহ জড়ানো। তার গলায়ও ঝুলছিলো রং-বেরঙের হাজার দানার দীর্ঘ তসবীহ। তার এক হাতে একটি লাঠি আর অপর হাতে একটি কিতাব। দরবেশরপী ফকির উচ্চ আওয়াজে ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ জপতে জপতে দৃঢ়পায়ে হাঁটছিলো আর থেকে থেকে তার হাতের লাঠি দিয়ে মাটিতে প্রচও জোরে আঘাত করছিলো।

হাজারাশীপে অবস্থানকারী সৈন্যরা এ ধরনের কোন ফকির-দরবেশ কখনো দেখেনি। বিস্ময়কর এই লোকটির পোশাক-পরিচ্ছদ ও আচার-অনুষ্ঠান দেখে ব্যারাকের বাইরে থাকা কিছু সংখ্যক সৈনিক তাকে অবাক বিস্ময়ে দেখছিল। দেখতে দেখতে একটা ভিড় লেগে গেল এবং দরবেশকে ধিরে বহু উৎসুক সৈনিক জমা হয়ে গেল। দরবেশ সৈন্যদের ভিড়ে দাঁড়াল এবং আকাশের দিকে তাকিয়ে চিৎকার করে বললো, ‘সাগরতীর ভূবে যাবে, পাহাড় ফেটে যাবে... আসমান থেকে আগুন ঝরবে, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ।’

এ কথা বলে দরবেশ তাকে ধিরে দাঁড়ানো সৈনিকদের কারো প্রতি না তাকিয়ে আবার পথ চলতে শুরু করলো। বিকট আওয়াজে ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ বলে দরবেশ যখন প্রচও শক্তিতে তার লাঠি দিয়ে মাটিতে আঘাত করলো, অভূতপূর্ব এই ঘটনায় অভিভূত হয়ে সৈন্যরা তার পথ ছেড়ে দিল।

দরবেশের এসব কর্মকাণ্ডে সম্মোহিত হয়ে কিছু সৈনিক তার পিছু পিছু চলতে লাগল। এক সৈনিক দরবেশের হাতে একটি রৌপ্যমুদ্রা গুঁজে দিলে অন্যেরাও দরবেশকে টাকা-পয়সা দেয়ার জন্য পকেট হাতড়াচ্ছিল। কিন্তু গুঁজে দেয়া রৌপ্যমুদ্রাটিকে দরবেশ মুখে পুড়ে দাঁতে কামড়ে থেতলে আকাশে ছুঁড়ে মারলো।

মুদ্রার প্রতি দরবেশের এই অনাসক্তি দেখে সবাই যার যার টাকা আবার পকেটেই রেখে দিল। কিন্তু উপস্থিতি সবাই দরবেশের এই কাণ্ডে সম্মোহিত হয়ে গেল। কারণ, তারা ভেবেছিল লোকটি হয়তো কোন অভাবী ফকির।

এমন সময় দু'জন লোক খুব দ্রুত পায়ে দরবেশের পথে এসে থামল। তারা সৈন্যদের নিবৃত্ত করতে বললো, সাবধান, দয়া করে আপনারা কেউ পীর

বাবাকে কষ্ট দেবেন না। তাকে কেউ কোন টাকা-পয়সা দিতে চেষ্টা করবেন না। তার মুখ দিয়ে কোন কথা বেরিয়ে পড়লে তা কখনো বিফলে যাবে না। তাকে কেউ বিরক্ত করবেন না। তাতে, হিতে বিপরীত হতে পারে। তিনি হয়তো গায়েবী নির্দেশন দিতে এসেছেন।

পনেরো-শোল বছর আগে তাকে একবার দেখা গিয়েছিল। আপনাদের হয়তো মনে আছে, পনেরো বছর আগে সমরকন্দে ভয়াবহ ভূমিকম্প হয়েছিল। সেই ভূমিকম্পের দু'দিন আগে সমরকন্দের অলি-গলিতে তাকে ঘুরতে দেখা গেছে।

তখনও তিনি এভাবে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র জিকির করতে করতে বলছিলেন—'সমরকন্দের জমিন গোনাহগারদের বোো আৱ সহ্য কৰতে পাৱছে না।' সব ভেঙে যাবে, ধুলোয় মিশে যাবে।' কিন্তু তখন তার কথা কেউ বুৰতে পাৱেনি। দু'দিন পৰ বাবাজী শহুৰ থেকে উধাও হয়ে গেলেন। তার উধাও হয়ে যাওয়াৰ সাথে সাথে প্রচণ্ড ভূমিকম্পে গোটা সমরকন্দ ধ্বংসস্তূপে পরিষ্ঠত হয়েছিলো। শহুৰের সকল সৱাইখানা ও পানশালা মাটিৰ সাথে মিশে গিয়েছিল।"

দুজনের আৱেকজন বললো, 'পনেরো বছর পৰ হঠাৎ আজ এখানে তাকে দেখা যাচ্ছে। এখনো তিনি সেই দিনের মতোই জিকির ও ভবিষ্যত্বাণী কৰছেন। আল্লাহ মাল্লুম, তিনি যা বলছেন তা হবেই হবে। জানা নেই, কোন পাহাড় ভেঙে পড়ে কিংবা কোন জায়গায় আকাশ থেকে আগুন বারে। কিন্তু এটা ঠিক বিপর্যয় একটা ধেয়ে আসছে, বিপদ একটা না একটা ঘটবেই। এই দৱেশে বাবার কথা মিথ্যা হবার নয়।'

একথা শোনামাত্র উপস্থিত সৈন্যদের চেহারা ভয়ে-আতঙ্কে বিবর্ণ হয়ে গেল। তাদের একজন সাহস কৰে বললো, "এই দৱেশের কাছ থেকে কি জানাব কোন উপায় নেই, বিপদ কোন দিক থেকে আসবে এবং কেন আসবে? এই বিপদ ঠেকানোৰ কোন পথ আছে কি না?"

আতঙ্কগ্রস্ত সৈন্যরা ভয়াবহ বিপদের কথা শুনে একে অন্যের দিকে তাকিয়ে পরস্পর অবস্থার ভয়াবহতা আৱো ছড়িয়ে দিল এবং কোন বাক্য ব্যয় না কৰেই নিজ নিজ ব্যারাকে ফিরে এলো। কিছুক্ষণের মধ্যে বাতাসের সাথে এই খবৰ গোটা সেনা শিবিৰে ছড়িয়ে পড়ল। এক দৱেশ পনেরো বছর আগেৰ

সমরকন্দের মতো ভয়াবহ বিপর্যয় ও ধ্রংসের ভবিষ্যদ্বাণী করে এলাকায় ঘুরে বেড়াচ্ছে। মুখে মুখে এই দুর্যোগের খবর আরো ভয়ঙ্কর ও জিতিপ্রদ হয়ে গোটা শিবিরে ছড়িয়ে পড়লো। শিবির জুড়ে এই ফকিরের ভবিষ্যদ্বাণীই হয়ে উঠলো আলোচনার একমাত্র বিষয়। প্রত্যেকের মুখেই একই কথা, এই ফকীরের কাছ থেকে এই বিপদ থেকে মুক্তির বিষয়টি কিভাবে জানা যায়? কেন, কোনদিক থেকে আসবে এই বিপদ?

পরদিন সেনা শিবিরে এ খবর ছড়িয়ে পড়লো, গতকালের ভবিষ্যদ্বাণী করা দরবেশকে আজকে সমুদ্রতীরের একটি জায়গায় তাঁবু খাটিয়ে অবস্থান করতে দেখা গেছে। খবর শোনামাত্র কয়েকজন উৎসাহী সৈনিক সমুদ্র তীরের দিকে রওনা হলো। সৈন্যরা সাগর তীরে গিয়ে দেখতে পেলো, সেখানে একটি ছোট তাঁবু খাটানো রয়েছে। তাঁবুর পাশেই তিন-চারজন লোক বসে আছে। সৈন্যরা সেখানে গিয়ে শুনতে পেল, তাঁবুর ডেতর থেকে ভেসে আসছে দরবেশের ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ জিকিরের আওয়াজ।

সেই সাথে তারা শুনতে পেলো, রক্তের বন্যা... থামিয়ে দাও, থামিয়ে দাও।

তাঁবুর বাইরে বসে থাকা লোকেরা সৈন্যদের জানালো, তারা সারা রাত এখানেই কাটিয়েছে। দরবেশ রাতভর বিরতিহীনভাবে এই জিকির চালিয়েছেন এবং মাঝে মধ্যেই তার লাঠি সাগরের পানিতে ডুবিয়ে এখানকার পানির গভীরতা পরিমাপ করেছেন।

তারা আরো জানালো, দরবেশের পা ধরে তারা মিনতি করে জানতে চাচ্ছিলো আসলে বিপদ কি ধরনের হতে পারে। তাদের অনুরোধে দরবেশ তাদের আসমানের প্রতি তাকাতে বললেন। তারা দিব্যচোখে দেখেছে, আসমানের তিনটি তারা ডেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গোটা আকাশে ছড়িয়ে পড়েছে এবং তারার টুকরোগুলো দূর-দূরাতে গিয়ে মাটিতে আঁচড়ে পড়েছে। এরপর দরবেশ আসমানের দিকে তাকিয়ে বললেন, এখনো সময় আছে, ফিরে এসো, আসমানের এই গজবকে থামিয়ে দাও।’

তারা সৈন্যদের আরো জানালো, আমরা দরবেশ বাবার সেবা করার জন্য এখানে এসেছি। কিন্তু তিনি আমাদের দিকে তাকিয়েও দেখছেন না। সৈন্যরা তাঁবুর বাইরে দাঢ়িয়ে দরবেশের তীব্র চিন্কারের জিকির শুনছিলো এবং তাঁবুর

বাইরে অপেক্ষমাণ লোকদের মুখে দরবেশ সম্পর্কে নানা তথ্য অবহিত হচ্ছিল। বাইরে অপেক্ষমাণ লোকদের বক্তব্যও দরবেশের তীব্র জিকির শনে সৈন্যরা দরবেশকে আল্লাহর জীবন্ত পয়গামবাহী দৃত ভাবতে শুরু করল।

এই সৈন্যরা ব্যারাকে ফিরে গিয়ে গতকালের অনেকের দেখা দরবেশকে আরো রহস্য পুরুষে পরিণত করল।

পরদিন ব্যারাকের আরো সৈন্য আর শহরের বহু লোক দরবেশকে দেখার জন্য সমুদ্র তীরবর্তী তাঁবুর পাশে জমায়েত হলো। দেখতে দেখতে তাঁবুর জায়গাটি সৈনিক এবং শহরের লোকদের জন্য তীর্থস্থানে পরিণত হলো।

লোকজন সমুদ্রভীরে গিয়ে তাঁবুর বাইরে দাঁড়াতো। তাঁবুর ভেতরে দরবেশের উচ্চ আওয়াজে জিকির শনতে পেতো, সেই সাথে দরবেশ তিলাওয়াত করতো কেয়ামত দিবস সম্পর্কীয় আয়াতসমূহ। থেকে থেকে দরবেশ বলছিল, “রক্তের প্লাবন ধেয়ে আসছে, মানুষ মানুষকে হত্যা করবে।... দেশের বাদশা নারীর গোলামে পরিণত হবে”।

\* \* \*

সুলতান মাহমুদের দুই গোয়েন্দা কর্মকর্তা বিয়ে অনুষ্ঠান থেকে ফিরে এসে সুলতানকে জানালো, তারা বিয়ে অনুষ্ঠানে বুখারার গভর্নর আলাফতোগীন, সেনাপতি আবু ইসহাক ও সেনাপতি খমরতাশ এর কথাবার্তা শনেছে। গোয়েন্দা কর্মকর্তারা সুলতানকে জানালো, আবুল আকবাসকে ক্ষমতাচ্যুত করার জন্য এ তিন ক্ষমতাধর ব্যক্তি চক্রান্ত করছে। অচিরেই তারা একটা কিছু ঘটাবে।”

সুলতান তাদের কথা শনে পরামর্শ দিলেন, তোমরা আবুল আকবাসের রাজমহল জুরজানিয়া এবং বুখারায় তোমাদের কয়েকজন গোয়েন্দাকে নিয়োগ করো, যাতে তারা ওদের চক্রান্তের খবর সময়মতো আয়াদের অবহিত করতে পারে।”

সুলতানের নির্দেশে চার-পাঁচজন অভিজ্ঞ গোয়েন্দাকে জুরজানিয়া ও বুখারায় পাঠিয়ে দেয়া হলো। তারা জুরজানিয়া গিয়ে সুলতানের বোন নাহিদার সাথেও যোগাযোগ হ্রাপন করতে সক্ষম হলো। কিন্তু তারা বারংবার খবর

দিছিলো, আবুল আবাসের পক্ষ থেকে সুলতানের বিরুদ্ধে কোন ধরনের বিরূপ তৎপরতার আশঙ্কা নেই। আসলে রাজধানীতে চক্রান্তকারীদের কোন তৎপরতা ছিলো না। চক্রান্ত চলছিলো হাজারাশীপ ও বুখারায়।

হাজারাশীপের সমুদ্রতীরের ঝুগড়ীসম তাঁবুতে বসে দরবেশরূপী ফকির হাজারাশীপ সেনাশিবিরের সৈন্যদের মধ্যে অভাবনীয় প্রভাব সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়।

ওদিকে হাজারাশীপ থেকে শত মাইল দূরবর্তী বুখারা রাজ্যের সমুদ্রতীরে অনুরূপ আরেক দরবেশের খ্যাতি চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়লো। এই দরবেশও সমুদ্রতীরে তাঁবু খাটিয়ে অবস্থান করছিলো। বুখারার এই দরবেশ তার তাঁবুতে একা ছিলো না, তার সাথে ছিলো আরো বহু শিষ্য মুরীদ। মুরীদের মধ্যে কয়েকজন পুরুষ আর কয়েকজন নারী।

মাত্র কয়েক দিনেই দরবেশের খ্যাতি চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়লো যে, এই বুরুগ ব্যক্তি এমন একটি ওষুধ এবং তাবিজ দেয়, যা ব্যবহার করলে মানুষ কখনো বার্ধক্যের শিকার হয় না— দীর্ঘজীবন লাভ করে।

মানুষ মাত্রই দীর্ঘজীবন ও দীর্ঘ যৌবন প্রত্যাশা করে। সেনাদের প্রতিটি মুহূর্ত উৎকর্ণ থাকতে হয় কখন যুদ্ধের দামামা বেজে ওঠে। যুদ্ধ মানেই মৃত্যু, মৃত্যুর হাতছানি।

দীর্ঘজীবন ও যৌবন লাভের দাওয়াই এবং তাবিজের কথা সেনাশিবিরে পৌছায়া এ খবর এ কান ও কান হতে হতে শিবিরময় ছড়িয়ে পড়লো। মৃত্যু আতঙ্কে ভীত সৈন্যরা এ খবরে খুবই প্রভাবিত হলো। দলে দলে সৈন্যরা সমুদ্রতীরে দরবেশের তাঁবুতে ভিড় করলো।

উভয় সৈন্যশিবিরে সৈন্যরা সমুদ্রতীরের অবস্থান নেয়া দুই দরবেশের তাঁবুতে জমায়েত হতে লাগলো। উভয় দরবেশ সৈন্যদের উদ্দেশ্যে বললো, “তোমরা আল্লাহর পথের সৈনিক। তোমরা সুন্দর সঠিক পথে আছো। কিন্তু তোমাদের চারপাশে যেসব মুসলিম রাষ্ট্র রয়েছে, ওদের কেউ সঠিক পথে নেই। ওরা নামে মাত্র মুসলমান। তাদের কেউ কেউ তোমাদেরকে গোলামে পরিণত করতে তৎপর। প্রতিবেশী কোন রাষ্ট্রকে তোমরা মুসলমান মনে করে যদি তাদের উপর ভরসা করো, তাহলে তোমাদের উপর এমন গজব পড়বে যে, তোমাদের কোন নামগঞ্জ থাকবে না।

উভয় সেনাশিবিরে দরবেশকুপী দুই ফকির তাদের সম্মোহনী ক্ষমতাবলে সৈন্যদেরকে এতোটাই প্রভাবিত করলো যে, সৈন্যরা তাদের কথা অমোগ সত্ত্ব বলে হৃদয় দিয়ে বিশ্বাস করলো ।

এক রাতে আলাফতোগীন তার খাস কামরায় উপবিষ্ট । তার সামনে অপরিচিত দু'জন শোক । তাদের কারো চেহারা ছবি স্থানীয় শোকদের মতো নয় । তারা মুসলমানও নয় । উভয়েই বিদেশী ইংরেজ ।

“আপনাদের এই কৌশল শেষ পর্যন্ত কি ফল বয়ে আনবে?” উপস্থিত ফিরঙ্গীদের জিজ্ঞেস করলেন বুখারার গর্ভন্ত আলাফতোগীন ।

“আপনি কেন আমাদের সাহায্য করেছেন?” ফিরঙ্গীদের একজন আলাফতোগীনকে পাল্টা প্রশ্ন ছুঁড়ে দিলো । সৈন্যদেরকে আপনার আহ্বাভাজন বানিয়ে আপনি খাওয়ারিজম রাজ্যের অধিপতি হতে চান?” এই উদ্দেশ্যেই তো আপনি আমাদের সহযোগিতা করেছেন, তাই না?”

আমরা এখানে এসে সৈন্যদের মধ্যে ব্যাপক অনুসন্ধান চালিয়ে দেখেছি, তারা খাওয়ারিজম শাহের বিরুদ্ধে কিংবা জুরজানিয়ার সৈন্যদের বিরুদ্ধে তরবারী ধরতে মোটেও সম্ভত নয় । কোন ধরনের অভ্যন্তরীণ সংঘাতের ঘোর বিরোধী তারা ।

আমরা হাজারাশীপ ও বুখারার সৈন্যদের ভেতরের খোজ-খবর নিয়ে জেনেছি, তারা অভ্যন্তরীণ সংঘাত তো দূরের কথা প্রতিবেশী কোন রাষ্ট্রের বিরুদ্ধেও যুক্তিগ্রহে আগ্রহী নয় । এখানকার সকল সৈন্যদেরকে মৌলিকভাবেই এ শিক্ষা দেয়া হয়েছে যে, মুসলমান কোন মুসলমানের বিরুদ্ধে তরবারী ধরতে পারে না । এজন্য আমাদেরকে সর্বাঞ্চ হাজারাশীপ ও বুখারাতে যেসব সৈন্য রয়েছে, তাদের মন থেকে ইসলামের আদর্শিক বিশ্বাস দূর করতে হবে ।

“কল্পনা ও সংশয়বাদিতা এমন এক অস্ত্র, যা দিয়ে ধর্মবিশ্বাসের ভিত্তি ধসিয়ে দেয়া যায় । সব মানুষই ভবিষ্যতে ঘটিতব্য এবং ঘটমান ঘটনাবলীর কারণ জানতে চায় । এটা মানুষের একটি স্বত্বাবজ্ঞাত দুর্বলতা ।

মানুষের আরেকটি দুর্বলতা হলো আবেগ ও বিশ্বাস । সকল মানুষ বিশ্বাসের কথাবার্তা ও ঘটনাকে শুনতে ও দেখতে পছন্দ করে এবং আবেগকে বিবেকের উপর বিজয়ী করে ফেলে । মানুষের এই আবেগ ও বিশ্বাসানুভূতিকে সহজেই প্রভাবিত করা যায় । যে মানুষ যতো বেশী মূর্খ ও অশিক্ষিত, সে ততো বেশী

আবেগপ্রবণ ও আবেগাশ্রয়ী। মানুষের তৃতীয় দুর্বলতা হলো প্রত্যেকেই চির ঘোবন ও অমরত্ব লাভ করতে চায়।

আমরা আপনাদের সেনাবাহিনীর কমান্ডার ও সৈনিকদের এই যানবিক দুর্বলতাগুলোকে দুই কৃতিম দরবেশের দ্বারা কাজে লাগাচ্ছি। আমাদের দুই দরবেশরপী মনোবিজ্ঞানী সিপাহী ও কমান্ডারদের ধর্মানুভূতি ও ধর্মবিশ্বাসের জায়গায় সংশয় ও কল্পনাবিলাস চুকিয়ে দেবে। উভয় দরবেশ কথায় কথায় ধর্মের বিধান উল্লেখ করে কুরআনের আয়াতের উজ্জ্বল দেয়। কিন্তু তার প্রতিটি কথার মর্ম সম্পূর্ণ ইসলামের পরিপন্থী। আমাদের এই দুই বিশেষজ্ঞ আপনাদের সৈন্যদের ধর্মানুরাগ অঙ্গুণ রেখেই প্রতিবেশী মুসলিম রাষ্ট্রের শাসক ও সৈন্যদের প্রতি অবিশ্বাস ও সংশয় সৃষ্টি করতে সক্ষম।

ধর্মবিশ্বাসে আমরা খৃষ্টান। কিন্তু আপনাদের ধর্মের প্রতিটি বিধিবিধান সম্পর্কে আমরা অবগত। আমরা আপনাদের সৈন্যদের মধ্যে ধর্মীয় উন্নাদনা সৃষ্টি করেছি। আমাদের প্রশিক্ষিত মুসলিম অনুচরেরা আপনাদের সেনাশিবিরগুলোর অলিগলি ঘুরে ঘুরে নানা শুভ ছড়িয়ে দিচ্ছে। তারা এ কথা খুবই সাফল্যের সাথে প্রচার করছে, খাওয়ারিজমকে সুলতান মাহমুদের আগ্রাসন থেকে রক্ষা করার নেতৃত্বের উপরুক্ত একমাত্র ব্যক্তিত্ব বুখারার গর্ভন্ত আলাফতগোগীন।

খাওয়ারিজম শাহ আবুল আকবাস এবং তার নতুন স্ত্রী নাহিদা সম্পর্কে এমনই দুর্নাম ছড়ানো হয়েছে যে, সৈন্যরা আবুল আকবাসকে ঘৃণা করতে শুরু করেছে। আমরা আশা করছি, অলিদিমের মধ্যেই সৈন্যরা আবুল আকবাসের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার জন্য উন্নততা শুরু করবে।

“আপনার দু’জন সহকারী সেনাপতি- যারা আবুল আকবাসের কঠোর ভক্ত ছিলো- দু’জন প্রশিক্ষিত তরুণীকে তাদের পিছনে লাগিয়ে দিয়ে আমরা তাদেরকে আমাদের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছি। আপনার হয়তো জানাই ছিলো না, এই দুই প্রভাবশালী সেনাকর্মকর্তা আপনাকে মোটেও পছন্দ করতো না। এখন তারাও আপনাকে পছন্দ করতে শুরু করেছে। এ ছাড়াও যদি আপনার কোন সাহায্যের প্রয়োজন হয়, তবে আমাদের বলতে পারেন। আমরা আপনাকে আর্থিক, সামরিক ও পরিবহনের জন্য উপরুক্ত জন্ম দিয়ে সহযোগিতা করতে পারি।

“সেটি এখনই নয়।” বললেন আলাফতোগীন। এখনই যদি আপনাদের এসব সহযোগিতা নিই, তাহলে খাওয়ারিজম শাহ জেনে যেতে পারে। আমি একটা সুযোগের অপেক্ষা করছি, যাতে আমি আবুল আবাসের বিরুদ্ধে সৈন্যদের বিচুক্ত করে আমার পক্ষে নিয়ে আসতে পারি। আমি যদি খাওয়ারিজম শাহের গদি উল্টে দিতে পারি, তাহলে আপনাদের সহযোগিতার প্রয়োজন হবে।

“আমরা আপনার কাছে কোন প্রতিদান চাই না।” বললো অপর ফিরিঙ্গী। আমরা শুধু আপনার বক্সুত্ত চাই। আপনার সাথে আমাদের শাসনতাত্ত্বিক বক্সুত্ত ও মৈত্রীস্থাপন হলেই বুবাতে পারবেন, গির্জা ও মসজিদের সম্পর্ক কতোটা হ্রদ্যতাপূর্ণ। আমাদের এই স্বর্গীয় বক্সুত্ত ও মৈত্রীর পথে সুলতান মাহমুদেই একমাত্র বাধা। এই বাগড়াটে লোকটির বিনাশ খুবই জরুরী।”

“আমিও তার ধ্রংস চাই।” বললেন আলাফতোগীন। এই যুদ্ধবাজ লোকটি তার সাম্রাজ্যকে আরো বিস্তৃত করতে মরিয়া হয়ে উঠেছে।

“আপনি হয়তো জানেন, আপনার সৈন্যরা কোন মুসলিম রাষ্ট্রের সৈন্যদের সাথেই যুদ্ধ করতে সম্মত নয়। বিশেষ করে গয়নীর সৈন্যদের সাথে যুদ্ধের কথা তারা ভাবতেই পারে না।” বললো এক ফিরিঙ্গী।

“সৈন্যদের এই মনোভাব আবুল আবাসের তৃতীয় স্তৰী নাহিদার প্রভাবে সৃষ্টি হয়েছে। আমাদের চোখ আবুল আবাসের শয়নকক্ষের ভেতরের খবরও রাখে। আবুল আবাস তার আগের দুই স্তৰীকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত করে সুলতান মাহমুদের বোনের প্রেমে পড়ে নিজের বিবেক-বৃক্ষি খুইয়ে ফেলেছে। এমনও হতে পারে, আবুল আবাস গয়নীকে সামরিক সহযোগিতা দিয়ে বসবে; কিন্তু সে কিছুতেই গয়নী বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হবে না।”

“অনিদ্য সুন্দরী দুই তরুণী বুখারার শাসক আলাফতোগীনসহ দুই ফিরিঙ্গীকে সুরা ঢেলে দিচ্ছিল। এই দুই তরুণী ছিলো ফিরিঙ্গীদের সঙ্গী। আলাফতোগীন শরাবের নেশার চেয়ে তরুণীদের রূপ সৌন্দর্যে বেশী আসক্ত হয়ে পড়েছিলো। সে বারবার তরুণীদের দিকে তাকাচ্ছিলো। তরুণীদের ডুবনমোহিনী মুচকি হাসি আর মনকাড়া চাহনীতে উচ্চীপ্ত হয়ে উঠেছিলো। এদিকে দুই ফিরিঙ্গী অতিকৌশলে নেশাঘন্ট আলাফতোগীনের মন-মগজে

খাওয়ারিজমের একচ্ছত্র অধিপতি তথা বাদশাহ হওয়ার আকাঙ্ক্ষাকে তীব্র করে তুলেছিল।

গয়নী থেকে নাহিদার একান্ত ফুটফরমায়েশের জন্য জেবীন নামের মধ্যবয়স্ক এক ব্যক্তিকে পাঠানো হলো। নাহিদা আবুল আবাসকে জানালো, জেবীন ছিলো আমার একান্ত কর্মচারী। ভাইয়া তাকে আমার কাছে পাঠিয়ে দিয়েছেন। জেবীন খুবই বিশ্বস্ত এবং সমবাদার।

সত্যিকার অর্থেই জেবীন ছিলো অনুগত, অদ্র, মেধাবী এবং পরিচ্ছন্ন মনের মানুষ।

কয়েক দিনের মধ্যেই জেবীন আবুল আবাসের মন জয় করতে সক্ষম হয়। জেবীন আবুল আবাসের রাজপ্রাসাদের অন্যান্য কর্মচারী ও সেবক-সেবিকার উপর নজরদারী এবং তাদেরকে বশে রাখার ব্যাপারে খুবই দক্ষতার পরিচয় দেয়। অবশ্য একাজে আগে থেকেই জেবীন ছিলো পরীক্ষিত এবং অভিজ্ঞতায় ঝন্দ।

একদিন বিকেল বেলায় প্রাসাদের বাগানে বসেছিলো নাহিদা। জেবীন নাহিদার সামনে মাথা নীচু করে দু'হাত বেঁধে দাঁড়িয়ে ছিলো। অবস্থাদৃষ্টে যে কেউ মনে করবে, সে নাহিদার কথা শনছে। বস্তুত জেবীন বলছিলো আর নাহিদা গভীর মনোযোগ দিয়ে জেবীনের কথা শনছিলো।

“একটা কিছু ঠিকই ঘটে চলছে নাহিদা! আমাদের লোকেরা বুখারা ও হাজারাশীপ থেকে যেসব খবর আনছে, তা থেকে বোঝা যায় ওখানে কোন শয়তানী কারসাজী শুরু হয়েছে। হাজারাশীপের নদীর তীরে এক ফকির আন্তানা গেড়েছে, সে নাকি বিশ্বয়কর সব ভবিষ্যৎগী করছে। সে এমন ধরনের চক্রান্তমূলক কথাবার্তা বলছে যে, সেনাবাহিনীর সব লোক তার প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে পড়েছে। সে এক হাতে কুরআন শরীফ আর একহাতে তসবীহ নিয়ে সারাক্ষণ ওয়াজ করে।”

“একথা কি নিশ্চিতভাবে বলা যাবে, সে সত্যিই কোন দুনিয়াবিমুখ ওলী ব্যক্তি নয়?” জিজ্ঞেস করলো নাহিদা।

সে আলেম বটে; কিন্তু দুনিয়াবিমুখ নয়, বরং দুনিয়ামুখী। সে কোন দীনদার আলেম নয়, কুরআনের আড়ালে সে আসলে খ্রিস্টবাদ ছড়াচ্ছে এবং গণমানুষকে বিভান্ত করছে।

গয়নী সালাতানাতের বিরুদ্ধে বিষ ছড়িয়ে দিছে সে। কুরআন শরীফের আয়াত পড়ে পড়ে সে বলছে, গয়নী ও আশেপাশের সকল মুসলিম রাজ্যগুলো এবং এগুলোর শাসকগোষ্ঠী নামকাওয়াতে মুসলমান। ইসলামের নামের আড়ালে ওরা সবাই ক্ষমতালোভী। একমাত্র সত্যিকার মুসলিম ও মুসলমানের দেশ খাওয়ারিজম।”

“সে কি খাওয়ারিজম শাহীর বিরুদ্ধেও কোন কথাবার্তা বলে?”

“না, প্রকাশে সে খাওয়ারিজম শাহীর বিরুদ্ধে বলে না।” বললো জেবীন। কিন্তু সৈনিক ও ক্ষমতালোভীর আচার-আচরণ ও কথাবার্তা এবং তাদের মনোভাব খাওয়ারিজম শাহীর জন্য খুবই ভয়ানক।...

বুখারার পার্শ্ববর্তী নদীতীরেও এমন এক দরবেশ আন্তানা গেড়েছে। সেখানে শুধু দরবেশই নয়, তার সাথে রয়েছে কিছুসংখ্যক পুরুষ ও সুন্দরী নারী। বুখারা জুড়ে এ খবর সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে যে, দরবেশ এমন এক তাবিজ ও শুধু দের, যা সেবন ও ধারণ করলে মানুষ দীর্ঘদিন বেঁচে থাকে এবং জীবনে কখনো বার্ধক্য স্পর্শ করে না। ওই দরবেশের সাথে যেসব সুন্দরী তত্ত্বজী রয়েছে, রাতের বেলায় তাদেরকে সেনাক্ষমতালোভীর সাথে আপত্তিকর আলিঙ্গনাবন্ধ অবস্থায় নদীতীর ও জঙ্গলে ঘুরে বেড়াতে দেখা যায়।

বুখারার সেনাদের কথাবার্তায়ও মারাত্মক পরিবর্তন দেখা দিয়েছে। ওই ফকিরকে দ্বিরে ওখানে মানুষের সমাগম এমন পর্যায়ে পৌছেছে যে, ওখানে রীতিমতো মেলা জমে গেছে। ওই ফকিরও কুরআন-হাদীসের উজ্জ্বল দিয়ে ওয়াজ করে আর গয়নী সালতানাতের বিরুদ্ধে বিমোদগার করে।

মোদ্দাকথা হলো, গয়নী ও খাওয়ারিজমের মধ্যে একটা শক্তিশালী শক্রতা তৈরীর অপচেষ্টা চলছে। আমাদের লোকেরা উভয় সেনা শিবিরের সৈন্যদের সাথে উঠাবসা করে এবং ফকিরের মুরীদ সেজে তাদের কথাবার্তা শুনেছে এবং সৈন্যদের মনোভাব চিন্তা-ভাবনার খবর নিয়েছে।

যে বুখারা ও হাজারশীলের সাধারণ সৈন্যরা কোন কাজকর্ম না থাকায় অলস বসে বসে সারাক্ষণ অশ্লীল কথাবার্তা ও নোংরা আলাপচারিচায় সময় কাটাতো, তাদের প্রত্যেকের মুখে এখন গয়নীর প্রতিটি প্রাসাদ থেকে ইট খুলে নেয়ার বিষয়ে দগ্ধ। গয়নীর খৎসই এখন আলোচনার একমাত্র বিষয়ে পরিষ্ঠিত হয়েছে। এ ছাড়া একথাও শোনা গেছে, ওখানে বহু নারীর সমাগম হয়েছে।

যারা অনেকটা জ্ঞাতসারেই দেহ ব্যবসার পসরা সাজিয়ে সৈনিক ও যুবকদের চরিত্র হনন করছে।

আমাদের একজন গোয়েন্দা এমন এক তরুণীর সাথে মিলিত হয়েছিলো। সে জানিয়েছে, এসব তরুণী শুধু দেহ ব্যবসাই করে না, এরা গফনী সালতানাত ও খাওয়ারিজম শাহ আবুল আবাসের বিরুদ্ধে বিষ ছড়াচ্ছে। পর্দার অন্তরালে এসব দেহপসারিণীদের সম্পর্ক রয়েছে ওই দুই দরবেশের সাথে। তাদের কথাবার্তায় এ বিষয়টি একেবারে দিবালোকের মতো পরিষ্কার।...

আমাদের এক গোয়েন্দা বলেছে, বুখারার ফরিদের সাথে থাকা এক তরুণী একদিন নদীর তীরে তাকে একাকী পেয়ে ঘনবনের দিকে নিয়ে যায় এবং তাকে প্রেম নিবেদন করে। তখন ছিলো সন্ধ্যা। বেলা ডুবে গেলে তরুণী তার গলা জড়িয়ে ধরে প্রেম নিবেদন করে তার পরিচয় জানতে চায়। আমাদের গোয়েন্দা নিজেকে খাওয়ারিজম সেনাবাহিনীর কমান্ডার বলে পরিচয় দেয়। সেনাকমান্ডারের পরিচয় পাওয়ার পর তরুণী এমনভাবে নিজেকে তার সামনে মেলে ধরলো যে, সে যেনো যুগ যুগ ধরে তাকেই ভালোবাসে।

আমাদের গোয়েন্দা জানিয়েছে, এসব তরুণী খুবই সুন্দরী ও প্রশিক্ষিত। আমাদের গোয়েন্দা বলেছে, ‘আমার যদি কর্তব্যবোধ না থাকতো, আর আল্লাহর কাছে জবাবদিহির প্রশ্ন ও পাপাচারের শাস্তির ভয় না হতো, তাহলে এই তরুণীকে আমি জীবনসঙ্গী করার জন্য সম্ভব সবকিছুই করতাম।’ আমাদের গোয়েন্দা আরো বলেছে—

তরুণী তার মধ্যে কামোদীপনা জাগিয়ে দিয়ে গলা জড়িয়ে বললো, “তোমাদের খাওয়ারিজম শাহ তো তার তৃতীয় স্তৰীর গোলামে পরিণত হয়েছে।— গফনী সুলতানের বোন নাহিদা খাওয়ারিজম শাহের জ্ঞানবুদ্ধি সবই গিলে ফেলেছে। সে এখন আঙুলের ইশারায় খাওয়ারিজম শাহকে নাচাচ্ছে।”

“আমাদের গোয়েন্দা তরুণীকে জিজেস করলো, “রাজমহলের কথা তুমি কিভাবে জানলে?”

তরুণী জানালো, “আমি রাজমহলেরই রক্ষিতা ছিলাম। কিন্তু গফনী সুলতানের বোন নাহিদাকে আবুল আবাস বিয়ে করার পর একের পর এক সুন্দরী তরুণীদের আগমন শুরু হয়। প্রতিদিন দলে দলে গফনী থেকে সুন্দরী তরুণীরা খাওয়ারিজমে আসতে শুরু করে। নাহিদা একেক রাতে আবুল

আৰামের কাছে একেক সুন্দৰীকে হাজিৰ কৰে। নাহিদাৰ চক্ৰান্তেৰ কাৰণে আবুল আৰাম হাৰেমেৰ সকল সেবিকা ও রঞ্জিতাকেই তাড়িয়ে দিয়েছে।” একথা বলে তৰণী কান্নায় ভেঙে পড়ে এবং বলে... তুমিই বলো, এখন আমৰা কোথায় যাবোঁ?

“আমাদেৱ বেঁচে থাকাৰ এখন একটাই পথ।” আচ্ছা, তুমি কি আমাকে আশ্রয় দিতে পাৰোঁ? আমাকে কি এই পঞ্চিল পথ থেকে বাঁচাতে পাৱবেঁ? একথা শুনে আমাদেৱ গোয়েন্দা তাকে সামুদ্রণা দিলো এবং পৰবৰ্তীতে তার সাথে আবারো মিলিত হওয়াৰ কথা বলে সেখান থেকে সৱে এলো।

এই ঘটনা থেকেই আপনি আন্দাজ কৰতে পাৱেন, সেখানে কী চলছে।” বললো জৈবীন।

“আমাদেৱ গোয়েন্দাৱা আৱো খবৰ দিয়েছে, বুখাৱাৰ গভৰ্নৰ আলাফতোগীনেৰ প্ৰাসাদে দু'জন ভিন্দেশী লোক বসবাস কৰছে, এদেৱ চামড়া দেখে মনে হয় তাৱা ফিরিসী ইংৰেজ। এৱা ধৰ্মীয়তাবে ইহুদীও হতে পাৱে কিংবা বৃষ্টিমণ্ড হতে পাৱে। এখন আপনিই আমাদেৱ বলুন, আমাদেৱ কি কৰতে হবে? আপনি কি খাওয়াৱিজম শাহকে এ ব্যাপাৱে জানাবেন, এখানে এসব ঘটছে?”

“না, তাকে এসব ব্যাপাৱে জানানো আমাৰ পক্ষে সম্ভব নয়। কাৱণ, এসব খবৰ আমি তাকে জানালে আমাকে জবাব দিতে হবে এসব খবৰ আমি কি কৰে কাৱ মাধ্যমে পেলাম।”

“আবুল আৰাম আমাৰ হাতে আছে। আমি তাকে বলতে পাৱতাম, আপনি হাজাৱাৰশীপ ও বুখাৱাৰ সকল সৈন্যকে রাজধানীতে বদলী কৰুন এবং রাজধানীৰ সৈন্যদেৱকে সেখানে বদলী কৰুন। এৱফলে এক জায়গায় থেকে থেকে সৈন্যৱা অলস ও নিষ্কৰ্ষ হয়ে যাবে না। কিন্তু এ মুহূৰ্তে তাকে এমন কোন পৱাৰ্মশ দেয়া ঠিক হবে না। ওখানকাৱ সৈন্যৱা দুই ফকিৱেৰ সংশ্বে যেভাবে বিভাস্তিৰ শিকাৱ হচ্ছে, এখানকাৱ সৈন্যৱা সেখানে গেলে এৱাও খাৱাপ হয়ে যাবে।

তোমাদেৱ প্ৰতি আমাৰ নিৰ্দেশ হলো, তোমৰা কৌশলে শই দুই ফকিৱকে গায়েৰ কিংবা হত্যা কৰে ফেলো। গফনীতে এমন কিছু ঘটলৈ এদেৱ ঘ্ৰেফতাৱ কৰে শাস্তিৰ মুখোমুখি কৱা যেতো। কিন্তু এখানে তা সম্ভব নয়। আচ্ছা,

আমাদের লোকেরা কি এদের হত্যা করার মতো ক্ষমতা রাখে? জেবিনকে জিজ্ঞেস করলো নাহিদা।

“ফকির দু'জনকে হত্যা করা আমাদের গোয়েন্দাদেরকে জন্য তেমন কোন কঠিন ব্যাপার নয়। আমাদের দরকার এ ব্যাপারে দিক-নির্দেশনা ও পৃষ্ঠপোষকতা।” বললো জেবীন।

“ঠিক আছে, আমি এই নির্দেশ দিলাম। তোমাদের প্রয়োজনীয় পৃষ্ঠপোষকতার ব্যাপারটিও আমি নিশ্চিত করবো। তবে এই কাজের সাথে সাথে গফনী সুলতানের কাছে খবর পাঠিয়ে দাও, আমার নির্দেশে দুই চক্রান্তকারী ফকিরকে হত্যা করা হচ্ছে এবং হাজারাশীপ ও বুখারাতে যা ঘটছে এর বিস্তারিত খবরও দিয়ে দাও।” জেবিনকে বললো নাহিদা।

\* \* \*

কয়েকদিন পর নদীর তীরবর্তী দরবেশের আন্তর্বন্ধন থেকে লোকজন বাড়ী ফিরতে শুরু করে। রাত বাড়ার সাথে সাথে দরবেশের আন্তর্বন্ধন থেকে লোকজন সরে যেতে থাকে।

এক পর্যায়ে সাধারণ মানুষের ভিড় কমে যায়। অর্ধরাতে সাধারণ মানুষের ভিড় কমে যাওয়ায় দেহপসারিণী তরুণীরা খন্দের সাথে নিয়ে দূরের নদী তীরের ঝোপ-ঝাড়ের আড়ালে চলে যায়।

দরবেশের আন্তর্বন্ধন মানুষের ভিড় কমে গেলেও দু'জন লোক আন্তর্বন্ধন ধারে পাশেই ঘোরাফেরা করছিলো। দরবেশ বাইরের মশাল নিয়ে দিয়ে তাঁবুর ভেতরে চলে গেল। তাঁবুর বাইরে দু'জন প্রহরী প্রহরা দিছিলো। প্রহরী দু'জন প্রহরা দেয়ার লক্ষ্যে অনড় বসে ছিলো আর অজ্ঞাত দুজন লোক তাঁবুর অদূরে থেকে প্রহরীদের কর্মকাণ্ড পর্যবেক্ষণ করছিল। তাদের একজন সঙ্গীর উদ্দেশ্যে বললো—

“মনে হয়, তাঁবুর বাইরে অপেক্ষমাণ এই লোক দু'টি দরবেশের প্রহরী। এরা তাঁবুর সম্মুখ থেকে সরবে না;”

“এরা তাঁবুর ভেতরে চলে গেলে আমাদের কাজ কঠিন হয়ে যাবে।”  
বললো অপরজন।

“একটা পরীক্ষা করা যেতে পারে।” বললো প্রথমজন। তুমি ওদের কাছে গিয়ে নিজেকে সেনাবাহিনীর কমান্ডার পরিচয় দেবে আর এমনভাবে নিজেকে উপস্থাপন করবে যে, তুমি দরবেশের খুব ভক্ত। আর এদিকে আমি কাজ সমাধা করার চেষ্টা করবো।”

দ্বিতীয় ব্যক্তি সঙ্গীর কথামতো প্রহরীদের কাছে গিয়ে পূর্ব পরিকল্পনা মোতাবেক গল্প জুড়ে দেয়। লোকটি যখন নিজেকে সেনাবাহিনীর কমান্ডার হিসেবে পরিচয় দেয়, তখন দরবেশের প্রহরীরা তার সাথে কথা বলতে বেশ উৎসাহবোধ করে। লোকটি প্রহরীর উদ্দেশ্যে বললো, বাবাজী হয়তো শয়ে পড়েছেন, এখানে আমরা কথা বললে তার ঘুমের ব্যাঘাত হবে, আমাদের একটু দূরে গিয়ে কথাবার্তা বলা উচিত।

এই বলে সে দুই প্রহরীকে একটু দূরে সরিয়ে নিলো।

দরবেশ চতুর্দিকে পর্দা ঘিরে দিয়েছিলো। অপরদিকে তার সঙ্গী অঙ্ককারের সুযোগ নিয়ে তাঁবুর পিছনে চলে গেলো এবং হামাঞ্জি দিয়ে তাঁবুর পর্দা ফাঁক করে ভেতরটা দেখে নিলো।

তাঁবুর ভেতরের মশালের আলোয় সে দরবেশকে পরিষ্কার দেখতে পেলো। দরবেশরূপী কুচক্ষে দেনারছে শরাব গিলছে। গোয়েন্দা যে দিকটা উঁচু করে দরবেশকে দেখছিলো, এ দিকটায় ছিলো দরবেশের পিছন দিক। এই দুই আগস্তুক ছিলো গয়নীর দুর্ধর্ষ গোয়েন্দা।

গোয়েন্দা খুব ধীরে ধীরে তাঁবুর একটি রশি খুলে নিলো এবং হামাঞ্জি দিয়ে তাঁবুর ভেতরে ঢুকে পড়ল। দরবেশ তখন প্রচুর মদ গিলে বেহংশ। গোয়েন্দা দু'পায়ের উপর ভর করে রশিতে ফাঁস তৈরী করে দরবেশের গলায় ছুঁড়ে দিলো এবং একটানে ফাঁস আটকে ফেলল। দরবেশের মুখ দিয়ে কোন শব্দ বের হওয়ার অবকাশ ছিলো না।

মুহূর্তের মধ্যেই দরবেশের দেহ নিখর হয়ে গেল। দরবেশরূপী মদ্যপের মৃত্যু সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে গোয়েন্দা হামাঞ্জি দিয়ে তাঁবুর পিছন দিক দিয়ে দূরে চলে গেলো। এদিকে তার সঙ্গী দরবেশের দুই প্রহরীর সাথে জমিয়ে গল্প করছিল। হঠাৎ তারা পেঁচার ডাক শুনতে পেলো।

পেঁচার আওয়াজ শুনে দরবেশের দুই প্রহরীর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে তার দু'জন সঙ্গীর সাথে এসে মিলিত হলো এবং তাদের উদ্দেশ্য সফল করে

অঙ্ককারে তাদের গন্তব্যে পা বাড়াল। পেছনে পড়ে রইলো হাজারাশীপের সেনাদের মধ্যে বিভাণ্ডি সৃষ্টিকারী চক্রান্তকারীর মরদেহ।

তাদের পরবর্তী গন্তব্য বুখারা। কিন্তু বুখারা হাজারাশীপ থেকে অনেক দূরে। তাদের পক্ষে রাতারাতি বুখারায় পৌছে বুখারার দরবেশকূপী কুচক্রীকে হত্যা করা সহজ ব্যাপার ছিলো না।

একে তো বুখারার দূরত্ব অপর দিকে হাজারাশীপের দরবেশের মতো বুখারার দরবেশ তার তাঁবুতে একাকী অবস্থান করতো না। তার সাথে থাকতো আরো কয়েকজন পুরুষ ও নারী। তবুও এই দুই গোয়েন্দা তাদের কর্তব্য পালনে রাতের অঙ্ককারে বুখারার পথে ঘোড়া হাঁকাল।

তারা নদীর তীর ধরে দ্রুতগতিতে বুখারার দিকে অগ্সর হতে লাগল। যেতে যেতে এক পর্যায়ে নদীর ওপারে যাওয়ার প্রয়োজন দেখা দিলো। সেখানে নদী ছিলো বেশ চওড়া। চওড়া ইওয়ায় বোৰা যাচ্ছিল নদীর গভীরতা সেখানে কম হবে।

আল্লাহর নাম নিয়ে দুই গোয়েন্দা তাদের ঘোড়া নদীতে নামিয়ে দিলো। নদীর মাঝখানটা ছিলো যথেষ্ট গভীর। সেখানে ঘোড়াকে সাঁতরিয়ে পার হতে হলো। হাজারাশীপ থেকে বুখারার দূরত্ব ছিলো প্রায় শত মাইলের কাছাকাছি।

\* \* \*

পরদিন ভোর হতে না হতেই হাজারাশীপের সর্বত্র খবর ছড়িয়ে পড়লো, রাতের অঙ্ককারে কে বা কারা নদী তীরের তাঁবুতে দরবেশকে হত্যা করেছে। অজ্ঞাত ঘাতকের হাতে নিহত হয়েছেন দরবেশ। এ খবর মুহূর্তের মধ্যে শহরময় ছড়িয়ে পড়ল এবং ছড়িয়ে পড়লো সেনাশিবিরে। খবর পেয়ে ছোট-বড় অফিসার, সকল সৈনিক ও সাধারণ মানুষ নদীতীরে অবস্থিত দরবেশের আন্তরায় ভিড় জমালো।

দরবেশের মৃত্যু সংবাদের সাথে সাথে এ খবরও ছড়িয়ে পড়লো যে, গয়নীর গোয়েন্দারাই দরবেশকে হত্যা করেছে। কারণ, দরবেশ গয়নীর সৈন্য ও গয়নী শাসকের বিরুদ্ধে কথাবার্তা বলতেন। গয়নী সৈন্যদের হাতেই দরবেশ নিহত হয়েছেন, এ কথা সবাই বিশ্বাস করলো। এ খবর হাজারাশীপ সৈন্যশিবিরে বিদ্যমের আগন ধরিয়ে দিল।

এই হত্যাকাণ্ডকে ব্যবহার করে গফনী সালতানাতের বিরুদ্ধে হাজারাশীপের সৈন্যদের উত্তেজিত করতে আরো ভয়াবহ প্রচারণা চালানোর সুযোগ পেলে কুচক্ষীরা ।

সবার মুখে মুখেই একথা উচ্চারিত হতে থাকলো, দরবেশ যে বিপদের কথা বলছিলেন, এই বিপদ এখন মাথার উপরে এসে গেছে । সাধারণ মানুষ ও সৈন্যরা তো আগেই ভীত-সন্ত্রন্ত ছিলো, এখন দরবেশের নিহতের ঘটনায় কমান্ডাররা পর্যন্ত ভীত-সন্ত্রন্ত হয়ে পড়ল । সেই সাথে কমান্ডাররা গফনী সালতানাতের বিরুদ্ধে ক্ষেত্রে অগ্নিমূর্তি ধারণ করলো ।

\* \* \*

পরদিন সূর্যাস্তের সাথে সাথে গফনীর অকৃতোভয় দুই গোয়েন্দা তীব্রগতিতে ঘোড়া ছুটিয়ে প্রায় শত মাইলের দূরত্ব অতিক্রম করে বুখারার উপকর্ত্তে পৌছে গেল । পথিমধ্যে তারা মাঝে-মধ্যে স্বল্প সময়ের জন্য যাত্রাবিরতি দিয়ে তাদের বয়ে নেয়া ঘোড়াকে বিশ্রাম দিয়েছে এবং খাবার খাইয়েছে । বুখারার উপকর্ত্তে পৌছে গোয়েন্দা দুঁজনের একজন শহরে প্রবেশ করে বুখারায় বহুরূপী ফকিরের বেশ ধারণ করে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড পর্যবেক্ষণরত গফনী গোয়েন্দাদের খুঁজতে শুরু করলো ।

শহরে প্রবেশ করে গোয়েন্দা বুখারায় নিযুক্ত দুই গোয়েন্দার একজনকে পেয়ে গেলো । স্থানীয় গোয়েন্দাদেরকে তাদের পরিকল্পনা জানিয়ে, এখন তাদের কি করতে হবে তা বুঝিয়ে দিল ।

“খাওয়ারিজমের দরবেশরূপী নিঃসঙ্গ প্রতারককে হত্যা করা সহজ ছিলো । কিন্তু এখনকার কুচক্ষী একাকী নয় । আমরা তাকে দেখেছি, সে তাঁবুতে একাকী থাকে বটে; কিন্তু তার তাঁবুর পাশেই রয়েছে সঙ্গীদের তাঁবু ।” জানালো স্থানীয় গোয়েন্দারা ।

“অন্যরা জেগে গেলে আমরা পাকড়াও হবো কিংবা মারা পড়বো এটাকে সমস্যা মনে করো না ।” বললো স্থানীয় দুই গোয়েন্দার একজন । আমাদেরকে পাঠানোর আগে যে প্রতিশ্রূতি নেয়া হয়েছিলো, তা একবার স্মরণ করো । আমরা ইচ্ছা করলে সুলতানকে ধোঁকা দিতে পারবো বটে; কিন্তু মহান আল্লাহকে আমরা কিছুতেই ধোঁকা দিতে পারবো না । বললো অন্যজন ।”

এই ভগ্ন প্রতারক কুরআন শরীফ হাতে নিয়ে এক মুসলমানকে অপর মুসলমানের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তুলছে এবং মুসলমানদেরকে পরম্পর শক্ত বানিয়ে ফেলছে তা তোমরা সবই প্রত্যক্ষ করেছো। তোমরা জানো, এই চক্রান্তের মূলে রয়েছে ফিরিস্তি খৃষ্টান ও ইহুদীচক্র। এরা যা করছে, তা ইসলাম ও মুসলমানদের ধর্মসকে ত্বরান্বিত করছে।

গভর্নর আলাফতোগীন খাওয়ারিজমের বাদশা হওয়ার জন্য কুরআনের অবমাননা করছে। ধর্মের প্রয়োজনে পরিত্র কুরআরে মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখতে গিয়ে আমাদের জীবন বিলিয়ে দেয়া উচিত। বললো আগত্বকদের একজন।

ঠিক আছে, আর কথা নয়, এবার চলো। বললো স্থানীয় গোয়েন্দা।

তিনজন তিনটি অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করে চতুর্থ সঙ্গীকে সাথে নেয়ার জন্য শহরের উপকর্ষে পৌছে অন্যজনকেও পেয়ে গেলো। তাকে সাথে নিয়ে সবাই নদীর তীরবর্তী দরবেশের আন্তানার দিকে রওনা হলো।

এরা চারজন নদী তীরের একটি ঘন জঙ্গলে তাদের ঘোড়াকে বেধে রেখে দরবেশের আন্তানার দিকে যখন রওনা হলো, তখন সাধারণ মানুষ সেখান থেকে ঘরে ফিরতে শুরু করেছে। এরা চারজন দর্শনার্থীদের ভিড়ের মধ্যে এদিক-ওদিক ঘোরাঘুরি করতে লাগলো।

এবার দর্শনার্থীরা সেখান থেকে চলে গেল। রয়ে গেলো শুধু নারীদের নিয়ে স্ফূর্তি করার আগ্রহী সেনাকর্মকর্তাদের দু'-চারজন। রাত গভীর হওয়ার সাথে সাথেই শুরু হয়ে গেলো নারীদের দেহ ব্যবসা এবং সেনা কর্মকর্তাদের আমোদফুর্তি।

দরবেশরপী কুচক্ষীর তাঁবু থেকে দূরে গিয়ে নদী তীরের বৌপ-ঝাড়ের আড়ালে যখন প্রশিক্ষিত তরুণীরা তাদের ইঙ্গিত নাগরদের নিয়ে ফুর্তিতে মেতে উঠে, তখন ফকিরের আন্তানায় নীরবতা নেমে আসে।

আন্তানায় নীরবতা নেমে এলে গফনীর চার গোয়েন্দা ধীরপায়ে ফকিরের তাঁবুতে উঁকি দিতে গেলে একজন কিছু একটার সাথে হোঁচ্ট খায়। তাতে হাত দিয়ে সে বুঝতে পারে এটি মটকা। মটকাতে হাত দিয়ে ছ্রাণ শুকে সে বুঝে

পা টিপে টিপে অঙ্ককারের সুযোগ নিয়ে গফনীর চার গোয়েন্দা ফকিরের তাঁবুতে উঁকি দিতে গেলে একজন কিছু একটার সাথে হোঁচ্ট খায়। তাতে হাত দিয়ে সে বুঝতে পারে এটি মটকা। মটকাতে হাত দিয়ে ছ্রাণ শুকে সে বুঝে

নেয়, এটি জ্বালানী তেলে ভর্তি। এমতাবস্থায় দুজন ফকিরের তাঁবু ঘেঁষে বসে পড়ল।

এরা পর্দা ফাঁক করে ভেতরে দেখতে পেলো, অর্ধ উলঙ্গ অবস্থায় ফকিররূপী কুচক্রীর পাশে প্রায় উলঙ্গ এক সুন্দরী তরুণী বসে তাকে মদ ঢেলে দিচ্ছে। ফকির ও তরুণী উভয়েই দেদারছে মদ গলাধঃকরণ করছে। এক গোয়েন্দা তেলভর্তি মটকাটা উল্টে দিয়ে তাঁবুর পর্দা ভিজিয়ে দিলো আর অন্যরা ধারালো খঙ্গুর হাতে নিয়ে প্রস্তুত হয়ে গেল।

হঠাতে এদের দু'জন পর্দা উঁচু করে ফকির ও তরুণী কিছু বুঝে উঠার আগেই তাদের মুখ চেপে ধরলো। ফকির ও তরুণী উভয়েই ছিলো মদের নেশায় বুঁদ। প্রতিরোধ তো দূরের কথা তাদের পক্ষে একটু শব্দ করারও অবকাশ হলো না।

মুহূর্তের মধ্যে দুই গোয়েন্দা ধারালো খঙ্গুর ফকির ও তরুণীর বুকে বিন্দু করলো। একবার খঙ্গুর বুকে বিন্দু করে টেনে বের করে পুনর্বার বিন্দু করতেই ফকির ও তার সঙ্গীনি তরুণীর ইহলীলা সাঙ্গ হয়ে গেল। নীরবে এদের খতম করে দু'জন বাইরে বেরিয়ে এলো। অপর দুজন তাঁবুর বাইরে অপেক্ষা করছিল।

অপেক্ষমাণ এক গোয়েন্দা অত্যধিক স্কুল হয়ে মটকার জ্বালানী তেল অন্যান্য তাঁবুতেও ছিটিয়ে দিতে লাগলো। পার্শ্ববর্তী তাঁবুর বাসিন্দারা এতোটাই নিশ্চিন্তে গভীর ঘুমে তলিয়ে গিয়েছিলো যে, তাদের কেউ এদের কোনকিছুই টের পেল না। সব তাঁবুতে তেল ছিটিয়ে দিয়ে ফকিরের তাঁবু থেকে প্রদীপ এনে সব তাঁবুতে আগুন ধরিয়ে দিল। জুলন্ত তাঁবুর ভেতরে ঘুমন্ত বাসিন্দাদের আর্তচিত্কার শুরু হওয়ার আগেই তারা দ্রুত পায়ে জায়গা ত্যাগ করে ঘোড়া নিয়ে সেখান থেকে চম্পট দিল।

\* \* \*

দু'দিন পর নাহিদাকে খবর দেয়া হলো, দরবেশরূপী কুচক্রীদের ইহলীলা সাঙ্গ করে দেয়া হয়েছে। বুখারায় যেসব সেনাসদস্য অবস্থান করছিলো, তাদের কর্মকাণ্ড ছিলো জনগণের বিপক্ষে এবং আতৎকজনক। বুখারাতেও ফকিররূপী ধর্মগুরুর হত্যাকাণ্ডকে গফনী বাহিনীর নৃশংসতা হিসেবে প্রচারিত হয়। এ খবরে বুখারার সৈন্যরা গফনীর বিরুদ্ধে বিক্ষুল হয়ে ওঠে।

এদিকে বুখারা ও হাজারাশীপের কথিত ধর্মতাত্ত্বিকের নিহতের ঘটনা এবং সেখানকার সেনাদের গয়নীবিরোধী বিক্ষেপের খবর সুলতানের কাছে পৌছালো সাত দিন পর।

সুলতানের কাছে প্রথম খবর পৌছালো নাহিদার তৎপরতার কথা। দ্বিতীয় খবর এলো নাহিদার নির্দেশে হাজারাশীপ ও বুখারার কথিত ধর্মগুরুদের হত্যা করা হয়েছে।

এসব খবর শুনে সম্ভাব্য করণীয় সম্পর্কে গভীর ভাবনায় ডুবে গেলেন সুলতান। তার ভাবনা শেষ হতে না হতেই খবর এলো নাহিদার পক্ষ থেকে আরেকজন দৃত জরুরী খবর নিয়ে এসেছে।

এই দৃত জানালো, আবুল আকবাসের নিযুক্ত বুখারার গভর্নর আলাফততোগীন বুখারায় তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের আয়োজন সম্পন্ন করে ফেলেছে এবং বুখারা ও হাজারাশীপের সকল সৈন্যকে সেনাপতি আবু ইসহাক এবং সেনাপতি ব্যমরতাশ বিদ্রোহী করে তুলেছে। রাজধানী জুরজানিয়ায় যে সামান্যসংখ্যক সৈন্য রয়েছে, তারা আবুল আকবাসের পক্ষে বটে; কিন্তু বিগুল বিদ্রোহী সৈন্যের আক্রমণে প্রতিরোধ করার মতো শক্তি তাদের নেই।

এ খবর শুনে তাৎক্ষণিকভাবে সুলতান মাহমুদ আবুল আকবাসের নামে পয়গাম লিখালেন। ঐতিহাসিকদের মতে সুলতানের লেখা এই পয়গামের ভাষ্য ছিলো অনেকটা এমন-

“আমার বিশ্বাস, আপনার বিরুদ্ধে ধেয়ে আসা বিদ্রোহ আপনার পক্ষে দমন করা অসম্ভব। কারণ, একে তো আপনার বয়স কম, দ্বিতীয়ত এ ধরনের বিদ্রোহ দমনের অভিজ্ঞতা ও আপনার নেই। আপনার ক্ষমতাচ্যুতি কিংবা বিদ্রোহীদের হাতে আপনি নিহত হওয়ার আগেই আপনাকে আমার সহযোগিতা করা উচিত। কিন্তু এই সাহায্য ও সহযোগিতা তখনই করা সম্ভব, যখন আপনার স্বাধীনতা ও স্বাধিকার অক্ষুণ্ণ রেখেই আপনি আমার অধীনতা করুল করে নেবেন এবং আমার নামে খুতবা জারি করবেন।

আমার অধীনতা স্বীকার করে নিলেও আপনার স্বাধীকার ও স্বাতন্ত্র্যবোধ বজায় রাখা হবে। এই অধীনতা স্বীকার করে নিলে আপনার বিশেষ উপকার এই হবে যে, আমি আপনার ক্ষমতা বহাল রাখার জন্যে আমার সবচেয়ে চৌকস সেনাদল আপনার নিরাপত্তা রক্ষায় রাজধানী জুরজানিয়ায় মোতায়েন

করতে পারবো । দ্বিতীয়ত তারা শুধু আপনাকেই নিরাপত্তা দেবে না, আপনার গোটা রাষ্ট্রের নিরাপত্তাব্যবস্থা আপনার নিয়ন্ত্রণে এনে দেবে ।

আপনাকে সতর্ক করে দিতে বাধ্য হচ্ছি যে, এ ব্যাপারে যদি আপনার পরামর্শ একান্তই দরকার হয়, তাহলে শুধু প্রবীণ উজির আবুল হারেসের সাথেই আপনি পরামর্শ করতে পারেন । এ ব্যাপারে বুখারার গভর্নর আলাফতোগীন ও সেনাপতিদের সাথে যদি পরামর্শ করেন, তারা আপনাকে বিভ্রান্ত করবে ।

আপনি এতেটাই অনভিজ্ঞ যে, আপনাকে ঘিরে আপনার রাষ্ট্রের চারপাশে কী ঘটছে, আপনি এ ব্যাপারে একেবারেই বেখবের । শত শত মাইল দূরে গ্যনীতে বসেও আমি জানতে পারছি, বিদ্রোহ দমনের ক্ষেত্রে আপনি একেবারেই সঙ্গীহীন । আশা করবো, এ ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা করতে গিয়ে আপনি অথবা কালক্ষেপণ ও সময় নষ্ট করবেন না ।”

\* \* \*

খ্যাতিমান ঐতিহাসিক বায়হাকী লিখেছেন, গয়নী সুলতানের লেখা এই পয়গাম খাওয়ারিজম শাহ আবুল আবাসের কাছে পৌছলে তিনি এ ব্যাপারে পরামর্শের জন্য রাষ্ট্রের সকল গভর্নর ও সেনাপতিদের সভা ডাকলেন । এ সভায় বুখারার গভর্নর আলাফতোগীন, সেনাপতি আবু ইসহাক, সেনাপতি খমরতাশ ও বাদ পড়লো না ।

এহেন পরিস্থিতিতে আবুল আবাস সুলতান মাহমুদের অধীনতা গ্রহণের পক্ষে মতামত ব্যক্ত করেন । তিনি পয়গামটি কাউকে না দেখিয়ে সভায় শুধু এ প্রস্তাব উথাপন করেন যে, গয়নী শাসক সুলতান মাহমুদ তার অধীনতা করুল করে নিয়ে খুতবায় তার নাম পাঠ করার প্রস্তাব করেছেন ।

বৈঠকে উপস্থিত একমাত্র উজির আবুল হারেস ছাড়া সকল সেনাপতি ও গভর্নরই প্রস্তাব মেনে নেয়ার বিপক্ষে মতামত দিলেন । রাজধানীর রাজপ্রাসাদে অনুষ্ঠিত এই বৈঠকের খবর বৈঠক শেষ হতে না হতেই দ্রুত সকল সেনাশিবিরে পৌছে গেলো । খবর পাওয়ামাত্রই সেনারা এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে দিল ।

ଆବୁଲ ଆକାଶ ବିଦ୍ରୋହର କଥା ଓନେ ସୈନ୍ୟଦେର ମଧ୍ୟେ ସର୍ଗମୁଦ୍ରା ବିତରଣ କରେ ବିଦ୍ରୋହ ଆପାତଦୃଷ୍ଟିତେ ପ୍ରଶମନ କରଲେନ । ସେଦିନେର ବୈଠକ ସିଙ୍କାନ୍ତ ଛାଡ଼ାଇ ମୂଲତବୀ ହେଁ ଗେଲ । ଚାରଦିନ ପର ଆବାରୋ ବୈଠକ ଡାକା ହଲୋ । ଏବାର ବୈଠକେ ଆବୁଲ ଆକାଶ ଘୋଷଣା କରଲେନ, ଗୟନୀର ଅଧୀନତା ମେନେ ନେଯା ହବେ ନା । ଗୟନୀ ସୁଲତାନ ଯଦି ଖାଓୟାରିଜମ ଆକ୍ରମଣ କରେ ବସେ, ତାହଲେ ତୁର୍କୀ ଖାନଦେର କାହିଁ ଥେକେ ସହ୍ୟୋଗିତା ନେଯା ହବେ । ଏଜନ୍ୟ ତୁର୍କି ଖାନଦେର ସାଥେ ସହସାଇ ମୈତ୍ରୀଚୁକ୍ତି କରା ହେବି ଏବଂ ସେଇ ଚୁକ୍ତିକେ ଗୋପନ ରାଖା ହୋଇ ।

ଐତିହାସିକ ବାଯହାକୀ ଲିଖେଛେ, ଆବୁଲ ଆକାଶେର ଏଇ ସିଙ୍କାନ୍ତର ଖବର ଗୟନୀର ଗୋଯେନ୍ଦାରା ସୁଲତାନକେ ଯଥାସମୟେ ଜାନିଯେ ଦିଲ । ସୁଲତାନ ଖବର ପେଲେନ, ଆବୁଲ ଆକାଶ ତାର ପ୍ରତାବେ ସାଡ଼ା ନା ଦିଯେ ତୁରକ୍କେର ଖାନଦେର ସାଥେ ମୈତ୍ରୀଚୁକ୍ତି ସମ୍ପାଦନ କରତେ ଯାଚେନ ।

ଏ ଖବର ଓନେ ସୁଲତାନ ମାହମୂଦ ସୈନ୍ୟ ଏବଂ ପାଂଚଶତ ଜଙ୍ଗି ହାତିର ବହର ନିଯେ ଖାଓୟାରିଜମେର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ବଲଖ ପୌଛେ ଆବୁଲ ଆକାଶକେ ଖବର ପାଠାଲେନ, ସୁଲତାନେର ପ୍ରେରିତ ପଯଗାମ ନା ଯାନଲେ ଗୟନୀ ବାହିନୀ ଜୁରଜାନିଯା ଆକ୍ରମଣ କରବେ ।

ସୁଲତାନେର ସେନାସମାବେଶେର ଖବର ଓନେ ତୁର୍କିଷ୍ଟାନେର ଖାନ ଶାସକରା ଖାଓୟାରିଜମ ଶାହେର ସାଥେ ସାମରିକ ସହ୍ୟୋଗିତା ଚୁକ୍ତି କରତେ ଅସ୍ଵିକୃତି ଜାନାଲୋ ।

ତୁର୍କିଷ୍ଟାନେର ଖାନ ଶାସକରା ବଲଖେ ଏସେ ସୁଲତାନକେ ଖାଓୟାରିଜମ ଆକ୍ରମଣ ଥେକେ ବିରତ ଥାକାର ଅନୁରୋଧ କରଲୋ । କିନ୍ତୁ ସୁଲତାନ ତାଦେର କଥାଯ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ହଲେନ ନା । ତିନି ତାର ଅଭିଥାଯେ ଅବିଚଳ ରାଇଲେନ । ଅବହ୍ଲା ବେଗତିକ ଦେଖେ ତୁର୍କି ଖାନେରା ଆବୁଲ ଆକାଶକେ ଗିଯେ ସୁଲତାନେର ପ୍ରତାବ ମେନେ ନିତେ ରାଜୀ କରାଲୋ । ସେଇସାଥେ ଖାଓୟାରିଜମ ଜୁଡ଼େ ସୁଲତାନେର ନାମେ ଖୁତବା ଦେଯାର ପ୍ରତାବ ପାଶ କରାଲୋ ।

ସୁଲତାନେର ଦାବୀ ପୂରଣେ ଆବୁଲ ଆକାଶ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ହୋଇଥାଏ ସୁଲତାନ ବଲଖ ଥେକେ ତାର ସେନା ବାହିନୀକେ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରେ ନିଲେନ ।

ସୁଲତାନ ମାହମୂଦର ସମୟକାର ବିଖ୍ୟାତ ମୁସଲିମ ଐତିହାସିକ ଆବୁ ନସର ମୁହାସ୍ତଦ ଆଲ ଉତ୍ତବୀ ଛିଲେନ ସୁଲତାନେର ଏକଜନ ଘନିଷ୍ଠଜନ । ଉତ୍ତବୀ ବହୁ ସଫରେ ସୁଲତାନେର ସହ୍ୟାତ୍ମୀ ଛିଲେନ । ସୁଲତାନେର ପକ୍ଷେ ତିନି କଯେକବାର ବିଭିନ୍ନ ରାଷ୍ଟ୍ରୀ

দৃতের ভূমিকাও পালন করেছেন। উত্তীর্ণ তার ব্যক্তিগত পর্যবেক্ষণ সম্বলিত প্রামাণ্যগ্রস্থ কিতাব আল ইয়ামিনীতে লিখেছেন-

“আবুল আকবাস সুলতানের প্রস্তাব মেনে নিতে দিধারিত ছিলেন। কারণ তিনি স্বাধীনতা ও স্বাধিকার হারানোর আশঙ্কা করছিলেন। কিন্তু তার উজির আবুল হারেস তাকে বোঝাতে চেয়েছিলেন, সুলতানের প্রস্তাব মেনে নেয়ার মধ্যে এতোটা ক্ষতি নেই, যতটুকু ক্ষতি সেনাবিদ্রোহে হবে। সর্বোপরি সম্ভত সুলতানের প্রস্তাব মেনে নিতে আবুল আকবাসকে নাহিদা করাতে জোর প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন।

নাহিদা আবুল আকবাসকে আশ্বস্ত করতে বলেছিলেন-

“আমি দৃঢ়তার সাথে বলতে পারি, আমার ভাই আপনার স্বাধীনতা কখনো হ্রণ করবেন না। তিনি আপনাকে তার মিত্র এবং আপনাকে বিদ্রোহের আশঙ্কা থেকে নিরাপদ করতে চান।”

“আমি বুঝতে পারছি না, কে আমার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করবে? আমার সেনাদের প্রতি আমার আস্থা আছে।” নাহিদার উদ্দেশে বললেন আবুল আকবাস।

“আপনি ভুল ধারণা পোষণ করছেন। সেনাবাহিনী থেকে আপনার আস্থা এবং আপনার প্রতি সৈন্যদের বিশ্বস্ততা বিনষ্ট করে দেয়া হয়েছে।”

“কে সেনাদের মন থেকে আমার আস্থার বিলোপ ঘটিয়েছে?”

“আপনার গভর্নর আলাফতোগীন, সেনাপতি আবু ইসহাক এবং সেনাপতি খমরতাশ।” বললেন নাহিদা।

এদের পচাতে রয়েছে ফিরিসী খুঁটান ও ইহুদী কুচক্ষী গোষ্ঠী। আপনাকে বুঝতে হবে, সুলতান মাহমুদের সহযোগিতা ছাড়া আপনার বাদশাহী টেকানো অসম্ভব। আপনি আত্মাঘায় না ভুগে আমার কথায় বিশ্বাস করুন। আপনি দয়া করে গঘনী সুলতানের আনুগত্য স্বীকার করে নিন।”

চিন্তা-ভাবনার পর অবশ্যে আবুল আকবাস সুলতানের আনুগত্য মেনে নিতে সম্ভত হলেন এবং সুলতানের নামে খুতবা পাঠের ঘোষণা জারি করলেন।

সুলতানের নামে খুতবা পড়ার হকুমনামা হাজারাশীপ ও বুখারায় পৌছুলে সৈন্যদের মধ্যে চরম উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। পূর্ব থেকেই সৈন্যদেরকে

সুলতানের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তোলা হয়েছিল। এবার তার নামে খুতবা পড়ার হৃকুমনামা ক্ষেত্রের আগুনে যেন ঘি ঢেলে দিলো।

বুখারার গভর্নর আলাফতোগীন সৈন্যদের ছোট বড় কমান্ডারদের ডেকে এনে বললো, দরবেশগণ যে বিপদাশঙ্কার ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, এই বিপদ এখন গয়নী সেনাবাহিনীর রূপধারণ করে আসছে। যে করেই হোক এ বিপদ আমাদের ক্রুতিতেই হবে। নয়তো আমাদের ও তোমাদের মা-বোনেরা গয়নীর লুটেরা হিংস্র বাহিনীর দাসী-বাঁদীতে পরিণত হবে।

হিন্দুস্তানকে লুষ্টনকারী সুলতান মাহমুদ এখন খাওয়ারিজমকে লুষ্টনের জন্য এবং এখানকার মুসলিম নারীদের বাঁদী-দাসীতে পরিণত করে গয়নী নিয়ে যাওয়ার জন্য আসছে। পরিতাপের বিষয়, খাওয়ারিজম শাহ আবুল আকবাস নিজেই এই ভয়ঙ্কর লুটেরাকে ডেকে আনছেন। গয়নীর লুটেরাদের প্রতিরোধ করতে হলে সর্বাগ্রে আমাদেরকে খাওয়ারিজম শাহী খতম করে সেনাশাসন জারি করতে হবে।

আলাফতোগীন সেনাকমান্ডারদের উদ্দেশে বললেন, প্রত্যেক কমান্ডার নিজ নিজ ইউনিটের সেনাদের বলে দাও, দরবেশগণ তোমাদের যে ভাগ্য বদলের কথা বলেছিলো, সেই দরবেশদের হত্যাকারী খুনীরা এখন তোমাদের ভাগ্য বরবাদ করতে আসছে।

ওদিকে হাজারাশীপের সৈন্যদেরকেও সেনাপতি আবু ইসহাক এবং সেনাপতি খমরতাশ একইভাবে গয়নী সুলতান ও আবুল আকবাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ উন্নাদনায় উত্তেজিত করে বিদ্রোহে ইঙ্কন দিলো।

\* \* \*

এই ঘটনার কয়েক দিন পরের ঘটনা। আবুল আকবাসের একান্ত সংবাদবাহক এসে তাকে থবর দিলো, তুর্কিস্তানের কয়েকজন খান আপনার সাথে সাক্ষাৎ করতে এসেছে। তাদের সাথে গভর্নর আলাফতোগীনও রয়েছেন। তারা লেকের পাড়ের বাগানে অপেক্ষা করছেন। গভর্নর আলাফতোগীন তাদের মর্যাদা দেয়ার জন্য মহামান্য শাহকে নিজে তাদের অভ্যর্থনা জানানোর অনুরোধ করেছেন।

খবর শুনে আবুল আবাস তার একান্ত প্রহরীদেরকে সওয়ারী প্রস্তুত করার নির্দেশ দিলেন। এমন সময় নাহিদার কাছে খবর গেলো, বাদশা আবুল আবাস বাইরে কোথাও যাচ্ছেন। তিনি দৌড়ে আবুল আবাসের খাস কামরায় পৌছুলে আবুল আবাস তাকে বললেন তিনি কি উদ্দেশ্যে কোথায় যাচ্ছেন। নাহিদা আবুল আবাসকে বাইরে যেতে নিষেধ করলেন।

“তুর্কিস্তানের মেহমান এসেছে। তাদের সম্মানে আমি নিজে অভ্যর্থনা জানাতে যাচ্ছি। অসুবিধা কী? তাদের সাথে গভর্নর আলাফতোগীন রয়েছেন।”

“না, আপনি যাবেন না। এমনই যদি হতো, আলাফতোগীন দৃত পাঠালো কেন? সে নিজেই তো আসতে পারতো।” উদ্ধিগ্ন কষ্টে আবুল আবাসকে বললেন নাহিদা।

“আরে, এই মহিলাদের নিয়ে যতো সমস্যা। এখানে তুমি সমস্যার কী দেখলে? যাবড়ে যাচ্ছে কেন নাহিদা!”

“আল্লাহর দোহাই লাগে আবুল আবাস! তুমি এখন বাইরে যেয়ো না। আমার মন বলছে, বাইরে কোন বিপদ অপেক্ষা করছে।”

নাহিদা আবুল আবাসের হাত ধরে বললেন, “আবুল আবাস! জীবনে কোনদিন আমি তোমাকে কোথাও যেতে নিষেধ করিনি। আজ তোমাকে করজোড় মিনতি করছি। তুমি বাইরে যেয়ো না। কোন জরুরী কাজের বাহানা করে যাওয়া বাতিল করে দাও।”

“ধূম্রুলি! আমি মহিলা নাকি?”

“না, তুমি মহিলা হবে কেন? পুরুষ হলেও আজ একজন অবলা নারীর কথা রাখো। আজ আমার এই অনুরোধটুকু রক্ষা করো” বলে কেঁদে ফেললেন নাহিদা। আমি বাইরে ভয়ঙ্কর বিপদাশঙ্কা করছি।”

“স্থিত হেসে আবুল আবাস নাহিদার উদ্দেশ্যে বললেন, প্রেমের টানে এতেও উত্তোলন হয়ে যাওয়া ঠিক নয় নাহিদা। আমাকে আমার অবস্থান থেকে নামিয়ে দিও না তুমি! বাইরে ওরা আমার জন্য অপেক্ষা করছে।”

“আবুল আবাসকে বাইরে যাওয়া থেকে বিরত রাখতে না পেরে বিপদাশঙ্কায় নাহিদার হিতাহিত জ্ঞান হারানোর উপক্রম হলো। আবুল আবাস নাহিদাকে পাশ কেটে বাইরে বেরিয়ে পড়লে নাহিদাও দৌড়ে বেরিয়ে এলেন।

ততোক্ষণে আবুল আকবাসকে বহনকারী ঘোড়ার গাড়ী নিরাপত্তা রক্ষীদের ভিড়ে চলে গেছে। উদ্বিগ্ন ও চিন্তিত নাহিদাকে তার একান্ত সেবিকা ও দাসীরা বোঝাতে ও সাজ্জনা দিতে চেষ্টা করলো। কিন্তু নাহিদার উদ্বেগ-উৎকর্ষ ক্রমেই বেড়ে চললো।

এর কিছুক্ষণ পরেই রাজপ্রাসাদের চতুর্দিকে বহুসংখ্যক অশ্বারোহীর দৌড়োবাপের শব্দ শোনা গেলো। সেই সাথে সেনাদের তাকবীর ধ্বনি ভেসে এলো।

আবুল আকবাস হয়তো ফিরে এসেছেন এই আশায় নাহিদা দৌড়ে তার কক্ষ থেকে বেরিয়ে এলেন। কিন্তু বিধি বাম, আসলে এরা ছিলো বিদ্রোহী সেনা, যারা রাজপ্রাসাদকে ঘেরাও করেছিলো। বিদ্রোহী সেনারা শ্রেণান্বয় দিচ্ছিলো, নারীলিঙ্গ খাওয়ারিজম শাহীর পতন হয়েছে, গফনী গোলামকে জাহান্নামে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে, খাওয়ারিজম শাহী আলাফতোগীন জিন্দাবাদ...।

নাহিদার মাথাটা চক্র দিয়ে উঠলো। তিনি মাথা দু'হাতে ধরে কোনমতে নিজের বিছানায় গিয়ে পড়ে গেলেন। ইত্যবসরে রাজপ্রাসাদ দখলের তাওর শুরু হয়ে গেছে। রাজপ্রাসাদের অভ্যন্তরে সর্বথম নৃশংসতার শিকার হলেন আবুল আকবাসের বিশ্বস্ত উজির আবুল হারেস। তাকে নির্মতাবে কুপিয়ে খুন করলো আলাফতোগীনের লেলিয়ে দেয়া সৈন্যরা। তারা আবুল হারেসকে শুধু হত্যা করেই ক্ষান্ত হলো না, তার শরীর থেকে মাথা বিছিন্ন করে ফেললো।

রাজপ্রাসাদের ভেতর-বাইরের সবখানে হাজারাশীপ ও বুখারার সৈন্যরা আসের রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করলো। কিন্তু আলাফতোগীনের নির্দেশে নির্বিচারে হত্যা ও সুটতরাজ থেকে বিরত রইল সৈন্যরা। রাজপ্রাসাদের অভ্যন্তরে আবুল আকবাসের বিশ্বস্ত রাজকর্মচারী ও অনুগত ভূত্যদের খুঁজে খুঁজে বের করে এনে হত্যা করা হলো। রাজধানী জ্বরজানিয়াতে নিযুক্ত সৈন্যদের দু'টি ইউনিট বিদ্রোহী-সেনাদের প্রতিরোধ করার চেষ্টা করেছিলো। কিন্তু তাদের সৈন্যসংখ্যা এতোটাই কম ছিলো যে, বিদ্রোহীরা তাদের সবাইকে ঘেরাও করে অন্তসমর্পণে বাধ্য করল। এরপর যে ডেপুটি সেনাপতির নির্দেশে বিদ্রোহীদের মোকাবেলার জন্য এই ইউনিটের সৈন্যরা প্রতিরোধ ব্যুহ গড়ে তুলেছিলো, তাকে এবং তার অধীনস্থ সকল কমান্ডারের ধরে ধরে হত্যা করলো।

বুখারার গভর্নর আলাফতোগীন বিজয়ী এবং রাজার বেশে রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করলো। সে ছিলো স্বঘোষিত বাদশা। এই বাদশাহ হওয়ার প্রতি ভূরজানিয়া ও খাওয়ারিজমের সাধারণ মানুষের কোনই আগ্রহ ছিলো না। দেশের সাধারণ মানুষ তাকে কখনো রাজার আসনে বসানোর উপযুক্ত মনে করেনি।

রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করে গভর্নর আলাফতোগীন খাওয়ারিজম শাহের রাজকীয় মসনদে আসীন হয়ে ফরমান জারি করল, “দেশব্যাপী ঘোষণা করে দাও, খাওয়ারিজম শাহীর পতন হয়েছে, আজ থেকে আলাফতোগীন খাওয়ারিজমের বাদশা এবং আবুল আকবাস নিহত হয়েছে।”

অবশ্যে নাহিদার আশঙ্কাই সত্ত্বে পরিণ হলো। তুর্কিস্তানের খানের আগমনের মিথ্যা খবর দিয়ে রাজপ্রাসাদ থেকে বাইরে এনে আলাফতোগীনের নির্দেশে বিদ্রোহী সৈন্যরা সরলমতি আবুল আকবাসকে হত্যা করল।

সময়টা ছিলো ৪০৭ হিজরী সনের ১৫ শাওয়াল মোতাবেক ১০১৮ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ মার্চ।

ঐতিহাসিক বায়হাকী ও গারদিজী লিখেছেন, বিদ্রোহী সেনাদের রাজমহলে প্রবেশ করতে দেখে নাহিদার একান্ত কর্মচারী জেবীন- যে প্রকৃতপক্ষে গবণী সুলতানের একজন পরীক্ষিত ও বিশ্বস্ত গোয়েন্দা ছিলো- দৌড়ে নাহিদার কক্ষে প্রবেশ করলো। জেবীন নাহিদার কক্ষে গিয়ে দেখে নাহিদা বিছানায় পড়ে বিলাপ করছে-

“আমি তাকে নিষেধ করেছিলাম, মৃত্যু তাকে ঘরের বাইরে নিয়ে গেলো”। এমতাবস্থায় জেবীন নাহিদার জীবনাশক্ত বোধ করলো। সে নাহিদাকে সাত্ত্বনা দিয়ে বললো, চিন্তা করো না শাহজাদী, যে করেই হোক আমরা তোমাকে গবণী নিয়ে খাওয়ার চেষ্টা করবো। যা ঘটে গেছে এ নিয়ে বিলাপ করে বিদ্রোহী সেনাদের তোমার প্রতি মনোযোগী করো না। বিপদে দৈর্ঘ্য ধরো এবং বুদ্ধিমত্তার সাথে পরিস্থিতির মোকাবেলা করতে স্বাভাবিক হও।”

নাহিদা শরীর থেকে রাজকীয় পোশাক ছুঁড়ে ফেলে অতি সাধারণ সেবিকাদের পোশাক গায়ে জড়িয়ে মাথায় উড়না দিয়ে সাধারণ বেশে প্রাসাদ তাগ করে পালিয়ে খাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলো। এ কাজে তাকে পথপ্রদর্শন করছিলো তারই একান্ত কর্মচারী জেবীন।

সাধারণ সেবিকার রূপ ধারণ করে ছন্দবেশে নিজের কক্ষ ত্যাগের উদ্দেশ্যে  
নাহিদা চোকাঠে পা রাখতেই তার মুখোমুখী হলো আলজৌরী ।

“তোমার যাওয়ারিজম শাহীর রাজত্ব শেষ হয়ে গেছে নাহিদা ! পালাবে  
কোথায় ? বাইরে গেলে বিদ্রোহী সেনাদের হাতে খুন হবে, নয়তো উঙ্কেজিত  
সৈন্যরা তোমাকে টেনে ছিড়ে ফেলবে ।” ভর্তসনামাখা কঠে বললো আলজৌরী ।

“শোন নাহিদা, আমার কথা মেনে আমার সাথে এসো । আমি হারেমে  
তোমার নিরাপত্তার ব্যবস্থা করে দিচ্ছি । ওখানে থাকলে তোমাকে কেউ কিছু  
বলবে না ।

আর ভালো চাইলে, তুমি আমার বাবাকে বিয়ে করতে পারো । এখন তো  
আর তোমার পক্ষে গয়নী ফিরে যাওয়া সম্ভব নয় । এখানে বন্দী থাকার চেয়ে  
আমার বাবার চতুর্থ স্ত্রী হয়ে থাকা অনেক ভালো হবে ।”

“আলজৌরী !” ক্ষুক্ষ কঠে বললেন নাহিদা । আমার গয়নী ফেরার জন্য  
মোটেও তাড়া নেই । অচিরেই দেখতে পাবে গয়নীর সিংহের দল এখানে পৌছে  
যাবে... ।”

হঠাতে ব্যাঘ শৃঙ্খ ধারণ করে গলা চড়িয়ে আলজৌরীর উদ্দেশ্যে নাহিদা  
বললো-

“শয়তানী, সরে যা আমার সামনে থেকে । আমি এখনো শাহজাদী ।  
গয়নীর সিংহ সুলতান মাহমুদের বোন আমি । এখনো আমার ভাই মরে  
যায়নি ।

ভুলে গেছো তুমি কার মেয়ে ? এক নিমকহারাম সেনাপতির মেয়ে তুমি ।  
ক্ষমতার উদয় লিঙ্গা যাকে পরিগতির কথা ভুলিয়ে দিয়েছে । যাও, গিয়ে ওদের  
বলো, সাহস থাকলে ওরা যেনো আমাকে হত্যা করে, নয়তো জেলখানায় বন্দী  
করে । এরপর তুমি নিজ চোখেই বাপের নিকমহারামীর পরিণাম এবং  
ব্যোব্যিত শাহের ভয়ঙ্কর পরিগতি দেখতে পাবে ।”

গুঁড়ে গুঁড়ে তোকের কোনে বিদ্রোহী হাসি এবং বাঁকা চাহনী দিয়ে আলজৌরী সেখান  
থেকে চলে এলো ।

এই ফাঁকে জেবীন নাহিদাকে বললো, আসুন শাহজাদী, আমরা এই ফাঁকে  
এখান থেকে বের হয়ে যাওয়ার চেষ্টা করি ।

“না জেবীন! আমি চুপিসারে পালিয়ে যাবো না। আমি ধোকাবাজ প্রতারক, নিমকহারাম চক্রান্তকারী খাওয়ারিজম শাহীর মুখোমুখী হবো।”

একথা বলে ঝড়ের বেগে কক্ষ ছেড়ে বাইরের দিকে পা বাড়ালেন নাহিদা। কিন্তু জেবীনকে তার পিছু পিছু দৌড়াতে দেখে দাঁড়িয়ে বললেন, “জেবীন! আমার ভবিষ্যৎ আল্লাহর উপর ছেড়ে দাও। তুমি আমার ধারে কাছে থাকলে ওরা তোমাকে জ্যোত্র রাখবে না। তুমি বরং খবর নাও, এখানকার পরিস্থিতির সংবাদ দিতে কেউ গয়নী রওনা হয়ে গেছে কি না। যদি কাউকে ঝুঁজে না পাও, তাহলে নিজেই চলে যাও। আস্তাবল থেকে ঘোড়া নিয়ে নাও।”

\* \* \*

খাওয়ারিজম শাহের মসনদে বসে আলাফতোগীন নানা শাহী ফরমান ঘোষণা করছিলো, যে মসনদে কয়েক ঘটা আগেও বসেছিলেন আবুল আকবাস। আলাফতোগীনের দরবারে কিছু লোক দু'হাত জড়ো করে দাঁড়িয়ে ছিলো। এদের অধিকাংশই ছিলো সেনাবাহিনীর লোক। আবুল আকবাসের শাসনব্যবস্থাপনায় জড়িত কেউ সেখানে ছিলো না। আলাফতোগীনের দরবারে কিছুটা শোরগোলের মতো নিয়ন্ত্রণহীন অবস্থা বিরাজ করছিল। হঠাৎ দরবারে পিনপতন নীরবতা নেমে এলো। সবাই অবাক বিশ্বায়ে দেখতে পেলো মানুষের ভিড় ঠেলে সদ্যবিধবা রাণী নাহিদা বাঘিনীমৃতি ধারণ করে আলাফতোগীনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন।

“ওহ, নাহিদা! নাহিদার দিকে তাকিয়ে বললো আলাফতোগীন। তোমার ব্যাপারে আমি কোন কিছু চিন্তা করারই অবসর পাইনি।

“নাহিদা, আমি জানি, তুমি প্রাণ ভিক্ষা চাইতে এসেছো। তুমি হয়তো বুঝতে পারোনি, তোমার স্বাধীনকে কিন্তু তুমিই হত্যা করিয়েছো। তুমি তার উপর ছলনার জাদু চালিয়ে তাকে গয়নীর কেনা গোলামে পরিণত করেছিলে। খাওয়ারিজমের স্বাধীনচেতা জনতা, খাওয়ারিজমের আত্মর্যাবোধসম্পন্ন সেনাবাহিনী কোন বহির্দেশের গোলামী কখনো বরদাশত করে না। দেখতেই পাচ্ছে, সমগ্র জাতি ও সৈন্যরা মিলিত হয়ে আমাকে বুখারা থেকে টেনে এনে এই মসনদে বসিয়েছে। এখন আমি তাদের ইচ্ছাতেই শুধু এই মসনদ ছাড়তে

পারি। জাতি আমার উপর যে শুরুদায়িত্ব অর্পণ করছে, যেকোন মূল্যে এই দায়িত্ব আমি পালন করবো।”

“প্রাণ ডিক্ষা নয়, আমি প্রাণ দিতে এসেছি বেঙ্গমান!” হংকার দিয়ে বললেন নাহিদা।

তোমার জানা উচিত, আমি যা করেছি, তা আল্লাহ ও এখানকার সাধারণ মুসলমানদের ইমানের সার্থে করেছি। তাদের ধর্ম, ইজ্জত, সম্মতি ও মর্যাদার সাথে করেছি।

বেঙ্গমান! তুমি নিজে যেমন পবিত্র কুরআনের অসম্মান করেছো, ফিরিসিদের দিয়েও পবিত্র কুরআনের অবমাননা করিয়েছো। আল্লাহ সবকিছু জানেন, সবকিছু দেখেন, আল্লাহর কাছে তুমি কিছুই লুকোতে পারবে না।

বানিয়ে বানিয়ে মিথ্যার ফুলবুরি দিয়ে সরলপ্রাণ জনতা ও সৈন্যদের বিআন্ত করতে পারলেও অচিরেই জেনে যাবে, জনতা তোমাকে এখানে আনেনি, তুমি জনতা ও সৈন্যদেরকে ধোকা দিয়ে এখানে এসেছো। তুমি যদি জাতির কাছে এতোটাই প্রিয় ব্যক্তি হতে আর এতোটাই সশান্মু ব্যক্তি হতে, তাহলে প্রতিটি গলি আর প্রতিটি বাড়ির সামনে সৈন্য মোতায়েন করেছো কেন? শহরের লোকদেরকে তোমাকে অভ্যর্থনা জানানোর সুযোগ দিচ্ছে না কেন? তোমার এই রাজকীয় অভিষেকের দিনে শহরে মৃত্যুর মাত্রম কেন? শহরের মানুষ তোমার বিজয়ের জয়ধননী করছে না কেন? শহরের চতুর্দিকে সেনারা টহুল দিচ্ছে কেন?”

হঠাতে দরবারে এক কোন থেকে গর্জন শোনা গেলো, “হঁশ করে কথা বলো মহিলা। তুমি কি জানো না, খাওয়ারিজম শাহের সামনে তুমি দাঁড়িয়ে আছো?”

“খাওয়ারিজম শাহ! সে তো ছিলো আমার স্বামী। এই খুনীরা আমার স্বামীকে হত্যা করেছো। কিন্তু আমার আল্লাহ মরেননি। তিনি অবশ্যই এই খুনের প্রতিশোধ নেবেন।

আলাফতোগীনের উদ্দেশ্যে সাহিদা চিৎকার করে বললো, আলাফতোগীন! সেনাবাহিনীর সহযোগিতা ও ছত্রচায়ায় তুমি খাওয়ারিজমের বাদশাহী করার মতলব নিয়ে যদি এই মসনদ দখল করে থাকো, তবে আমি তোমাকে হঁশিয়ার করে দিচ্ছি, অচিরেই তোমার এই দিবাস্পন্ন কর্পুরের মতো উবে যাবে। আর যে ছাতার আশ্রয়ে ক্ষমতার আশায় খুনের নেশায় তুমি উন্নাত হয়ে আছো, অচিরেই

এমন তুফান দেখতে পাবে, যাতে তোমার এসব আশ্রয় খড়কুটোর মতো  
বাতাসে উড়িয়ে নিয়ে যাবে, কোন চিহ্ন অবশিষ্ট থাকবে না।

খাওয়ারিজম শাহের মসনদ একটি পবিত্র মসনদ। মসনদের যোগ্য ব্যক্তি  
ছাড়া এখানে কাঠো বসার অধিকার নেই। তুমি মাঝুনী খান্দানের জুতা বহন  
করে তোষামোদী করে গভর্নরের পদে পৌছেছিলো। মাঝুনী খান্দান তোমার  
চক্রান্তকে আমলে না নিয়ে তোমাকে বুখারার গভর্নর পদে অধিষ্ঠিত  
করেছিলো। কিন্তু তুমি সেই পুরক্ষারের মর্যাদা রাখতে পারলে না। তোমার  
সীমাহীন লোড, হিংসা, উচ্চাকাঙ্ক্ষা আর বেঙ্গানী তোমার ভাগ্যে আজীবন  
কয়েদখানার অঙ্ককার প্রকোষ্ঠে পঁচে পঁচে দুর্গন্ধ ছাড়ানোর পরিণতি লিখে  
দিয়েছে। এটাই হয়তো তোমাকে বরণ করতে হবে।”

“নিয়ে যাও ওকে! বেচারী পাগল হয়ে গেছে। ওকে তার নিজস্ব কক্ষে  
রেখে বাইরে প্রহরা বসিয়ে দাও। তার নিজস্ব শয়ন কক্ষেই তাকে নজরবন্দী  
করে রাখো। আমি সুলতান মাহমুদকে লিখে পাঠাবো, তুমি যদি  
খাওয়ারিজমের উপর আগ্রাসন চালাও, তাহলে তোমার বোনের খেতলানো দেহ  
দেখতে পাবে। নাহিদাকে তোমরা যুক্তিপণ হিসেবে রাখতে পারো। তার উপর  
কোন ধরনের অত্যাচার করো না। মানুষ যাতে একথা বলতে না পাবে,  
খাওয়ারিজম শাহী আলাফতোগীন এক বিপন্ন বিধবা অসহায় নারীর উপর  
জুলুম করেছে।

‘উবিষ্যৎ প্রজন্ম তোমার কবরের উপরেও থুতু ছিটাবে।’ ভর্সনামাখা কষ্টে  
বললেন নাহিদা। যে সেনাবাহিনীর জন্ম হয়েছিলো কাফের-বেঙ্গানদের বিরুদ্ধে  
ইমানদারদের পক্ষ হয়ে লড়াই করার জন্য, সেই সেনাদেরকে তুমি নিজ ভূমি  
জয় করার ভাতৃঘাতি হানাহানিতে প্ররোচিত করেছো। যে সেনারা সব সময়  
উৎকর্ণ থাকতো নির্দেশের জন্য, তাদেরকে তুমি এখন শাসক বানিয়ে দিয়েছো,  
এখন আর এই সেনাবাহিনীর একদিনও যুদ্ধ করার যোগ্যতা নেই।

অতঃপর উর্ধ্বতন কোন সেনাপতির নির্দেশে কয়েকজন সৈন্য নাহিদাকে  
দু'দিক থেকে হাত ধরে তার কক্ষে ঠেলে দিয়ে বাইরে থেকে দরজা বন্ধ করে  
দিল।

সেই সময়কার বিখ্যাত ঐতিহাসিক আলফজলী তার লেখা কিতাব  
‘আচারুল্ল উজারা’ গ্রন্থে লিখেছেন-

“চার মাস পর্যন্ত আলাফতোগীন খাওয়ারিজমে চরম দুঃশাসন চালায়। গোটা খাওয়ারিজমব্যাপী সে আসের রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করে এবং নিজেকে ইসলামের পতাকাবাহী ও ইসলামের সেবক ঘোষণা করে। কিন্তু কারো মুখ থেকে যদি তার বিরুদ্ধে বিনুমতি বিরোধিতামূলক শব্দ বের হতো, তাকেই ধরে এনে হত্যা করতো।

দেশব্যাপী আবাসিক এলাকায় সারাক্ষণ সেনাবাহিনী টহল দিতো। কারো পক্ষ থেকে বিরোধিতার সামান্য সংশয় জাগ্রত হলেই তাকে ধরে এনে হত্যা করতো। ফলে দিন দিন সাধারণ মানুষের জীবন, মান সংকীর্ণ হয়ে এলো। খাদ্যসামগ্রীর দাম আকাশচূম্বি হলো। জনজীবনে নেমে এলো চরম হতাশা। কিন্তু সেনাবাহিনীর লোকেরা রাজকীয় জীবনযাপনে অভ্যন্তর হয়ে উঠলো। দেশের উন্নত ও শ্রেষ্ঠ সব উৎপাদন তাদের ভোগ্যপণ্যে পরিণত হলো। লাখ লাখ মুসলিম জনতাকে সেনাবাহিনী তাদের গোলামে পরিণত করলো।

প্রশ্ন হতে পারে দীর্ঘ চারমাস পর্যন্ত সুলতান মাহমুদ কী করলেন? কারণ, আলাফতোগীনের সফল অভ্যন্তরান্তের খবর তো তিনি চতুর্থ দিনেই পেয়ে গিয়েছিলেন।

সুলতান মাহমুদের সামনে তখন দু'টি সমস্যা ছিল।

প্রথমত কাশীর বিপর্যস্তের পর সৈন্যঘাটতি তখনো পূরণ করা সম্ভব হয়ে ওঠেনি। সেই সাথে সুলতান এমন বিপুল শক্তি নিয়ে খাওয়ারিজম আক্রমণ করতে চাচ্ছিলেন, যাতে তিনি এক অভিযানেই গোটা খাওয়ারিজম কজায় নিয়ে নিতে পারেন। দ্বিতীয়ত তিনি তার ছোট বোন নাহিদাকে উদ্ধার করে নিয়ে আসতে চাচ্ছিলেন, যাতে আক্রমণের সময় প্রতিপক্ষ নাহিদার সামনে মানবিক কোন দুর্বলতা উত্থাপন করে তাকে মানসিকভাবে ঘায়েল করতে না পারে।

‘আছারুল উজারা’ গ্রন্থে লেখা হয়েছে, নাহিদাকে জীবন্ত উদ্ধারের ব্যাপারটি সুলতান তার উপদেষ্টা পরিষদে এই বলে উত্থাপন করেন—“সম্মানিত উপদেষ্টাবৃন্দ! আমার ভগ্নিপতি ও অগণিত নিরপরাধ মুসলমান হত্যার প্রতিশোধের আগুন জ্বলছে আমার বুকে। আমর আদরের ছোট বোনটি আবারো বৈধব্যের শিকার হয়েছে। এখন যদি আমি এদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধমূলক অভিযানের নির্দেশ দিই, তাহলে সেটি আমার ব্যক্তিগত সার্থোদ্ধারের জন্য বলে অভিহিত হওয়ার আশঙ্কা আছে। ইতিহাস হয়তো বলবে, আমি ব্যক্তিগত হিংসা

চরিতার্থ করতে গিয়ে দুটি ভাত্তপ্রতীম মুসলিম বাহিনীকে সংঘাতে লিঙ্গ করে খুন ঝরিয়েছি। আপনারা গোটা ব্যাপারটি সামনে রেখে আমার করণীয় সম্পর্কে পরামর্শ দিন। এই বিদ্রোহ ফিরিঙ্গীরা ঘটিয়েছে এবং একটি সুন্দর শাস্তিপূর্ণ মুসলিম দেশকে ধ্রংসন্তুপে পরিণত করেছে। কিছুদিন পরে হয়তো দেখা যাবে, গোটা খাওয়ারিজমে ফিরিঙ্গীরা ছেয়ে গেছে। এই অঙ্গলে ফিরিঙ্গীদের উপস্থিতি গয়নী ও ইসলামের জন্য কেমন হতে পারে, এ বিষয়টি আপনাদের অভিজ্ঞাত নয়।

“নাহিদা আমাদের গর্বের ধন, তার সাথে গয়নীর ইজ্জত-আক্রম প্রশ্ন জড়িত।” বললেন সুলতানের উজির। আমাদের প্রথম কাজ হবে তাকে ওখান থেকে বের করে আনা। আমরা আগে আক্রমণ করলে তার খুন হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। তাছাড়া আমরা যে কোন ধরনের আক্রমণাত্মক ভূমিকা নিলে তার সাথে দুর্ব্যবহার করা হতে পারে। আমরা আলাফতোগীনকে পয়গাম দিতে পারি, সে যেন নাহিদাকে সমস্মানে গয়নী পাঠিয়ে দেয়। যদি সে তা না করতে চায়, তাহলে কমাড়ো পাঠিয়ে আগে তাকে বন্দীদশা থেকে উকারের ব্যবস্থা করা হোক। এরপর খাওয়ারিজমে সেনাভিযানের পরিকল্পনা প্রস্তুত করা হবে।”

উপদেষ্টাদের সবাই উজিরের কথা সমর্থন করলেন। অতঃপর আরো কিছু ব্যাপারে শলাপরামর্শের পর সর্বসম্মতিক্রমে একটি পরিকল্পনা তৈরী করা হলো। আলাফতোগীনের নামে নাহিদাকে সমস্মানে গয়নী পাঠিয়ে দেয়ার প্রস্তাব করে একটি পয়গাম পাঠানো হলো।

\* \* \*

গয়নী ও খাওয়ারিজমের মধ্যে দূরত্ব তখন প্রায় পাঁচশত মাইল। তনুধ্যে অধিকাংশ এলাকা পাহাড়ী আর বাকীটা মরুময় পাথুরে এলাকা। মরু এলাকাকে তখনকার দিনে ‘সাহরায়ে গায’ বলে ডাকা হতো।

দৃতের যেতে আসতে প্রায় কুড়ি দিন সময় লেগে গেলো। নাহিদাকে ফেরত পাঠানোর পয়গামের জবাবে আলাফতোগীন বললো, নাহিদার মুক্তি পেতে হলে গয়নী সুলতান তাকে খাওয়ারিজম শাহ বলে স্বীকৃতি দিতে হবে এবং তার সাথে কোন ধরনের যুদ্ধ করা হবে না। এই মর্মে অঙ্গীকারনামায় স্বাক্ষর করতে হবে।”

নাহিদাকে নিরাপদে ও সস্থানে রাখা হয়েছে, তা প্রমাণ করার জন্য আলাফতোগীন নিজে গয়নীর দৃতকে নাহিদার আবক্ষ কক্ষ দেখিয়ে দেয় এবং দৃতের সাথে নাহিদার সাক্ষাত করায়। আলাফতোগীনের নির্দেশে বন্দী নাহিদার কক্ষ খুলে দৃতের সাথে তার কথা বলার সুযোগ দেয়া হয়।

নাহিদার সাথে দৃতের সাক্ষাত পরবর্তীতে গয়নীর প্রেরিত কমান্ডোদের জন্য উপকারে আসে। নাহিদার একান্ত কর্মচারী জেবীন জুরজানিয়ার পতন ও আবুল আব্বাসের নিহত হওয়ার সংবাদ নিয়ে নাহিদার নির্দেশে গয়নী এসে পড়েছিলো। সে জুরজানিয়ার রাজপ্রাসাদের সকল নাড়ি-নক্ষত্র সম্পর্কে ওয়াকিবহাল ছিল।

নাহিদাকে উদ্ধারের জন্য পাঁচজন কমান্ডো নির্বাচিত করা হলো। তন্মধ্যে জেবীন ছিলো পঞ্চম।

\* \* \*

পাঁচ কমান্ডো অস্বাভাবিক দ্রুতগতিতে জুরজানিয়া পৌছে গেল। তারা জুরজানিয়া গিয়ে একটি সরাইখানায় রাত যাপন করলো। পাঁচজনের পাঁচটি ঘোড়া ছাড়াও তারা একটি অতিরিক্ত ঘোড়াও সাথে নিল।

রাজধানী জুরজানিয়া ও আবুল আব্বাসের রাজপ্রাসাদের অভ্যন্তরীণ অবস্থা সম্পর্কে জ্ঞাত জেবীন এই কমান্ডো অভিযানে পথপ্রদর্শকের ভূমিকা পালন করল। সে এক কমান্ডোকে সাথে নিয়ে শহরের ভেতরে ঢুকে রাজপ্রাসাদের আঙিনায় চলে এলো। তারা আসার সময় শহরময় সকল রাস্তায় বিদ্রোহী দখলদার সেনাদের টহলরত অবস্থায় দেখতে পেল। তারা সারাদিন ছন্দবেশে শহর ও রাজপ্রাসাদের বাইরের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে আবার সরাইখানায় ফিরে গেল।

পরদিন গয়নীর পাঁচ কমান্ডো যখন সরাইখানা থেকে বের হলো, তখন তাদের পরনে ছিলো খাওয়ারিজম বাহিনীর উর্দি। তাদের হাতের বল্লমে খাওয়ারিজম সেনাদের পতাকা। এই পতাকা ছিলো খাওয়ারিজম বাহিনীর বিশেষ ইউনিটের প্রতীক। তারা বিশেষ বাহিনীর বিশেষ সৈন্য হিসেবে মাথা উঁচু করে গর্বিত ভঙ্গিতে পথ অতিক্রম করছিলো। প্রত্যেকেই ছিল অশ্঵ারোহী এবং পাঁচজনের সাথে একটি অতিরিক্ত ঘোড়াও জিনবাঁধা ছিলো। তাদের

ঘোড়াগুলোর চাল-চলনেই বোৱা যাচ্ছিল এগুলো সেনাবাহিনীৰ বিশেষ ইউনিটেৰ দীৰ্ঘ প্ৰশিক্ষিত ঘোড়া। শহৱেৰ পথ অতিক্ৰম কৱাৰ সময় টহলৱত অশ্বারোহী সৈন্যদেৱ সাথেও তাদেৱ সাক্ষাত হলো। তাৱা একই বাহিনীৰ সমগ্ৰোত্তৰ ভাইয়েৰ মতো স্বিত হাসি দিয়ে তাদেৱই পৱিচিত নিয়মে সংজ্ঞণ জানালো।

শহৱেৰ বাসিন্দাৱা এমনিতেই সেনাশাসনে ভীত-বিহুল ছিল। তদুপৰি বিশেষ বাহিনীৰ বিশেষ ঘোড়ায় আৱোহী সৈন্যদেৱ দেখে পথ ছেড়ে পাশে দাঁড়িয়ে তাদেৱ যাবাৰ পথ কৱে দিছিল এবং সম্মানসূচক সালাম দিছিলো। বস্তুত এই পাঁচ কমান্ডো ছিলো গয়নী বাহিনীৰ বিশেষ দলেৱ সদস্য। তাদেৱ বহনকাৰী ঘোড়াগুলোও ছিল প্ৰশিক্ষিত। এ ছাড়া তাৱা খাওয়াৱিজম বাহিনীৰ পোশাক ও পতাকাধাৰী বলুম ধাৰণ কৱেছিলো বলে বিশেষ বাহিনীৰ মতো কৱে এগিয়ে যেতে তাদেৱ কোন বেগ পেতে হয়নি। কাৱণ, তাৱা প্ৰত্যেকেই ছিলো উপযুক্ত ও প্ৰশিক্ষিত। তাছাড়া তাৱা আগেই জেনে নিয়েছিলো খাওয়াৱিজমেৰ বিশেষ বাহিনীৰ রীতিনীতি।

জেবীনেৰ দেখানো পথে অনায়াসেই গয়নীৰ পাঁচ কমান্ডো আবুল আবুসেৱ রাজপ্রাসাদেৱ সদৱ দৱজায় চলে গেল। এই পাঁচ কমান্ডো ভয়ানক অভিযানে নেমেছিলো। তাৱা জানতো, ধৰা পড়লে তাদেৱ কী ভয়ঙ্কৰ শাস্তিৰ সমুদ্ধীন হতে হবে। কিন্তু সকল ভয়-শক্তাকে দু'পায়ে দলে তাৱা সদৱ দৱজায় গিয়ে রাজমহলেৰ ভেতৱে প্ৰবেশ কৱলো।

রাজমহলেৰ প্ৰহৱীৱা এই কমান্ডোদেৱকে তাদেৱ বাহিনীৰ বিশেষ ইউনিটেৰ সদস্য মনে কৱে কোন ধৰনেৰ জিজ্ঞাসাৰাদ না কৱে পথ ছেড়ে দিল। জেবীন তাৱা সঙ্গীদেৱকে একটি ঘোৱা অঙ্কুকাৰ পথে নাহিদাৰ কক্ষে নিয়ে গেল। মহলেৰ ভেতৱেও দখলদাৰ সেনাদেৱকে কয়েক জায়গায় সতৰ্ক প্ৰহৱা দিতে তাদেৱ নজৱে পড়ল। কিন্তু গয়নীৰ এই অকুতোভয় কমান্ডোৱা আল্লাহ্ৰ নাম নিয়ে সামনে অঘসৱ হলো।

রাজপ্রাসাদেৱ একটি জায়গায় গিয়ে জেবীন সঙ্গীদেৱ দাঢ় কৱিয়ে অতিৰিক্ত ঘোড়াটি ও একজন সঙ্গীকে নিয়ে আৱো এগিয়ে গিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল।

জেবীন ও তাৱা সঙ্গী ঘোড়া থেকে নেমে নাহিদাৰ কক্ষেৰ সঙ্গে লাগোয়া সেবিকাৱ কক্ষে প্ৰবেশ কৱল। কক্ষেৰ সামনে প্ৰহৱী দাঢ়ানো। এৱ পৱেই নাহিদাৰ কক্ষ। কক্ষেৰ সামনে দাঁড়িয়ে জেবীন স্থানীয় ভাষায় প্ৰহৱীদেৱকে

বললো, “দরজা খোল, বন্দী মহিলাকে শাহে থাওয়ারিজম আলাফতোগীনের একটি পয়গাম শোনাতে হবে।”

প্রহরী দরজা খুলে দিতেই চকিতে তারা দু’জন প্রহরীকে টেনে কক্ষের ভিতরে নিয়ে দরজা বন্ধ করে দিল এবং তরবারীর আগা প্রহরীদের বুকে ধরে তার গায়ের উর্দি খুলতে বাধ্য করলো। এরপর কাপড় দিয়ে প্রহরীদের হাত-পা বেঁধে তাদের মুখে কাপড় ঢেঁজে পিঠমোড়া করে বেধে মেঝেতে উপুড় করে ফেলে রাখল। সেই সাথে বললো, আমরা গয়নীর কমান্ডো, একটু শব্দ করবে তো এক আঘাতেই মেরে ফেলবো।

প্রহরীর গা থেকে খুলে নেয়া একটি উর্দি নাহিদাকে দিয়ে সেটি দ্রুত পরে নেয়ার জন্য অনুরোধ করল দুই কমান্ডো।

মুহূর্তের মধ্যে নাহিদা প্রহরীর উর্দি পরে সৈনিকের বেশে তাদের সাথে বাইরে বেরিয়ে এলো। কমান্ডো দু’জন সেই কক্ষ থেকে বের হয়ে বাইরে থেকে ছিটকিনি লাগিয়ে দিয়ে দ্রুত এসে অশ্঵ারোহণ করল এবং নাহিদাকে সাথে থাকা অতিরিক্ত ঘোড়াটিতে সওয়ার হওয়ার জন্য ইশারা করল।

নাহিদা ছিলেন অশ্বারোহণে অভ্যন্ত এবং প্রশিক্ষিত। কমান্ডোদের ইশারা পেতেই তিনি এক লাফে দক্ষ সৈনিকের মতোই ঘোড়ায় সওয়ার হলেন। এরা কয়েক মুহূর্তের মধ্যে এসে দাঁড়িয়ে থাকা তাদের সঙ্গীদের সাথে মিলিত হয়ে বিনা বাধায় সদর দরজা পেরিয়ে আসতে সক্ষম হলো।

ফেরার পথে শহরের পথ অতিক্রম করার সময় আগের মতোই তাদের চাল ছিলো বিশেষ বাহিনীর মতো। খুব দৃঢ়তার সাথেই তারা মূল শহর থেকে বেরিয়ে আসতে সক্ষম হলো। তারা যখন শহরের সীমানায় দাঁড়িয়ে গাছগাছালীর আড়ালে এসে পড়ল, তখন সবাই এক সাথে উর্ধ্বস্থাসে ঘোড়া হাঁকালো।

নাহিদাও প্রশিক্ষিত কমান্ডোদের সাথে সমানতালে অশ্ব হাঁকিয়ে অগ্রসর হচ্ছিলেন। তিনি অভিজ্ঞ কমান্ডোদের মোটেও অনুভব করতে দেননি, তিনি নিতান্তই একজন অবলা নারী। তিনি কমান্ডোদের মতোই সমানতালে এই দৃঃসাহসী অভিযানে নারীত্বের সকল দুর্বলতা ঝেড়ে ফেলে অশ্ব ছোটালেন। এই অভিযানে তিনিও কমান্ডোদেরই একজন সঙ্গী।

\* \* \*

ইত্যবসরে সুলতান মাহমুদ সৈন্য ঘাটতি অনেকাংশেই দূর করে ফেলেছিলেন। কয়েক মাস ধারত মসজিদের ইমাম সাহেবদের মাধ্যমে জুমআর দিনে ঘোষণা করা হচ্ছিলো, রাষ্ট্রের প্রয়োজন ও দীনের সার্থে সেনাবাহিনীতে স্বেচ্ছাসেবকের তীব্র প্রয়োজন দেখা দিয়েছে।

ইমামদের এই ঘোষণার ফলে হাজার হাজার তরঙ্গ যুবক স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে সেনাবাহিনীতে ভর্তি হয়। স্বেচ্ছাসেবকরা প্রত্যেকেই নিজের ব্যবহার্য ঘোড়া কিংবা উট সাথে নিয়ে এসেছিল। যারা সশরীরে স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে যোগদান করতে পারেনি, তারা তাদের উট কিংবা ঘোড়া সেনাবাহিনীর প্রয়োজন মিটানোর জন্য দিয়ে দিয়েছিল।

প্রস্তুতি সম্পন্ন করে সুলতান মাহমুদ যখন খাওয়ারিজমের বিরুদ্ধে অভিযানের নির্দেশ দিলেন, তখন তার সেনাসদস্যের সংখ্যা অশ্বারোহী ও পদাতিক মিলিয়ে এক লাখের উপরে এবং প্রশিক্ষিত জঙ্গী হাতির সংখ্যা পাঁচশতেরও বেশী।

সুলতান তাঁর সৈন্যদের বলখ পর্যন্ত নিয়ে থামতে বললেন। বলখে পৌছার পর তার সামনে ছিলো বিশাল বিত্তীর্ণ এলাকাব্যাপী মরুময় অঞ্চল। মরুময় বিজন এলাকার যাত্রাপথের দুর্ভেগ লাঘবের জন্য সুলতান পূর্ব খেকেই বিজন এলাকা দিয়ে প্রবাহিত তুরমুজ নামক স্থানে নদীর তীরে বিশ হাজার বড় নৌকা তৈরী করিয়ে রেখেছিলেন। অকসাস নামক এই নদীর প্রবাহ ছিলো খাওয়ারিজমের দিকে।

সুলতানের গোটা বাহিনী তাদের হাতি, ঘোড়া, উট, সৈন্য তথা আসবাবপত্র ও যুদ্ধ সরঞ্জামসহ বিশ হাজার জাহাজবাহী নৌকায় বোৰাই করা হলো।

নদীর ভাটির প্রবাহের সাথে বিশাল এই নৌকা বহর এগিয়ে চলল। এই নদীর ইতিহাসে এটিই ছিল কোন রাজশাস্ত্রির সবচেয়ে বড় সেনাভিয়ান ও নৌমহড়া।

সুলতানের এই নৌবহর হাজারাশীল উপকূল অতিক্রম করে খাওয়ারিজমের রাজধানী জুরজানিয়ার অদূরে গিয়ে যাত্রাবিরতি করলো। সৈন্যরা নৌবহর থেকে নেমে ডাঙায় শিবির স্থাপন করলো।

ଇତିହସିକଗଣ ଲିଖେଛେ, ଦଖଲଦାର ଆଲାଫତୋଗୀନେର କାହେ ସୁଲତାନ ମାହମୂଦେର ବିଶାଳ ନୌବହର ଓ ସେନାସମାବେଶେର ଥବର ଗେଲୋ । ତଥନ ଅନାକ୍ରମଣ ଚୂକି କରାର ଜନ୍ୟ ଏକଜନ ଦୃତକେ ଦିଯେ ସୁଲତାନ ମାହମୂଦେର କାହେ ପୟଗାମ ପାଠାଲୋ ।

କିନ୍ତୁ କୁନ୍କ ସୁଲତାନ ଆଲାଫତୋଗୀନେର ସନ୍ଧିପ୍ରତ୍ନାବ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରଲେନ । ସେଇ ସାଥେ ତିନି ଏମନ କିନ୍ତୁ କଠିନ ଶର୍ତ୍ତେ ଉପ୍ଲାଖ କରେ ସନ୍ଧିପ୍ରତ୍ନାବ ଫିରିଯେ ଦିଲେନ, ଯାର ଫଳେ ଆଲାଫତୋଗୀନ ଘାବଡ଼େ ଗେଲୋ । ଅଗତ୍ୟାୟ ମୋକାବେଲାଯ ପ୍ରବୃତ୍ତ ହୋଇଥାର ଜନ୍ୟ ଆଲାଫତୋଗୀନ ଗୋଟା ଖାଓୟାରିଜମେର ସୈନ୍ୟଦେର ଏକ ଜାୟଗାୟ ଜଡ଼ୋ କରେ ଦେବେ ତାଦେର ସଂଖ୍ୟା ମାତ୍ର ପଞ୍ଚଶ ହାଜାର ।

ଦଖଲଦାର ଆଲାଫତୋଗୀନ ସେନାବାହିନୀର ସବଚେଯ ଯୋଗ୍ୟ ଓ ଅଭିଜ୍ଞ ପାଂଚ-ଛୟଙ୍କ ସେନାପତିକେ ହତ୍ୟା କରିଯେଛିଲୋ ଶୁଦ୍ଧ ଆବୁଲ ହାରେସ ଓ ଆବୁଲ ଆବାସେର ପ୍ରତି ଆନୁଗତ୍ୟେ ଅପରାଧେ । ତାହାଡ଼ା ସେନାବାହିନୀର ବହୁ ତେଜଶ୍ଵି କମାନ୍ଦାରକେଓ ବିଦ୍ରୋହେର ଆଶକ୍ଷାୟ ଆଲାଫତୋଗୀନ ହୟ ଅନ୍ତରୀଣ, ନୟତୋ ହତ୍ୟା କରିଯେ ଫେଲେଛିଲୋ । ଫଳେ ଖାଓୟାରିଜମ ବାହିନୀତେ ସୁଲତାନେର ବିରୁଦ୍ଧେ ଦାଢ଼ାନୋର ମତୋ ଯୋଗ୍ୟ ସେନାପତି ଓ କମାନ୍ଦାରେ ଅଭାବ ଦେଖା ଦେଯ । ସାରିକ ଅବସ୍ଥା ଆନ୍ଦାଜ କରତେ ପେରେ ଆଲାଫତୋଗୀନ ପ୍ରମାଦ ଶୁଣିତେ ଶୁରୁ କରେ ।

କିନ୍ତୁ ପରାଜ୍ୟେର ପରିଣତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭୟାବହ ହବେ- ଏଟା ବୋରାର ପର ଆଲାଫତୋଗୀନେର ଅନୁସାରୀରା ମରିଯା ହେଁ ମୋକାବେଲାଯ ପ୍ରବୃତ୍ତ ହୟ । ଯୁଦ୍ଧେର ପ୍ରଥମ ଦିକ୍ରେ ମୋକାବେଲା ସୁଲତାନେର ଚଢ଼ା ମୂଳ୍ୟ ଦିତେ ହୟ ।

ସୁଲତାନେର ଅଗ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ବାହିନୀ ସବଚେଯେ ଅଭିଜ୍ଞ ଏବଂ ପ୍ରଧାନ ସେନାପତି ଆବୁ ଆଦୁଲ୍ଲାହ ମୁହାମ୍ମଦ ଆଲତାଟିର ନେତୃତ୍ୱେ ମୂଲଶିବିର ଥେକେ ଅନେକଟାଇ ସାମନେ ଅବସ୍ଥାନ ନିଯେଛିଲୋ ।

ଆଲତାଟିର ସୈନ୍ୟରା ସଥନ ଫଜରେର ନାମାଯେର ଜାମାତେ ଶରୀକ ହଲୋ ଏବଂ ସକଳ ସୈନ୍ୟ ଏକସାଥେ ଜାମାତେ ନାମାୟ ଆଦାୟ କରିଛିଲୋ, ତଥନ ଆଲାଫତୋଗୀନେର ସହ୍ୟୋଗୀ ସେନାପତି ଖରତାଶ ତାର ଗୋଟା ବାହିନୀ ନିଯେ ଆଲତାଟି ସହ୍ୟୋଦ୍ଧାଦେର ଉପର ହାମଲେ ପଡ଼େ ।

ଆଲତାଟି ଛିଲେନ ଇତିହସଖ୍ୟାତ ସେନାପତି । ଜୀବନେ ଅସଂଖ୍ୟବାର ଚରମ ଦୂରାବସ୍ଥାର ମଧ୍ୟେ ଓ ତିନି ପରାଜ୍ୟକେ ଜୟେ ପରିଣତ କରିଛିଲେନ । କୌଶଳୀ ଓ ଅଭିଜ୍ଞ ସମରନାୟକ ହିସେବେ ଇତିହସ ତାକେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଭବେ ସ୍ଵରଣ କରେ । ଯାର ନାମ

সুলতান মাহমুদের সমপর্যায়ে উচ্চারিত হয়। সেদিন তিনি তার শিবিরে সকল যোদ্ধাদের নিয়ে অনেকটা নিচিত্তেই ফজরের নামায আদায় করছিলেন।

শক্রবাহিনী হয়তো জানতো, সুলতানের সৈন্যরা রণাঙ্গনেও জামাতে নামায আদায় করে থাকে। এই সভাবনাকে কাজে লাগানোর জন্য মদখোর খমরতাশ তার দলবল নিয়ে পূর্ব থেকে অদূরে অবস্থান নিয়েছিলো।

যেই দেখলো, আলতাইর তামায সৈন্য নামায পড়ছে, ঠিক তখন এক সাথে হাজার হাজার অশ্বারোহী সৈন্য নিয়ে খমরতাশ নামাযরত সৈন্যদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল।

সুলতানের এই সৈন্যরা ছিলো একেবারেই অপ্রস্তুত। তাদের কারো পক্ষেই প্রতিরোধ করা সম্ভব হলো না। ফলে সুলতানের নির্বাচিত চৌকস সৈন্যদের বিরাট অংশ নিহত হলো। সেনাপতি আলতাই মুষ্টিমেয় কয়েকজন কমান্ডার ও সহযোদ্ধা নিয়ে কোনমতে প্রাণ বাঁচাতে সক্ষম হলেন।

সুলতান মাহমুদ এই অযাচিত অতক্রিত আক্রমণ ও হতাহতের খবর শুনে তার রিজার্ভ বাহিনীকে খমরতাশের বাহিনীকে আক্রমণের নির্দেশ দিলেন। এরা অগ্রসর হয়ে জানতে পারলো, খমরতাশ আলতাইর সহযোদ্ধাদের কচুকাটা করে চলে গেছে।

সুলতানের এই রিজার্ভ বাহিনী ছিলো তার একান্ত নিরাপত্তা ইউনিট। এই ইউনিটের প্রতিজন সদস্য যেমন ছিলো ভিন্নতর শক্তির অধিকারী, তেমনি তাদের সওয়ারীগুলোও ছিল অন্য সওয়ারীর চেয়ে তেজস্বী। এরা অগ্রসর হয়ে যখন দেখল, খমরতাশ আলতাইর বাহিনীকে তচনছ করে চলে গেছে, তখন তারা ওদের পিছু ধাওয়া করলো। খমরতাশের সৈন্যরা তখনো খুব বেশী দূর অগ্রসর হয়নি। আকস্মিক আক্রমণের অস্বাভাবিক সাফল্যের পর তাদের মনোবল দারুণ বেড়ে গিয়েছিল এবং অভিযান শেষে অনেকটা আয়েশে কিছু পথ অগ্রসর হয়ে খমরতাশের সৈন্যরা আরাম করার জন্য যাত্রাবিরতি করল।

এই এলাকাটি ছিল মরময়। হঠাৎ পশ্চাত্তিকে ধূলি উড়ার আলামত দেখতে পেল খমরতাশ। সে বুকে গেল সুলতানের বাহিনী হামলার জন্য অগ্রসর হচ্ছে। খমরতাশ তার সৈন্যদেরকে জবাবী আক্রমণে প্রতিহতের জন্য প্রস্তুতি নেয়ার নির্দেশ দিল। প্রতিপক্ষ বাহিনীকে খমরতাশের সৈন্যরা ঘোড়ায় চড়ে তৈরী হয়ে গেল।

সুলতানের সৈন্যরা খমরতাশের বাহিনীকে ঘেরাও করার চেষ্টা করলো আর খমরতাশের সৈন্যরা ঘেরাও ভাঙার চেষ্টায় প্রবৃত্ত হলো। কিন্তু সুলতানের এই বাহিনীর ঘেরাও থেকে বের হওয়া খমরতাশের সৈন্যদের পক্ষে সম্ভব হলো না।

চলন্ত ও দূরস্থ সুলতানের এই সৈন্যদের সংখ্যা নিরপেক্ষ করা খমরতাশের পক্ষে সম্ভব হলো না। খমরতাশের সৈন্যরা ঘেরাও থেকে বের হওয়ার জন্য দৌড়-বাঁপ পাড়ছিলো আর সুলতানের বাহিনীর হাতে ঘায়েল হচ্ছিল। পলায়নপর সৈন্যদের সাথে গয়নী বাহিনীর মোকাবেলা বেশীক্ষণ স্থায়ী হলো না। অল্প সময়ের মধ্যে সকল শক্ত সৈন্যকে ঘায়েল করে খোদ খমরতাশকে পাকড়াও করে ফেললো সুলতানের সৈন্যরা। মুখোমুখী সংঘর্ষে খুবই করুণ পরিণতি বরণ করতে হলো খমরতাশের। ঝোকতার হয়ে সে সুলতানের দরবারে নীত হলো।

\* \* \*

রাতের বেলা সুলতান মাহমুদ সৈন্যদেরকে নতুনভাবে বিন্যাস করলেন। সৈন্যদের এক অংশকে নদীর তীরে মোতায়েন করে তাদেরকে নির্দেশের অপেক্ষায় রাখলেন। তিনি তাদের বললেন, নির্দেশ পাওয়ার সাথে সাথে তোমরা নৌবহর নিয়ে রাজধানী ভুরজানিয়ার নিকটবর্তী গিয়ে শিবির স্থাপন করো।

পরদিন সুলতান মাহমুদ কোন তৎপরতা না চালিয়ে নিক্রিয় রাইলেন। তিনি শক্তবাহিনীকে বোঝাতে চেয়েছিলেন, এখনই আক্রমণের জন্য তিনি প্রস্তুত নন।

আলাফতোগীন কোন বিশেষজ্ঞ সমরবিশারদ ছিল না। তার অন্যতম সেনাপতি খমরতাশ ছিল বন্দী। সেনাপতি আবু ইসহাককে আলাফতোগীন নদী তীরের কোন এক জায়গায় রিজার্ড রেখেছিল। তাছাড়া সে গুরুত্বপূর্ণ ও অভিজ্ঞ সেনাপতিদের হত্যা করিয়ে ফেলেছিল।

আলাফতোগীন সুলতানের রগকৌশল বুঝতে সক্ষম হলো না। তাছাড়া সুলতানের সেনাবিন্যাস সম্পর্কে তার কোন ধারণাই ছিল না। সুলতানের সেনাবিন্যাসের কোন খৌজখবর না নিয়েই নিজেকে আত্মশক্তিতে বলীয়ান এবং

সুলতানের বাহিনী অপ্রস্তুত রয়েছে তবে আক্রমণ করে বসে। এই আক্রমণ ছিল ৪০৮ হিজরীর সফর মোতাবেক ১০১৭ সালের ৩ জুলাই।

‘আচাৰ্লল উজারা’ নামক ইতিহাস গ্রন্থে ‘আলফজলী’ এই যুদ্ধের বিস্তারিত বর্ণনায় লিখেছেন, এই আক্রমণে আলাফতোগীন নিজে নেতৃত্ব দিয়েছিল। সে ছিল তার সেনাবাহিনীর সবচেয়ে সামনে। সে ডান বায় কোন দিকে খেয়াল না করেই আক্রমণ করে বসে।

ঐতিহাসিকগণ লিখেছেন, এই আক্রমণে আলাফতোগীনের সাধারণ যোদ্ধারা সাহসিকতার সাথে লড়াই করে। তারা গয়নী বাহিনীর বিরুদ্ধে নানা প্রোগান দিচ্ছিল এবং গয়নী বাহিনীকে আল্লাহ'র প্রিয় দুই বুয়ুর্গের হস্তারক বলেও প্রোগান দিচ্ছিল। তাদের হৃদয়ে খুবই সৃষ্টিভাবে গয়নী বাহিনীর বিরুদ্ধে ক্ষোভ ও ঘৃণা জন্মাতে সক্ষম হয়েছিল।

এই ঘৃণা ও ক্ষোভ শক্তিতে পরিণত হলো। শুধু বীরত্ব ক্ষোভ ও খুনের নেশায় যদি সামরিক লড়াইয়ে বিজয়ী হওয়া যেতো, তবে এই বিজয় পাওনা ছিলো আলাফতোগীনের। কিন্তু অপরিমেয় ক্ষোভ ধাকার পরও নিজেকে সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে রেখে সমরকৌশলে বিজয় নিশ্চিত করেছিলেন সুলতান। তাঁর রণকৌশল ছিল দূরদর্শী এবং সময়োচিত।

সুলতান মাহমুদ যুদ্ধের শুরুতে ঘোড়া থেকে নেমে দু'রাকাত নামায পড়লেন এবং নামায শেষে আলাফতোগীনের ডান বাহুতে হস্তিবাহিনীকে আক্রমণের নির্দেশ দিলেন।

আলাফতোগীনের সৈন্যরা তখনো হস্তিবাহিনীর কোন সদস্যকে দেখেনি। হঠাৎ তাদের ডান বাহুকে হস্তিবাহিনী আক্রমণ করলো। জঙ্গী হাতিগুলো এগিয়ে আসার সাথে বিকট চিৎকার করছিল। হাতির চিৎকারে আকাশও যেনে কেঁপে উঠেছিল।

বাওয়ারিজমের সৈন্যরা কখনো হস্তিবাহিনীর মোকাবেলা করেনি। বিশালদেহী জঙ্গি হাতির দানবীয় চিৎকার ও দৈত্যের মতো এগিয়ে আসার ভাব দেখেই আলাফতোগীনের সৈন্যরা ভড়কে গেল। তারা জানতো না হাতি দেখতে যদিও ভয়ানক; কিন্তু এদের দুর্বলতাও প্রকট।

সুলতান হস্তিবাহিনীর ডানে বায়ে পদাতিক সৈন্য এবং পেছনে অশ্বারোহী সৈন্যদের নিযুক্ত করলেন।

জনি হাতিগলো যখন শক্রসেনাদের দিকে দৌড়ে এগছিল, তখন মনে হচ্ছিল জমিন দুলছে। আলাফতোগীন তার সেনাদের উজ্জীবিত করার সম্ভাব্য সব চেষ্টাই করলো। কিন্তু সৈন্যরা হাতির ভয়ানক চিৎকার ও কাওকারখানা দেখে ভীত-বিহ্বল হয়ে পড়ল।

হস্তিবাহিনীর দুটি হাতি শক্রযোদ্ধাদের মধ্যভাগে চলে গেল। মধ্যভাগে অবস্থান করছিল সেনানায়ক আলাফতোগীন। আলাফতোগীনের মধ্যভাগের মোদ্ধারা বীরবিক্রমে মোকাবেলা করলো কিন্তু এক পর্যায়ে আলাফতোগীনের দেহরক্ষী বাহিনীর মধ্যে ভাঙন দেখা দিল।

দিন শেষে প্রচণ্ড রক্তস্তরী এ যুদ্ধের অবসান হয়ে গেল। পরাজয় অবশ্যঝৰী ভেবে আলাফতোগীন পালিয়ে গেল; কিন্তু রণাঙ্গন থেকে তার পক্ষে নিষ্কান্ত হওয়া সম্ভব হলো না। সুলতানের সৈন্যরা তাকে ঘেরাও করে পাকড়াও করে ফেলল।

\* \* \*

জুরজানিয়া ছিল রাজধানী। বিদ্রোহী খন্দনায়ক আলাফতোগীন প্রেফতার ও পরাজিত হলেও বিজয়কে অর্থবহ করার জন্য সুলতানের প্রয়োজন ছিল রাজধানী কঞ্জ করা।

নদীর তীরে অপেক্ষমাণ সৈন্যদেরকে তিনি নৌবহরে রাজধানী জুরজানিয়ার দিকে অগ্রসর হওয়ার নির্দেশ দিলেন। সুলতানের সৈন্যরা প্রায় চারহাজার নৌকায় আরোহণ করে রাজধানীর দিকে রওনা হলো।

সুলতানের নৌবহর জুরজানিয়ার নিকটবর্তী হলে তারা দেখতে পেলো তাদের সম্মুখ দিক থেকে অস্তত ত্রিশহাজার সৈন্যের বিশাল এক নৌবহর এগিয়ে আসছে।

তখন ভোরের সূর্য পূর্বকাশে উঁকি দিচ্ছে। ত্রিশ হাজার নৌকার আরোহীর এই বিশাল নৌবহর ছিল আলাফতোগীনের সহযোগী সেনাপতি আবু ইসহাকের নেতৃত্বে। আলাফতোগীন এই সৈন্যদের রিজার্ভ রেখেছিল। সুযোগমতো সে এদের তলব করতো। কিন্তু এদের তলব করার আর সুযোগ হয়নি। এর আগেই আলাফতোগীন সুলতানের সেনাদের হাতে ধরা পড়ে এবং তার বাহিনী শোচনীয় পরাজয়ের মুখোমুখী হয়।

সেনাপতি আবু ইসহাক খবর পেয়েছিল, সুলতানের একদল সৈন্য নদীতীরে নির্দেশের জন্য অপেক্ষা করছে। সে বুঝতে পারলো, এদের পথ ও গন্তব্য রাজধানী জুরজানিয়া। আবু ইসহাক ভাবলো, জুরজানিয়ার সাধারণ লোক তাদের বিদ্রোহে স্ফুরু।

এমতাবস্থায় প্রতিপক্ষের জুরজানিয়া আক্রমণ করলে স্থানীয় সৈন্যদের মধ্যে ভাঙ্গ দেখা দিতে পারে। তাছাড়া রাজধানীতে অনেকের পক্ষে পালিয়ে যাওয়ার সুযোগ আছে। এরচেয়ে বরং সকল সৈন্য নিয়ে রাজধানীর বাইরেই শক্রবাহিনীর মোকাবেলা করা হবে বুদ্ধিমানের কাজ। যেই চিন্তা সেই কাজ। সেনাপতি আবু ইসহাক ত্রিশহাজার নৌকায় তার অনুগত সৈন্যদের সওয়ার করে মোকাবেলার জন্য এগিয়ে এলো।

সুলতানের নৌবহর অঙ্গসর হয়ে বুঝতে পারলো, শক্রবাহিনী নৌযুদ্ধের জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুতি নিয়ে এসেছে। বস্তুত উভয় নৌবহর মুখোমুখি হতেই নৌযুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। যুদ্ধের ধরন ছিলো অনেকটা মন্ত্রযুদ্ধের মতো।

একটি নৌকা অপর নৌকার মুখোমুখি হলে শক্রসেনাদের উদ্দেশ্যে প্রতিপক্ষ লাফ দিয়ে শক্র নৌকায় গিয়ে মন্ত্র যুদ্ধে প্রবৃত্ত হচ্ছিল। নৌকা পরম্পর টক্কর দিচ্ছিল আর যোদ্ধারা একে অন্যের উপর আঘাত হানতে ঝাঁপিয়ে পড়ছিল। আর আহত ও নিহত যোদ্ধাদের তাজা রক্তে লাল হচ্ছিল নদীর পানি।

এক সংবাদবাহক এসে সুলতান মাহমুদকে খবর দিলো, জুরজানিয়ায় গ্যানী সৈন্যদের সাথে আলাফতোগীনের একাংশের নৌযুদ্ধ চলছে। খবর শোনামাত্রই সুলতান অশ্বারোহী বাহিনী এবং উষ্ট্রারোহী ইউনিটকে নৌসেনাদের সহযোগিতার জন্য অভিযানের নির্দেশ দিয়ে নিজেও অশ্পৃষ্টে রওনা হলেন। এই সৈন্যরা যখন অকুস্তলে পৌছলো, তখন যুদ্ধ প্রায় ত্রিমিত হয়ে এসেছে এবং নদীর মধ্যে উভয় সেনাদের মাঝাবিহীন নৌকা পরম্পর টোকাটুকি করছে।

উষ্ট্রারোহী সৈন্যরা নদীর তীর থেকে শক্রসেনাদের নৌকা চিহ্নিত করে শক্রদের উদ্দেশ্যে তীর নিক্ষেপ করতে শুরু করল। কোন কোন অশ্বারোহী তো এমন বীরত্ব প্রদর্শন করলো যে, ঘোড়া নদীতে নামিয়ে দিলো, কিন্তু পানির পরিমাণ বেশী ও নদীতে স্রোত থাকার কারণে তারা তেমন সুবিধা করতে পারলো না।

সুলতান মাহমুদ নদীর পৌছে পানিতে ঝাপিয়ে পড়া সকল  
অশ্বারোহীকে তীরে নিয়ে এলেন।

এদিকে সুলতান মাহমুদের বাহিনীর সাথে দখলদার আলাফতোগীন  
বাহিনীর যুদ্ধ এবং আলাফতোগীনের প্রেফতারীর খবর শুনে রাজধানী  
জুরজানিয়ার সাধারণ অধিবাসীরা ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এলো। এ সম্পর্কে  
তৎকালীন ঐতিহাসিক ইসকান্দারয়র লিখেছেন, ‘রাজধানী জুরজানিয়ার মানুষ  
আলাফতোগীনের বারো মাসের দৃঢ়শাসনে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিলো।

জুরজানিয়ায় আইনের শাসন বলতে কিছুই অবশিষ্ট ছিলো না। ন্যায়নিষ্ঠা ও  
ইনসাফের নামগঙ্কও ছিলো না। আলাফতোগীনের সেনাশাসনে। প্রত্যেক  
নাগরিকের ঘাড়ের উপর প্রেফতারীর খড়গ সব সময় ঝুলন্ত থাকতো। সাধারণ  
সৈনিকের ক্রথাও তখন রাজকীয় ফরমানের র্যাদা পেয়েছিল।

নির্যাতিত-নিপীড়িত জুরজানিয়ার সাধারণ লোকজন যখন জানতে পারলো,  
খররতাশ ও আলাফতোগীন গয়নী বাহিনীর হাতে প্রেফতার হয়েছে এবং এখন  
আবু ইসহাকের অনুগত সৈন্যদের সাথে নদীতে গয়নী সেনাদের যুদ্ধ চলছে।

এ খবর শোনার সাথে সাথে গয়নীর আবাল-বৃদ্ধ হাতের নাগালে  
তরবারী-বল্লম-নেজা-দা-বটি-লাঠি যাই পেয়েছে নিয়ে নদীর তীরের দিকে  
দৌড়াতে শুরু করে দিলো এবং পথিমধ্যে নগররক্ষায় যেসব সৈন্য সামনে  
পেলো, তাদের উপর হামলে পড়লো।

দিনব্যাপী চললো এই মৌযুদ্ধ। সূর্য ডোবার কিছুক্ষণ আগে শহরের  
লোকেরা যখন গয়নী সেনাদের সাহায্যের জন্য বেরিয়ে এলো এ খবর  
শোনামাত্র তীরে দাঁড়িয়ে নির্দেশনাতা সেনাপতি আবু ইসহাক পালোনোর  
উদ্যোগ নিল।

কিন্তু তার পক্ষে পালিয়ে যাওয়া সম্ভব হলো না। পলায়নপর আবু  
ইসহাককে পাকড়াও করে তার সেনাবাহিনীর লোকেরাই গয়নী বাহিনীর হাতে  
গ্রেফতার করলো। আর সাধারণ লোকজন গিয়ে গয়নী সেনাদের সহযোগিতা  
গ্রহণ করতে শুরু করলো। তারা খাওয়ারিজম বাহিনীর বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণেও  
গ্রহণ কৃষ্টাবোধ করলো না।

ঐ ঐতিহাসিক বায়হাকী ও ইবনে ইকবাদার লিখেছেন, দখলদারদের প্রতি ক্ষুক্ষ  
চিলেন সুলতান মাহমুদ। ক্ষুক্ষ সুলতান নদীর তীরব্যাপী উর্ধ্বশাসে ঘোড়া

ছুটিয়ে তীরন্দাজদের আরো বেশী করে সঠিক নিশানায় তীর নিষ্কেপের নির্দেশ দিছিলেন। রাগে-ক্ষোভে তার মূখ থেকে ফেনা বেরিয়ে আসছিলো।

দিনের শেষে যুদ্ধ শেষ হয়ে গেলেও রাতভর চললো শক্রসেনাদের প্রেক্ষতারী এবং গফনীর আহত ও নিহত সেনাদের একত্রিত করার কাজ। আহতদের দ্রুত চিকিৎসার জন্য ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছিল।

রাতের বেলায়ই শহরের শীর্ষ কর্মকর্তা এবং গণমান্য লোকেরা এসে সুলতানের কাছে ওইসব অপরাধীদের পাস্তা জানিয়ে দিচ্ছিল যারা কোন না কোনভাবে আলাফতোগীনের বিদ্রোহের সাথে জড়িত ছিলো এবং আবুল আকবাসকে হত্যার পেছনেও যাদের হাত ছিলো।

সেই রাত্রেই ওইসব চিহ্নিত অপরাধীদের পাকড়াও অভিযান শুরু হয়ে গেল।

\* \* \*

পরদিন প্রথম প্রহরে দখলদার খলনায়ক আলাফতোগীন, সেনাপতি আবু ইসহাক ও সেনাপতি খমরতাশকে সুলতানের সামনে পেশ করা হলো। তৎকালীন ঐতিহাসিক বায়হাকী, উত্তী এবং গরদীজী লিখেছেন, সুলতান মাহমুদকে ইতোপূর্বে এমন ক্ষুর অবস্থায় কখনো দেখা যায়নি।

ধৃত বিদ্রোহীদের নায়কদের তিনি যে শাস্তি দিলেন, তাতে হয় তো তার অন্তরাভ্যাও কেঁপে উঠেছিলো। সুলতান মাহমুদকে কোন অবস্থাতেই অত্যাচারী বলার সুযোগ নেই। কিন্তু এদের অপরাধের শাস্তির ক্ষেত্রে তিনি হয়তো নিজের ক্ষোভকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারেননি।

হে জালেমের দল! তোমরা শুধু আবুল আকবাসের হস্তা-ই নও। ক্ষুরকষ্টে ধৃতদের উদ্দেশ্যে বললেন সুলতান। ক্ষুর সুলতান যখন কথা বলছিলেন, ঝার মুখ থেকে রাগে-ক্ষোভে থুতু বেরিয়ে আসছিলো। তার সারা শরীর ক্ষোভে ধরধর করে কাঁপছিলো। তিনি ক্ষুরকষ্টে আবারো বললেন—

এই দুই মুসলিম দেশের হাজারো নিরপরাধ সেনার জীবনহানির অপরাধে তোমরাও অপরাধী। তোমাদের ক্ষমতালিঙ্গ আর বেঙ্গমানীর কারণে এতোগুলো মানুষের জীবনহানী ঘটেছে। তোমাদের অনুগত সৈন্যদের

প্রাণহনির হিসেব করে দেখো, এরা না তোমাদের সৈন্য ছিলো, না আমার সৈন্য ছিলো । এরা ছিলো ইসলামের ঝাঙ্গাবাহী সৈনিক । এরা ছিলো আল্লাহর সিপাহী । তোমরা ক্ষমতার মসনদ পাকাপোক্ত করতে এদের হত্যা করিয়েছো ।

কুকুর সুলতান রাগে-ক্ষেত্রে বসা থেকে দাঁড়িয়ে বললেন, ওহে নিমকহারামের দল! তোমরা ওই খুন দেখোনি, যে খুন মরুর মাটি শূষ্ঠে নিয়েছে । সেই রক্ত দেখোনি, যে রক্ত নদীর পানিতে ভেসে গেছে । তোমরা দেখোনি তোমাদের কারণে ময়দানে ক্ষতবিক্ষত যেসব সৈনিক তড়ফাতে তড়ফাতে মৃত্যুবরণ করেছে ।

হে বিদেশী ফিরিস্তীদের পা-চাটা গোলামের দল! হে সত্যের ঝাঙ্গাবাহী সৈনিকের ঘাতক, হে ধোকাবাজ প্রভারক গোষ্ঠী! তোমরা হাতে পবিত্র কুরআন নিয়ে সাধারণ মানুষকে ধোকা দিয়েছো । হে ভগ্নের দল! নিজেদের সাক্ষা মুসলমান দাবী করে তোমরা সাধারণ মুসলমানদের ধোকা দিয়েছো । তোমরা মহাপরাক্রম আল্লাহকে ভুলে গিয়েছিলে । ভুলে গিয়েছিলে মহান আল্লাহ কখনো মজলুমের ফরিয়াদ ফিরিয়ে দেন না ।

হে হতভাগার দল! নিজেদের স্বকীয়তা ইহুদী-নাসারাদের হাতে বিকিয়ে দিয়ে তোমরা গোটা জাতির ভাগ্যকে বেইমানদের হাতে তুলে দিতে চেয়েছিলে । তোমাদের জ্ঞানবোধ ফিরিস্তী বেশ্যদের হাতে তুলে দিয়ে শুরার মাতলামীতে হারিয়ে গিয়েছিলে । তোমাদের দিল-দেমাগে ক্ষমতা ও মসনদের মোহ আসন গেড়ে বসেছিলে ।

তোমরা ঈমান বিক্রি করে দিয়েছিলে? হে ঈমান বিক্রেতা বেইমানেরা! আমি মূর্তি হস্তারক আর তোমরা সেই মূর্তির জীবন্ত প্রতীক! হিন্দুস্তানের মূর্তিগুলোকে আমি যেভাবে ভেঙে টুকরো টুকরো করেছি, তোমাদেরকেও আমি সেভাবেই টুকরো টুকরো করে ফেলবো । হিন্দুদের মাটি-পাথরের দেবতাগুলোকে আমি যেভাবে ঘোঢ়ার পায়ে পিষেছি, তোমাদেরকেও সেভাবে পিমে ফেলবো ।

হে বেইমান নিমকহারামের দল! রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে তোমাদের বিপুল অংকের ভাতা দেয়া হতো এইজন্য যে, তোমরা জনগণের সেবা করবে, নিজ দেশ ও দেশের মানুষের ঈমান-ইজ্জতের হেফাযত করবে, ইসলামের বিক্রমকে দুশ্মনদের সকল ষড়যন্ত্র নস্যাত করবে, ইসলামের হেফাযতের জন্য নিজের

জীবন বিলিয়ে দেবে। কিন্তু কর্তব্য ভুলে গিয়ে তোমরা নিজ দেশকেই দখল করেছো। ধর্মের দোহাই দিয়ে জাতির জীবন-সম্মতি বিকিয়ে দিয়েছো। গণমানুষের জীবন কেড়ে নিয়েছো, মানুষের জীবনকে সংকীর্ণ করে দিয়েছো।

‘হে বেঙ্গানেরা, আমি যদি তোমাদের উচিত শিক্ষা না দিই, হাজারো মজলুমের বিদেহী আস্থা আমাকে অভিশাপ দেবে।’ যাও এদেরকে ময়দানে নিয়ে চাবুক লাগাও।’

শহরের আবাল-বৃক্ষ-বনিতা সবাই ধৃত দেশদ্বারীদের শাস্তি দেখার জন্য সেখানে ভিড় জমাল। গোটা ময়দান লোকে লোকারণ্য হয়ে গেল। আলাফতোগীন, আবু ইসহাক, খমরতাশ ও তাদের সহযোগীদের হাজারো জনতার বেষ্টনীর মধ্যে ময়দানের মাঝখানে নিয়ে সুলতানের কমান্ডোরা চাবুক দিয়ে পেটাতে শুরু করলে হাজারো মজলুমের হর্ষধনিতে গোটা এলাকা কেঁপে উঠলো।

বিদ্রোহীদের চার চারজন করে ভাগ করে চাবুক লাগানোর পর তাদের সবাইকে একটি চৌবাচ্চায় দাঁড় করিয়ে দেয়া হলো আর রাজধানীর লোকদের বলা হলো, তারা যেনো দল বেঁধে এদের পাশ দিয়ে অতিক্রম করে এবং তৎসনাম্বকরণ এদের উপর থুতু ছিটিয়ে দেয়। লোকজন এদের পাশ দিয়ে অতিক্রম করার সময় কেউ কেউ তাদের উপর চিল নিক্ষেপ করল এবং কেউ কেউ পাথর ছুঁড়ে মারলো। অনেকেই তাদের গালি-গালাজ করে একপাশে দাঁড়ালো।

এরপর সুলতান মাহমুদ এমন নির্দেশ দিলেন, তাতে গোটা ময়দানে পিনপতন নীরবতা নেমে এলো। অনেকেই বিশ্বাস করতে পারছিলেন না, সুলতান এমন কঠোর নির্দেশ দিতে পারেন!

সুলতান মাহমুদ এরপর নির্দেশ দিলেন, এদের প্রত্যেকের কাঁধ বরাবর বাজুসমেত হাত কেটে দাও। নির্দেশ পাওয়া মাত্রই সুলতানের কমান্ডোরা তরবারী নিয়ে দৌড়ে এলে অপরাধীরা এদিক সেদিক দৌড়াতে চেষ্টা করলো এবং চিঢ়কার করে করে সুলতানের কাছে প্রাণভিক্ষা চাইলো। কিন্তু সুলতানের মনে তখনও ছেয়ে ছিলো নিরপরাধ সেইসব সিপাহীদের মর্মস্তুদ হত্যাকাণ্ডের দৃশ্য, যারা এদের কারণে মৃত্যুবরণ করেছে।

তাতে সুলতান ক্ষান্ত হলেন না। তিনি আগেই পনেরোটি জঙ্গীহাতি একপাশে দাঁড় করিয়ে রেখেছিলেন। এবার তিনি নির্দেশ দিলেন, জঙ্গী হাতিগুলোকে এদের পিষে মারার জন্য ছেড়ে দাও।

প্রতিটি হাতিকেই পরিচালনা করছিলো একেকজন মাহত। তারা হাতিকে দৌড়ালো। অপরাধীদের সবার পায়ে ছিল ডাঢ়াবেড়ী। ওরা এদিক সেদিক সরে যাওয়ার চেষ্টা করল বটে; কিন্তু মাহতরা হাতিগুলোকে ঘূরিয়ে ফিরিয়ে ওদের সবাইকে পিষে ফেললো।

এরপর এদের নিষ্পিট মৃতদেহগুলো গলায় রশি বেঁধে আবুল আকবাসের কবরের পাশে নিয়ে যাওয়া হলো। আবু আকবাসের কবরের পাশে আগেই কাঠের খুঁটি পুঁতে রাখার নির্দেশ দিয়েছিলেন সুলতান। দণ্ডিত দেশদ্রোহী হত্তারকদের মৃতদেহগুলোকে তিনি আবুল আকবাসের কবরের পার্শ্ববর্তী কাঠের খুঁটিতে উল্টো করে ঝুলিয়ে দেয়ার নির্দেশ দিলেন।

এদিকে শহরে সুলতানের ধরপাকড় আরো কয়েক দিন অব্যাহত থাকল। অভিযুক্তদের পাকড়াওয়ের পর অভিযোগ প্রমাণিত হলে একই শাস্তি দেয়া হলো। টানা কয়েকদিন ধরপাকড় করার পর সুলতান এই অভিযান বন্ধের নির্দেশ দিলেন।

সুলতান মাহমুদ সেনাপতি আলতানতাশকে খাওয়ারিজমের শাসক ঘোষণা করলেন এবং আরসালান জায়েবকে শাসকের সহকারী নিযুক্ত করলেন এবং খাওয়ারিজমকে গফনী সালতানাতের অধীন করে নিলেন। সেনাধ্যক্ষ আলতানতাশ ও তার ডেপুটি আরসালান জায়েব গোয়েন্দা তৎপরতা ও গোয়েন্দা ব্যবস্থাকে খুবই দক্ষতার সাথে ব্যবহার করেছিলেন।

বর্তমান যুগে গোয়েন্দা বিভাগ বলতে যা বোঝায়, সুলতান মাহমুদের এ বিভাগ ছিল এরই পুরাতন রূপ। এ বিভাগের কর্মীদের মুশরেফ বলা হতো। শক্র দেশে সে দেশেরই যেসব নাগরিককে গোয়েন্দা চর বানানো হতো, তাদেরকেও মুশরেফ নামে ডাকা হতো। ঐতিহাসিক বায়হাকী লিখেছেন, মুশরেফদেরকে সুলতান মাহমুদ মোটা অংকের ভাতা, উচ্চ প্রযুক্তি এবং আকর্ষণীয় পুরস্কার ও উপচৌকন দিতেন। তাদের স্ত্রী-সন্তানদেরকে তিনি ভিন্নভাবে ভাতা দিতেন। বায়হাকী লিখেছেন, সুলতান মাহমুদ এমন দূরদর্শী ও বিচক্ষণ লোকদের গোয়েন্দা এজেন্ট হিসেবে নিয়োগ করতেন যে, তারা

শক্রদেশে সেই দেশের শাসকগোষ্ঠী ও রাজা-বাদশাহর শ্বাস-প্রশ্বাসের খবরও বলে দিতে পারতো ।

আলতানতাশ ও আরসালান জায়েব প্রাথমিক পর্যায়ে গয়নী থেকে কয়েকজন গোয়েন্দা কর্মকর্তাকে নিয়ে এলেন । এরপর এরাই স্থানীয়দের থেকে লোক নির্বাচন করে গোটা খাওয়ারিজমব্যাপী তাদের গোয়েন্দাজাল বিছিয়ে দিলো ।

দূরদর্শী, অতিসতর্ক, তীক্ষ্ণবীসম্পন্ন লোকদের ব্যবহার করে ইহুদী ও খৃষ্টান কুচক্ষীরা যেসব চক্রান্তের জাল বিস্তার করে রেখেছিল, অস্বাভাবিক কম সময়ের মধ্যে সকল দৃঢ়ত্বকারীকে চিহ্নিত করলেন আলতানতাশ ও আরসালান জায়েব । তারা মূল চক্রান্তকারী ও কুচক্ষীদের স্থানীয় সহযোগীদের চক্রান্তের হোতাদের মতোই শান্তি দিলেন ।

শহর-বন্দর-হাম-গঞ্জে বসবাসকারী সকল লোকদের আঙ্গা ফিরিয়ে আনা হলো । তাদেরকে সকল সামরিক শাসনতান্ত্রিক অত্যাচার-উৎপীড়ন থেকে মুক্ত করা হলো এবং তাদের জীবন-সম্পদ ও ইজ্জত আক্রম হেফায়তের দায়িত্ব সরকারের কাঁধে তুলে দেয়া হলো । ফলে সকল স্তরের মানুষের মধ্যে ফিরে এলো আঙ্গা ও বিশ্বাস ।

খাওয়ারিজমের শাসনব্যবস্থা পুনর্বহালের পর সুলতান যখন গয়নী ফিরে আসছিলেন, তখন যেখানে গয়নী ও খাওয়ারিজম বাহিনীর প্রথম মোকাবেলা হয়েছিল । সেখানে এসে তিনি থেমে গেলেন ।

জায়গাটিতে তখনো শিয়াল-শকুন এবং লাওয়ারিশ কুকুর মৃতদের হাড়-গোড় তালাশ করছিল । সুলতান মাহমুদ তার ঘোড়া ধামিয়ে ফাতেহা পড়ে নিহত সৈন্যদের জন্য দুআ প্ররূপ করলেন ।

দীর্ঘক্ষণ পর তিনি যখন হাত নামিয়ে আনলেন, তখন তার চোখের পানিতে বুক ভেসে যাচ্ছিল এবং কষ্ট দিয়ে হেঁকি দিয়ে কান্নার আওয়াজ বেরিয়ে আসছিল । বস্তুত ‘বেঙ্গমান কাফেরদের জন্য অত্যন্ত কঠোর আর সুমানদার স্বজাতির জন্য অত্যন্ত কোমল হৃদয়ের অধিকারী’ সেই ঐতিহাসিক শাশ্বত বাণীর বাস্তব নমুনা ছিলেন সুলতান মাহমুদ ।

## গমনীর তুক্ষান

দিল্লী থেকে দক্ষিণ-পূর্বে প্রায় দু'শ মাইল দূরে গঙ্গা নদীর তীরবর্তী একটি শহরের নাম কল্লোজ। সুলতান মাহমুদের শাসনামলে কল্লোজ ছিল একটি শক্তিশালী হিন্দুরাজ্যের রাজধানী। ওখানকার মহারাজা ছিল রাজ্যপাল। উত্তর হিন্দুস্তানে কল্লোজের রাজকুমারদের অনেক কদর ছিল।

দিল্লী থেকে আশি মাইল দূরে যমুনা নদীর তীরবর্তী মাথুরা ছিল হিন্দুদের একটি মহাতীর্থস্থান। প্রায় পাঁচ হাজার বছর পূর্ব থেকে মাথুরা হিন্দুদের একটি তীর্থস্থান। হিন্দুদের কৃষ্ণ মহারাজ নাকি মাথুরাতেই জন্মগ্রহণ করেছিলেন। আজো পর্যন্ত মাথুরায় প্রতিবছর হাজার হাজার তীর্থযাত্রীর সমাবেশ ঘটে। তীর্থযাত্রীরা ওখানে গিয়ে পূজা-অর্চনা করে তাদের ভাষায় পাপের ঝুলন ঘটায়।

মাথুরায় একটি কেন্দ্রীয় মন্দির ছাড়াও ছোট বড় আরো কয়েকটি মন্দির ছিল। এসব মন্দির শক্ত পাথরের গাঁথুনী দিয়ে তৈরী। এসব মন্দিরের ছিল বহু গোপন কক্ষ। এ মন্দিরের ভেতরের ঢোরাগলিতে হারিয়ে গেলে অজানা কারো পক্ষে বেরিয়ে আসা সহজ ব্যাপার ছিলো না।

মাথুরা শহরের চারপাশ ছিল শক্ত দেয়ালে ঘেরা। শহরের ভেতরে একটি মজবুত দুর্গ ছিল। মাথুরা কোন স্বাধীন রাজ্য ছিল না। মাথুরার নিরাপত্তার দায়িত্ব ছিল কল্লোজের মহারাজা এবং পার্শ্ববর্তী মহাবন রাজ্যের রাজার উপর।

মহাবন রাজ্যের রাজার নাম ছিল কুলচন্দ। এরা ছাড়াও পার্শ্ববর্তী আরো কয়েক রাজ্যের মহারাজারা মাথুরার নিরাপত্তা রক্ষায় তাদের কিছু সেনাসনদস্যকে এখানে নিয়োগ করেছিল।

মাথুরার নিকটবর্তী রাজ্য মহাবন ছিল একটি জঙ্গলাকীর্ণ রাজ্য। রাজধানীর নাম ছিল মহাবন। মহাবনের অবস্থান ছিল মাথুরা থেকে প্রায় পাঁচিশ মাইল দূরে যমুনা নদীর তীরে।

সুলতান মাহমুদের সময় এই রাজ্য ছিল খুবই শক্তিশালী ও বিভিন্নালী। কিন্তু সুলতান মাহমুদ এসব রাজ্যের রাজাদের কাছে দানবের মতোই আতঙ্কে পরিণত হয়েছিলেন। সুলতান ইতোমধ্যে থানেশ্বর পর্যন্ত দখল করে সেখানে

নিজস্ব সেনা চৌকি স্থাপন করেছিলেন। পাঞ্জাবের মহারাজা ভীমপাল মুখোয়ুখী যুদ্ধে পরাজিত হয়ে সুলতানের সাথে মৈত্রীচূক্ষি করেছিলেন। ছেট ছেট রাজ্যের রাজা ও রায়বাহাদুররা তো সুলতানের নাম শুনলেই ভয়ে কঁপতো।

১০১৭ সালে সুলতান মাহমুদ যখন খাওয়ারিজমকে গয়নী সালতানাতের অন্তর্ভুক্ত করেন, তখন মাথুরাতে চলছিল বাংসরিক তীর্থ উৎসব ও পুণ্যার্থী সমাবেশ। সে বছর মাথুরায় এতো বিপুল পুণ্যার্থীর সমাবেশ ঘটেছিল যে, মনে হচ্ছিল সারা ভারতের সকল হিন্দুই যেন মাথুরায় এসে জমায়েত হয়েছিল।

শহরের প্রধান মন্দির এবং যমুনা নদীর বিস্তীর্ণ তীরবর্তী এলাকায় সমবেত মানুষদের মনে হচ্ছিল যেন পিংপড়ার চাক। পিংপড়ার মতোই গোটা শহর এবং যমুনা তীরে লোকজন গিজ গিজ করছিল। হাজার হাজার নারী-পুরুষের পদভারে প্রকল্পিত ছিল মাথুরা নগরী।

শহরের কোন জায়গা খালি ছিল না। শহরের বাইরেও কয়েক মাইল পর্যন্ত তীর্থযাত্রীদের তাঁবু আর তাঁবু। দূরবর্তী এলাকা এমনকি বনবাদারের ধারে-পাশে রঙিন বাহারী তাঁবুগুলো ছিল রাজা-মহারাজাদের পরিবার-পরিজনের। কোন হিন্দু রাজা-মহারাজা এ বছরের মাথুরা গমন থেকে বিরত থাকেননি।

রাজা-মহারাজাদের তাঁবুগুলোর পাশেই ছিল তাদের নিরাপত্তাকাজে নিয়োজিত সৈন্য-সামন্তদের তাঁবু। তাদের সাথে জঙ্গী হাতি ও ঘোড়াও ছিল। রাজা-মহারাজারাও যমুনার পুণ্যস্থান এবং মাথুরার প্রার্থনা সভায় যোগ দিতে এসেছিলেন।

সবচেয়ে বেশী বাহারী এবং বিশাল এলাকা জুড়ে তৈরী হয়েছিলো কল্লোজের মহারাজা রাজ্যপাল এবং পাঞ্জাবের মহারাজা ভীমপালের তাঁবু। তাদের তাঁবুতে কেউ গিয়ে বলার অবকাশ ছিল না, এগুলো সাময়িক তৈরী বরং এসব তাঁবুর রাজকীয় গঠনশৈলী এবং জাঁকজমকে মনে হতো কোন রাজপ্রাসাদ। রাজকীয় তাঁবুগুলো নানা রঙের ফানুস, রেশমী কাপড়ের পর্দা ও ঝালরে সাজানো।

রাজা মহারাজাদের রাণী এবং তাদের রক্ষিতা সেবিকা দাসদাসীরাও তাদের সাথে ছিল। ছিল নাচ গান আমোদ ফুর্তির জন্য বাদক ও নর্তকী দল। কিন্তু মাথুরার প্রধান পুরোহিত ও পণ্ডিতদের হাতভাব দেখে কারো পক্ষেই নাচ

গানের মতো আমোদ ফুর্তির আসর গরম করা সম্ভব হলো না। অন্যান্য বছর কয়েক সপ্তাহব্যাপী এখানে মেলা বসতো। প্রতি রাতেই বসতো নাচগানের আসর। সাধারণ মানুষেরাও নাচ গানের আসর জমাতো।

রাজা-মহারাজাদের উদ্যোগে নাচ গানের পাল্লা হতো। কিন্তু এবারের হাজার হাজার মানুষের এই সমাবেশে কোন আনন্দ-ফুর্তির আমেজ ছিলো না। কেমন যেন উদাস উদাস ভাব, সবার মধ্যেই এক ধরনের চাপা বেদনার সুর। এক ধরনের যাতন্ত্র অভিযুক্তি সবার চেহারায়।

তীর্থযাত্রী হিন্দুদের এই হতাশা ক্ষেত্রের মূল কারণ ছিলেন সুলতান মাহমুদ। সুলতান মাহমুদ ছিলেন হিন্দুদের জন্য জীবন্ত আতঙ্ক, ঘৃণা আর আসের নাম। মাখুরার প্রত্যেক পুরোহিতের কঠে ছিল এমন আওয়াজ-

“বিষ্ণুদেব আর কৃষ্ণদেবীর অভিশাপ থেকে তোমরা কেউ রেহাই পাবে না। দেবদেবীদের অপমান অপদস্থ করিয়ে তোমরা কি করে জীবন্ত ঘূরে বেড়াচ্ছো? কি করে তোমরা রাতের বেলায় নিশ্চিন্তে ঘুমাতে পারো এবং পেটপুরে আহার করতে পারো? যে পর্যন্ত তোমরা গয়নীর প্রতিটি ইট খুলে না নেবে আর মাহমুদ গয়নীর তাজা রক্ত দিয়ে কৃষ্ণমাতার পা ধুইয়ে না দেবে, ততোদিন পর্যন্ত তোমরা দেব-দেবীদের অভিশাপ থেকে রেহাই পাবে না। এখন গঙ্গাজল ও যমুনা জলও তোমাদের পাপ ধুইয়ে সাফ করতে পারবে না।”

পুরোহিতের এ ধরনের আতঙ্কজনক কথাবার্তার কারণে পূজারীরা সরাসরি কৃষ্ণমূর্তির চোখের দিকে তাকাতেও ভয় পেতো। পূজারীরা যখন মূর্তির পায়ে মাথা রেখে পূজা-অর্চনা করতো, তখন বিগলিত চিন্তে তাদের দু'চোখ বেয়ে অশ্রুধারা প্রবাহিত হতো। মন্দিরের শাখাধৰনি ও ঘণ্টাগুলোর আওয়াজও যেন উদাস হয়ে পড়েছিল। এগুলোর মধ্যে পূজারীরা অনুভব করতো এক ধরনের হতাশার সুর।

হোট শিশু-সন্তানের মাঝেরা তাদের শিশুদেরকে দেবদেবীদের অভিশাপ থেকে বাঁচানোর জন্য দেবদেবীদের পায়ে তাদের পরিধেয় অলঙ্কারাদি খুলে নজরানা দিতো। প্রত্যেকটি সামর্থবান পুরুষ পূজারী মূর্তিদের সামনে হাতজোড় করে শপথ করছিল, যে করেই হোক তারা মূর্তির অসম্মান ও দেবদেবীদের অমর্যাদার প্রতিশোধ নেবে। অনেকেই চিৎকার করে বলতো, এখন মাহমুদ হিন্দুস্তানে এলে আর তাকে ফিরে যেতে দেবো না।

কল্লোজের রাজা রাজ্যপাল যখন পূজা করার জন্য কৃষ্ণমূর্তির সামনে গেলেন, তখন তার একান্ত নিরাপত্তারক্ষী জগন্নাথও সঙ্গে ছিল। জগন্নাথ ছিল শক-সুঠাম-দীর্ঘদেহী সুদর্শন মূর্বক। তার চেহারা-ছবিতে যৌবনের দীপ্তি প্রস্ফুটিত ছিল। তার মুচকি হাসিতে দুর্নিবার আকর্ষণ এবং তার চাহনী ছিল জাদুময়।

জগন্নাথ ছিল আক্ষরিক অথেই একজন দক্ষ ক্ষণজন্ম্যা যোক্তা। তরবারী চালনায় ও তীরন্দাজিতে তার পারদর্শিতা ছিল কিংবদন্তিতুল্য। কল্লোজের মহারাজার কাছে জগন্নাথের প্রায় দু'বছর হয়ে গেছে। প্রথম দর্শনেই জগন্নাথ মহারাজার হন্দয় জয় করতে সক্ষম হয়েছিলো।

একবার এক জঙ্গলাকীর্ণ এলাকায় কল্লোজের মহারাজা হরিণ শিকার করতে এসেছিলেন। মহারাজা একটি হরিণকে তাক করে তীর ছুঁড়লে তীর ধনুক থেকে নিক্ষিণ্ঠ হওয়ার আগেই হরিণ স্থান ত্যাগ করে। এ সময় হঠাতে সেখানে উপস্থিত হলো জগন্নাথ।

মহারাজার নিরাপত্তারক্ষীরা হরিণটিকে স্থানচ্যুত করার জন্য তাকে গালমন্দ করেই ক্ষান্ত হলো না, রীতিমতো হমকি-ধমকি ও দিলো। জগন্নাথ মুচকি হেসে মহারাজাকে বললো, আমি যদি দুরস্ত হরিণকে তীরবিন্দ করতে না পারি, তাহলে আপনি আমার ঘোড়া নিয়ে নেবেন এবং আমাকে পাহাড়ের উপর থেকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেবেন।

সবাই জানে, হরিণ যখন দৌড়াতে থাকে, তখন এতো দ্রুত ও দীর্ঘ লাফ দেয় যে, মনে হয় হরিণটি যেনো বাতাসে উড়ছে। একটি চলস্ত হরিণের একেকটি লাফের পরিধি হয় অন্তত পঁচিশ-ত্রিশ গজ এবং মাটি থেকে সাত/আট হাত উপড়ে উঠে যায় হরিণ।

মহারাজা জগন্নাথের কথায় মজা করার জন্য তার নিজেরে ধনুক এবং একটি মাত্র তীর দিয়ে বললেন, ঠিক আছে, আবার কোন হরিণ আমাদের নজরে এলে আমরা সেটিকে তাড়িয়ে দেবো, তখন তুমি সেটি শিকার করবে। তুমি যদি এক তীরে হরিণটি শিকার করতে ব্যর্থ হও, তাহলে কিন্তু আমরা তোমার ঘোড়া ঠিকই ছিনিয়ে নেবো।

তাদের বেশী দূর যেতে হলো না। হঠাতে এক জায়গায় সাত-আটটি হরিণ পেয়ে গেলেন তারা। মহারাজার নির্দেশে তার শোকেরা হৈ চৈ করলে হরিণ

দৌড়ে পালাতে লাগল । পলায়নপর হরিণের পেছনে জগন্নাথ ঘোড়া ছোটালো । তার পেছনে মহারাজাও ঘোড়া ছোটালেন । ছুটন্ত হরিণ যেন বাতাসে ভর করে উড়তে লাগল ।

জগন্নাথ তার ঘোড়ার বাগ দাঁতে কামড়ে ধরল এবং ধনুক সামনে নিয়ে তাতে তীর ভরে নিক্ষেপ করল । একটি ছুটন্ত হরিণ মাটি শ্পর্শ করে আর লাফ দিতে পারলো না । একটু উপরে লাফ দিয়েই মাটিতে লুটিয়ে পড়ল আর সঙ্গী হরিণগুলো দৌড়ে পালিয়ে গেল । ততক্ষণে জগন্নাথের ঘোড়াও আহত হরিণের পাশে এসে দাঁড়াল । উড়ন্ত হরিণের শিরদাঁড়ায় জগন্নাথের ছেঁড়া তীর বিদ্ধ হওয়ায় হরিণটি আর লাফ দিতে সক্ষম হলো না । অতঃপর মহারাজা রাজ্যপালও তার কাছে পৌছে গেলেন ।

আমি বিজিরায়ের সেনাবাহিনীর একজন কমান্ডার ছিলাম মহারাজ । নিজের পরিচয় দিতে রাজ্যপালের উদ্দেশে বললো জগন্নাথ । বিজিরায় সুলতান মাহমুদের মোকাবেলায় এমন শোচনীয় পরাজয় বরণ করলেন যে, তার অর্ধেক সেনা মারা গেলো আর বাকী অর্ধেক মাহমুদের কাছে বন্দী হয়ে গেল । এতে আমার মন বিষাদে ভরে গেলো । আমি সেখান থেকে লাহোর চলে এলাম ।

কিন্তু এখানকার সৈন্যরাও সুলতানের কাছে পরাজিত হলো । বর্তমানে লাহোরের রাজা সুলতান মাহমুদের সাথে মৈত্রীচৰ্চিতে আবদ্ধ । আমি একজন সৈনিক । সেনাবাহিনীর উর্ধ্বতন কমান্ডার ছিলাম ।

আমি এখন কোন আত্মর্যাদাবোধসম্পন্ন রাজার সেনাবাহিনীতে যোগ দিতে চাই । আমি শুনেছি, কল্পোজের রাজপুতদের আত্মর্যাদাবোধ আছে । আজ আপনার সাথে সাক্ষাতের জন্যই আমি এই জঙ্গলে প্রবেশ করেছিলাম ।

মহারাজা তার সাথে কিছুক্ষণ কথা বলে বুঝতে পারলেন, এই সুদর্শন যুবক শুধু তীর-তরবারীতেই পারদর্শী নয়, তার মাথায় বুদ্ধিও আছে । সে যেমন মেধাবী, তেমনই দূরদর্শী । মহারাজা জগন্নাথের বুদ্ধিমত্তা ও সামরিক পারদর্শিতায় মুগ্ধ হয়ে জগন্নাথকে তার একান্ত নিরাপত্তারক্ষী দলে অন্তর্ভুক্ত করে নেন ।

জগন্নাথ ছিলো গোড়া হিন্দুবাদী । সে মাহমুদ গয়নবী ও অন্যান্য মুসলমানদের বিরুদ্ধে কঠোর ভাষায় গালমন্দ করতো এবং চরম শক্ততার বহিঃপ্রকাশ ঘটাতো । মুসলমানদের বিরুদ্ধে হিন্দুদের ক্ষেপিয়ে তোলার ব্যাপারে

সে ছিলো একজন তুখোড় বঙ্গ। বর্তমানে সরকার বা রাষ্ট্রপ্রধানদের যেমন একান্ত রাজনৈতিক উপদেষ্টা থাকে, জগন্নাথকেও কল্পনাজের মহারাজা রাজ্যপাল তার একান্ত উপদেষ্টার পদে আসীন করেছিলেন।

মহারাজা জগন্নাথের জন্য বিশেষ ধরনের চম্কদার পোশাক তৈরী করালেন। মহারাজা যখন দরবারে আসীন হতেন, তখন জগন্নাথ মহারাজার পেছনে পূর্ণ রাজকীয় জাঁকজমক নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতো, তার হাতে থাকতো স্বর্ণের প্রলেপ দেয়া বর্ণ। মহারাজা যেখানে যেতেন, জগন্নাথ তার সাথে থাকতো। অবস্থা এমন দাঁড়ালো যে, জগন্নাথ মহারাজের আভিজাত্যের অংশে পরিগত হলো।

রাজ্যপালের ছিলো তিনি রাণী। রাণীদের নিরাপত্তার দায়িত্বও ছিল জগন্নাথের উপর।

কোন রাণী কোথাও গেলে জগন্নাথ ঘোড়ায় চড়ে রাণীর পিছু পিছু যেতো। রাণীমহলেও জগন্নাথ ছিলো রাজকীয় আভিজাত্যের প্রতীক।

মহারাজা রাজ্যপাল মাথুরার প্রধান মন্দিরে পূজার জন্য প্রবেশ করলেন। তার পিছু পিছু জগন্নাথও পূজামণ্ডপে প্রবেশ করল। মহারাজা মর্মর পাথরের তৈরী কৃষ্ণমূর্তির পায়ে মাথা রেখে তার পাপের প্রায়শিত্ত প্রার্থনা করছিলেন আর শপথ করছিলেন তিনি মাহমুদ গয়নবীর কর্তিত মন্তক এই মন্দিরে দেবীর পদতলে এনে রাখবেন। তখন পেছন থেকে মূর্তির প্রতি করজোড় নিবেদন করে জগন্নাথ বললো, আর আমি দেবীর শপথ করছি, যদি মাহমুদকে এখানে না আনতে পারি, তাহলে নিজের মাথা নিজেই দেবীর চরণে বলিদান করবো।

জগন্নাথের কথা শুনে চকিতে পেছন ফিরে মহারাজা জগন্নাথকে দেখলেন। জগন্নাথ দুচোখ বন্ধ করে হাতজোড় করে ভজন আওড়াচ্ছিল। এমতাবস্থায় মন্দিরের প্রধান পুরোহিত তাদের সামনে দিয়ে সুগন্ধি লোবানের তশতরীতে রাখা ধূপের পাত্র ঘুরিয়ে নিল। মহারাজা ধূপের পাত্র থেকে লোবানের ভৱ্য নিয়ে কপালে লাগাল। মহারাজা গলা থেকে অত্যন্ত উচ্চে মূল্যের হারাটি খুলে মূর্তির পায়ে রেখে দিলেন।

মহারাজ! শ্রীকৃষ্ণের এই অচ্যুত হীরে-মোতির দরকার নেই, কৃষ্ণদেবীর প্রয়োজন তাজা টাটকা চমকানো রাঙা রক্ত। ভারতমাতা তার সুপুত্রদের কাছ

থেকে তাজা খুন প্রত্যাশা করে। ভারতমাতার সন্তুষ্টিহানী ও বেইজ্জিতির জন্য মহারাজাদের উচিত ছিল জগত-সংসার ত্যাগ করে বনবাসী হয়ে যাওয়া।

অবশ্যই আমরা এর প্রতিশোধ নেব। বললেন মহারাজা। মাহমুদ গফনবীর কর্তৃত মস্তক এই মন্দিরের সদর দরজায় ঝুলত দেখা যাবে। বললেন মহারাজা রাজ্যপাল।

\* \* \*

দিনের বেলা মাথুরার পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া গঙ্গা নদীতে তীর্থ্যাত্মী স্নানকারীদের এতোটাই ভিড় ছিল যে, কোথাও এক বিঘত ফাঁকও ছিলো না। ফলে মহিলাদেরকে অনেকটা দূরে গিয়ে গঙ্গাস্নানের পর্ব সারতে হতো। তীর্থ্যাত্মাদের মাথুরাগমন ও পূজা উদযাপনের অন্যতম একটি অংশ ছিল গঙ্গাস্নান। আজো হিন্দুদের ধর্মমতে গঙ্গা ও যমুনা নদী সকল পাপ ধূয়ে মুছে তীর্থ্যাত্মাদের পবিত্র করে দেয়। অনেক হিন্দু পুণ্যার্থী নাভী সমান গঙ্গাজলে নেমে পূজা-অর্চনার নানা মন্ত্র জপ করে।

এ বছরে রাজা-মহারাজাদের রাণীগণ এবং তাদের একান্ত রক্ষীতারা সাধারণ প্রজানারীদের সাথে দিনের বেলায় গঙ্গাস্নানে অংশগ্রহণকে অবমাননাকর মনে করে তারা রাতের বেলায় নিরিবিলি গঙ্গাস্নানের পর্ব সেরে নিতো।

এক সন্ধ্যায় কল্লোজের মহারাজা রাজ্যপালের কনিষ্ঠা স্ত্রী চম্পাকলি মহারাজাকে বললেন, তিনি আজ সন্ধ্যায় গঙ্গাস্নান করতে আগ্রহী। পুণ্যকাজে মহারাজা তাকে বারণ করতে পারেন না। তাই তিনি জগন্নাথকে বললেন, সে যেনো আজ রাত কিছুটা গভীর হলে ছোট রাণী চম্পাকলিকে গঙ্গাস্নানের জন্য যমুনায় নিয়ে যায়। বড় দুই রাণীকে জগন্নাথ একরাত আগেই গঙ্গাস্নান করিয়ে এনেছে। বড় দুই রাণীকে নিয়ে জগন্নাথ যমুনা তীরে দূরে দাঁড়িয়ে ছিল। রাণীদ্বয় স্নান শেষ করে এলে তাদের নিয়ে জগন্নাথ তাঁবুতে ফিরে আসে।

চম্পা বড় দুই রাণীর সাথে যায়নি। সে যুবতী ও সুন্দরী। অপর দুই রাণী বয়স্কা। মহারাজ তাদেরও সাথে এনেছিলেন। কারণ, তারা উভয়েই ছিলেন তার সন্তানের মা। মহারাজার উপর চম্পার প্রভাব ছিল বেশী। অন্য দুই রাণী এজন্য চম্পার প্রতি ঈর্ষাকাতর ছিল।

এ ষটনার প্রায় দু'বছর আগে কোন এক ব্যবসায়ীর উপটোকন হিসেবে চম্পা মহারাজার কাছে আসে। চম্পা কোন কুলীন ঘরের কন্যা ছিল না। কিন্তু বৎসরগতভাবে সে ছিল সুন্দরের অধিকারিণী। বৎশে সৌন্দর্যের প্রতীক ছিল চম্পাকলি।

মহারাজার এক জ্যায়গীরদারের নজর পড়েছিল চম্পার প্রতি। সে চম্পাকে পাওয়ার জন্য চম্পার বাবাকে বিপুল অর্ধসম্পদ উপটোকন দিয়ে চম্পাকে শ্রী হিসেবে রাখার অঙ্গীকার করে হাতিয়ে নেয়। জ্যায়গীরদার রীতিমতো শাদীর উৎসব আয়োজনও সম্পন্ন করে।

কিন্তু সবশেষে সে চম্পাকে কল্লোজ নিয়ে গিয়ে মহারাজাকে উপটোকন হিসেবে পেশ করে। মহারাজা চম্পাকে দেখে রাজপ্রাসাদে রাঞ্চিতা হিসেবে রাখার পরিবর্তে প্রথা অনুযায়ী চম্পাকে বিয়ে করে ফেলেন। মহারাজার বয়স তখন পঞ্চাশেরও বেশী। আর চম্পার বয়স মাত্র সতেরো-আঠারো।

অস্থাভাবিক সুন্দরী ও বৃদ্ধিমতী চম্পা প্রথম দিন থেকেই অর্ধবয়স্ক রাজার হন্দয়রাজ্যে আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়। আর আগের রাণীস্বয়ং প্রাসাদে পুরনো আসবাবপত্রের মতোই শুধু শোভা বর্ধনের পর্যায়ে উপনীত হলেন।

সঙ্ক্ষ্যার অঙ্গকার গাঢ় হতেই চম্পাকলি তাদের প্রাসাদোসম রাজকীয় তাঁবু থেকে বের হলো। তার সাথে ছিল একজন একান্ত সেবিকা। জগন্নাথ চম্পার জন্য বাইরে অপেক্ষণমাণ ছিল। চম্পা তাঁবু থেকে বেরিয়ে সেবিকাকে নিয়ে ঘোড়ার গাড়িতে চড়ে যেতে থাকলে জগন্নাথ তাদের অনুসরণ করলো। তারা যেতে যেতে মাথুরার চারপাশে সাময়িকভাবে তৈরী হাঙ্গারো তাঁবু এলাকা পেরিয়ে গঙ্গা নদীর সেই স্থানে এসে পৌছল, যেখানে চম্পাকলির গঙ্গাস্নান করার করা।

এই জ্যায়গাটি ছিল সাধারণ মানুষের জন্য নিষিদ্ধ। এখানটায় কোন জনমানুষের সমাগম ছিলো না। চম্পাকলি তার একান্ত সেবিকাকে বললো, তুমি ওখানে চলে যাও, যেখানে সাধারণ প্রজাদের কন্যা-জ্যায়া-বধূরা স্নান করে। জগন্নাথ নদীর পানি থেকে কিছুটা দূরেই থেমে গেল।

সেবিকা অঙ্গকারে দূরে চলে গেল। চম্পাও স্নানের উদ্দেশ্যে পানির দিকে অগ্রসর হলো। কিন্তু সে স্নান না সেরে কিছুক্ষণের মধ্যেই ফিরে এলো।

“এদিকে এসো জগন! আমার সেবিকা চলে গেছে। ওকে আমি দেরী করে আসতে বলেছি।” জগন্নাথকে ডেকে বলল চম্পা।

চম্পার ডাকে জগন্নাথ তার পাশে এগিয়ে গেল। জায়গাটি ছিল ঘুটঘুটে অক্ষকার। তদুপরি বোপঝাড়ে ভরা। অনেক দূরে দেখা যাচ্ছিল এক শূশানের চিতায় কোন হিন্দুর মরদেহ সৎকারের অগ্নিশূলিঙ্গ। তার সামনে দিয়ে নদীর বুক চিড়ে এগিয়ে যাচ্ছিল দুটি নৌকা। নৌকাগুলোকে মনে হচ্ছিল জুলন্ত মশাল যেনেো পানির উপর সাঁতার কেটে এগছে। চম্পা জগন্নাথকে দুর্বাধাসের উপর বসিয়ে নিজের মাথা জগন্নাথের উরুতে রেখে মাটিতে শয়ে পড়ল।

“জগন! তুমি পাশে না থাকলে আমি এই রাজাকে হয় বিষ খাওয়াতাম, নয়তো নিজেই বিষ পান করতাম। জগন্নাথের আঙুলে বিলি কেটে চম্পা বলল। কিন্তু আমি দেখছি, রাজাকে তুমি এতোটাই ভালোবাসো যে, তুমি কোন অবস্থাতেই তাকে ছাড়তে চাও না।

এই রাজমহল আর তার রাজার চাকরীই কি তোমার কাছে জীবনের সবচেয়ে প্রিয়! কিন্তু আমার কাছে এই রাজপ্রাসাদ, এই রাজকীয়তা, রাণীর বেশ একেবারেই পানসে, অসহ্য। তুমি আমার সঙ্গে থাকলে আমি জগতের মানুষকে দেখিয়ে দিতাম, জীবনের কাছে এসব রাজপ্রাসাদ-রাজকীয়তা নেহায়েতই তুচ্ছ। তুমি সাথে থাকলে আমি বনবাসেও থাকতে রাজি। মাটির ডেড়াও আমার কাছে এই প্রাণস্পন্দনহীন প্রাসাদের চেয়ে উত্তম।

আচ্ছা জগন! তুমি এই বন্দিশালা থেকে কেন বের হও না? তুমি কেনে আমাকে এই প্রাসাদের ঘেরাও থেকে মুক্ত বাতাসে নিয়ে যাও না? কতো দিন পর্যন্ত আমরা এভাবে চুরি চুপকি করে মিলিত হবো?”

“একথা তো তুমি আমাকে শতবার বলেছো। আর আমি প্রতিবারই তোমাকে বলেছি, একটু ধৈর্য ধরো, সুযোগের অপেক্ষা করো; সময়-সুযোগ হলে আমি ঠিকই তোমাকে এখান থেকে বের করে নিয়ে যাবো। চম্পাকলির চেহারায় আলতোভাবে হাত বোলাতে বোলাতে বললো জগন্নাথ।

আজ আবারো আমি তোমাকে স্বরণ করিয়ে দিতে চাই, এসব আবেগ বেশীক্ষণ থাকে না। আজ যদি তুমি আমার হাত ধরে প্রাসাদ ছেড়ে চলে যাও, তবে কদিন পরেই তুমি আবার এই প্রাসাদ ত্যাগের যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে উঠবে। জানো, পৃথিবীতে আমার দুহাত জমিনও নেই। আমার হাতে কোন অর্থকর্ত্তিও

নেই। বলতে গেলে আমার অবস্থা অনেকটা অপরাধীর মতো। এমতাবস্থায় আমাকে যেখানেই পাকড়াও করা হবে, সেখানেই হত্যা করা হবে।'

তুমি তো ভেরা থেকে এসেছো, সেখানে মুসলিম শাসন চলছে। আমরা যদি পালিয়ে ওখানে চলে যাই আর সেখানে গিয়ে মুসলমান হয়ে যাই, তাহলে মুসলমানরা কি আমাদের ঠাই দেবে না?

আমার এখন ধর্মের প্রতিও বিত্তৰ্ণ ধরে গেছে। বলে উঠে বসতে বসতে চম্পাকলি বললো, জানো আমি ইচ্ছা করলে যে কোন মুহূর্তে মহারাজাকে বিষ পান করাতে পারি। মরে গেলে তুমি আমাকে নিয়ে চলে যাবে। রাজা মরে গেলে আমাদের আর পাকড়াও করার কে থাকবে?

ওই যে চিতায় আগুন দেখতে পাচ্ছো, দূরের শূশানে মরদেহ পোড়ানোর আগুনের দিকে ইশারা করে চম্পাকে জগন্নাথ বললো, মহারাজা মারা গেলে তোমাকে চিতার আগুনে পুড়ে সতীদাহ হতে হবে। তোমাকে জীবন্ত মহারাজের চিতায় তুলে দেয়া হবে। আমার উপর বিশ্বাস রাখো চম্পা, আমি তোমাকে ধোঁকা দেবো না।'

তুমি তো ভেরাতে গয়নী বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছো, তাই না? আচ্ছা, ওরা কি খুব বেশী শক্তিশালী আমাদের রাজপুতরা তাদের পরাজিত করতে পারছে না কেন?

"হ্যাঁ, গয়নীর সৈন্যরা খুবই শক্তিশালী। মুসলমানদের সৈন্যসংখ্যা যতো কম থাকে, তাদের শক্তি ততেই বেশী থাকে। মুসলমান সৈন্যরা মহারাজা ভীমপালের হাঁটু ভেঙ্গে দিয়েছে। এখন তার কাছ থেকে খিরাজ নিজে।

কাশীরে পরাজিত হয়ে ফেরার সময় সুলতান মাহমুদের হাতে সৈন্য খুব কম ছিল এবং সবাই ছিল আহত। কিন্তু এসব মুষ্টিমেয় আহত সৈন্য মহারাজ ভীমপালের এলাকা দিয়ে অতিক্রম করার সময়ও অর্ধমৃত এই সৈন্যদের উপর আক্রমণ করে সুলতান মাহমুদসহ তাদের বন্দী করার সাহস হয়নি ভীমপাল মহারাজার।

জগন্নাথ, তুমি তো ধর্মের খুবই ভক্ত। যদি কিছু মনে না করো, তাহলে আমি আজ তোমাকে দু'টি কথা বলতে চাই। জগন্নাথের কোমর পেঁচিয়ে ধরে বললো চম্পাকলি। দেখো জগন! পুরোহিতরা আমাদেরকে দেবদেবীদের অভিশাপের ভয় দেখায়। তারা বলে, মুসলমানরা আমাদের যেসব দেবদেবীর

মৃত্তি ধ্বংস করে দিয়েছে, যেসব মন্দির মিসমার করে দিয়েছে, সেইসব আমাদের অভিশাপ দেবে।...

কিন্তু এতোটা সময় পেরিয়ে গেলো, আমি তো কোথাও দেবদেবীদের অভিশাপ পড়ার কথা শুনলাম না। বরং আমি তো দেখছি গফনী বাহিনী আমাদের উপর অভিশাপ হয়ে আসছে।

আমি শুনেছি, মুসলমানরা এমন প্রভুর ইবাদত করে, যিনি নিরাকার, কেউ তাকে দেখতে পায় না। আমার তো মনে হয় সেই খোদা-ই হয়তো সত্য খোদা। আমরা ছেটকাল থেকে থানেশ্বরের বিষ্ণুদেব সম্পর্কে শুনেছি, যারা বিষ্ণুদেবের পূজা করে, তারা কখনো পরাজিত হয় না। কিন্তু গফনী সুলতানের আক্রমণ থেকে সেই বিষ্ণুদেবকেও কেউ রক্ষা করতে পারলো না। পূজারীদেরও বাঁচাতে পারলো না কেউ।

দেবতা নিজেও পারল না নিজেকে রক্ষা করতে। তুমি কি এসব দেবদেবীকে বিশ্বাস করে পূজা করো।'

'তুমি জীবনবিমুখ হয়ে বিষয়ে উঠেছো। ফলে ধর্ম সম্পর্কে বিভাগিত শিকার হয়েছো। এজন্য ধর্ম সম্পর্কে যাচ্ছেতাই বলছো চম্পা।' চম্পার রেশমী চুলে বিলি কাটতে কাটতে বললো জগন্নাথ। ধর্ম সম্পর্কে তোমার মনে যা ইচ্ছা বলো, কিন্তু আমার ভালোবাসায় সন্দেহ পোষণ করো না।'

"তোমার প্রতি আমার মনে কোন সন্দেহ নেই। তুমি প্রেমের প্রশ্নে আমাকে যতো কঠিন পরীক্ষায়ই করো না কেন, আমি ঠিকই শতভাগ উত্তরে যাবো। কিন্তু ধর্মের ব্যাপারে আমি কোন ধরনের ত্যাগ স্বীকার করতে রাজি নই।' জগন্নাথকে বললো চম্পা।

ইত্যবসরে সেবিকা গলা খাকারী দিয়ে তার উপস্থিতি জানান দিল। চম্পা রাণী বসা থেকে উঠে দাঁড়িয়ে হাঁটা শুরু করল। জগন্নাথ তার জায়গায় বসে রাইল। কিছুক্ষণ পর রাণী জগন্নাথকে ডাকার উদ্দেশ্যে রাণীদের ব্যবহার্য বিশেষ আওয়াজ দিল এবং সেবিকাকে নিয়ে আগে আগে হাঁটতে শুরু করল।

\* \* \*

পরদিন মহারাজা রাজ্যপাল জগন্নাথকে ডেকে বললেন, জগন্নাথ, আজ তোমার ছুটি। তুমি স্বাধীনভাবে যেখানে ইচ্ছা ঘুরে বেড়াতে পারো।'

জগন্নাথ মহারাজার অনুমতি নিয়ে রাজকীয় পোশাক পরিধান করে কোমরে তরবারী ঝুলিয়ে বেরিয়ে পড়ল।

মাথুরা জুড়ে লাখো মানুষের সমাগম। চতুর্দিকেই মানুষ আর মানুষ। গোটা মাথুরা এলাকা যেনো এক বিশাল মেলায় পরিণত হলো। উৎসব উপলক্ষে জায়গায় জায়গায় গনক, জ্যোতিষী ও সাধু-সন্ন্যাসীরা তাদের মজমা বসিয়ে মানুষদের গোল লাগিয়ে লাগল। অনেক জায়গায় কবিয়ালরা গানের আসর জমালো, নর্তকীরা নাচের আসর জমালো, কেউ বা শারীরিক নানা কসরত খেলা দেখিয়ে দর্শক শ্রোতা ও আগত লোকদের মাতিয়ে রাখল।

লোকজন জ্যোতিষী ও গণকদের কাছে তাদের হাত দেখিয়ে তাদের ভাগ্য জানার চেষ্টা করছিল। সাধুরা মজমা জমিয়ে পুণ্যার্থীদের প্রসাদ বিতরণ করছিল। জগন্নাথ প্রতিটি মজমাতে একটু উঁকি দিয়ে ঘটনা আঁচ করে আবার অন্যখানে উঁকি দিছিল।

যেতে যেতে সে একটি গাছের নিচে দু' সাধু সন্তুকে বসা দেখল। তাদের শুধু আক্রম্যে ঢাকা আর সারা শরীর উলঙ্গ। গা জুড়ে ধূপ ভৱের প্রলেপ। মাথায় দীর্ঘ চুল। চুলগুলো ছাই-ভয়ে জটবাঁধা। তাদের দীর্ঘ দাঢ়িও জটবাঁধা। জটাধারী এই সাধু সন্তুদের ঘিরে বহু লোকের মজমা।

জগন্নাথ এই মজমায় গিয়ে উঁকি দিল। সে ভেতরের অবস্থা দেখা ও বোঝার জন্য দাঁড়াতেই এক লোক সাধুদের জিজ্ঞেস করল-

'সাধুবাবা! আমাদেরকে ওই দুরাচার মেচাদের কথা কিছু বলুন, যারা পাহাড়ের ওপাশ থেকে এসে আমাদের মন্দিরগুলোকে ধ্বংস করে চলে যায়?' "

"মুসলমানরা.....। এরা লোভী। সম্পদের লোভেই এরা ভারতে আসে। তাই এরা আমাদের মন্দিরের সম্পদ লুট করে চলে যায়। এরা আমাদের কোন দেবদেবীকে ভয় করে না। ওরা জানে না, মহাভারতে বাসুদেব ও বিষ্ণুদেবের যে ক্রেত্রের কথা বলা হয়েছে তা সত্য।"

দেবদেবীর ক্রোধ অবশ্যই মুসলমানদের উপর পড়ছে যদিও এখন তা আমাদের উপর পড়ছে। গফনীর বাদশা মাহমুদ খুবই জালেম ও আগ্রাসী। সে যেদিকে অভিযান চালায়, বানের পানির মতো আসতে থাকে, তার সামনে কেউ

দাঁড়াতে পারে না, জঙ্গীহাতিও পালিয়ে যায়। নদীর তীব্র শ্রোতও তার পথ  
দ্রব্যতে পারে না। পাহাড়ও তার অগ্রভিয়ান থামাতে পারে না।

এই সন্ন্যাসী মুসলমানদের বদনাম করছিল। কিন্তু মুসলমানদের সম্পর্কে  
হিন্দু তীর্থযাত্রীদের মনে আতঙ্ক ছড়িয়ে দিছিল। এই সন্ন্যাসী তীর্থযাত্রীদেরকে  
গয়নী বাহিনীর এমন কিছু ভয়াবহ অভিযানের কথা বললো, যা শুনে আতঙ্কে  
শ্রোতাদের চোখ উল্টে যাওয়ার অবস্থা হলো।

জগন্নাথ নীরবে দাঁড়িয়ে সবকিছুই শুনছিল। কথা বলতে বলতে এক পর্যায়ে  
জগন্নাথের উপর সন্ন্যাসীর চোখ পড়লে হঠাৎ ক্ষণিকের জন্যে সন্ন্যাসীর ঘবান  
বক্ষ হয়ে গেলো এবং কালবিলৰ না করেই আবার সন্ন্যাসীর কথা চলতে  
থাকল।

এক পর্যায়ে সন্ন্যাসী দেবদেবীদের ক্রোধ থেকে বাঁচার প্রসঙ্গ নিয়ে  
আলোচনা শুরু করল। কিছুক্ষণ পর জগন্নাথ ওখান থেকে সরে গেল।

ঘুরতে ঘুরতে একটি পুরনো মন্দিরের সিঁড়িতে গিয়ে দাঁড়াল জগন্নাথ।  
সেখানে দাঁড়িয়ে সেই দুই সন্ন্যাসীকে জগন্নাথ আসতে দেখতে পেলো। তাদের  
দেখেও জগন্নাথ সিঁড়ি ভেঙে উপরে উঠতে লাগল। এই মন্দিরটি ছিল  
পরিত্যাক্ত। এর কিছু অংশ ভগ্নস্তূপে পরিণত হলো। হঠাৎ সে শুনতে পেল  
'তাশ!'

ডাক শুনেও সে থামল না এবং পেছনে ফিরেও দেখলো না, আবার সে  
শুনতে পেল, 'তাশ! তাশকীন!'

একমনে সিঁড়ি ভেঙে উপরে উঠতে লাগল জগন্নাথ। উভয় সন্ন্যাসী  
তাড়াতাড়ি সিঁড়ি ভেঙে উপরে উঠতে উঠতে বললো, 'আরে' আমীর বিন  
তাশকীন!' এবার দাঁড়াল জগন্নাথ এবং তার চেহারায় ক্ষোভের অভিব্যক্তি ফুটে  
উঠলো।

'আরে এখানে কেউ শুনতে পাবে না। ভয় করো না।' বললো দুই সন্ন্যাসী।

জগন্নাথকৃপী তাশকীন সন্ন্যাসী হিশাম সমরকন্দীর কানে কানে বললো,  
'হিশাম সমরকন্দী! কেউ না শনলেও আমার নাম ধরে ডাকা তোমাদের উচিত  
হয়নি। তোমরা নির্বোধ হয়ে গেলো নাকি? এখানে বসো। আমি আমার হাত  
দেখাচ্ছি।

আমার হাত ধরে দেখতে থাকবে এবং কথা বলতে থাকবে। তোমরা দুজন ছাড়া এখানে আরো কি কেউ আছে?”

“আরো দু’জন আছে। জবাব দিল সন্ন্যাসীরপী হিশাম। ওরাও কায়সের মতোই মুশরেফ তথা গোয়েন্দা। তারাও সন্ন্যাসীরপেই অবস্থান করছে।”

বহিদিশে গোয়েন্দাকাজে নিয়োজিত ব্যক্তিদেরকে গয়নী সালতানাতে ‘মুশরেফ’ বলে ডাকা হতো। সুলতান মাহমুদের গোয়েন্দা বিভাগের অভিজ্ঞ কর্মকর্তারা স্থানীয় লোকদেরও তাদের পক্ষে চর নিয়োগ করতো এবং তাদেরকে বিপুল আর্থিক ভাতা দিতো।

সন্ন্যাসীরপী এই দুজনের নেতা ছিল গয়নীর গোয়েন্দা বিভাগের অন্যতম কর্মকর্তা হিশাম সমরকন্দী। মাথুরায় ভারতের বিপুলসংখ্যক হিন্দু সমাবেশ ঘটতে যাওয়ার খবর শুনে তাকে মুলতান থেকে মাথুরায় পাঠানো হয়। সে স্থানীয় লোকদের সাথে নিয়ে সন্ন্যাসীরপে তীর্থযাত্রী হিন্দুদের মধ্যে মুসলমানদের সম্পর্কে আরো আতঙ্ক ছড়িয়ে দিতে লাগল।

হিশামের সঙ্গী সন্ন্যাসীরপী অপর গোয়েন্দা ছিল মুলতানের অধিবাসী কায়েস। তারা দু’জন ছাড়াও আরো দু’জন মুলতানী মাথুরায় তৎপর ছিল। তারা হিন্দু সমাবেশের কোথাও ছম্ববেশ ধারণ করে কাজ চালিয়ে যাচ্ছিল।

হিশাম ভিড়ের মধ্যে জগন্নাথরপী আমীর বিন তাশকিনকে চিনে ফেলে। কারণ, তারা উভয়েই ছিল গয়নীর অধিবাসী। কিন্তু কর্মসূত্রে হিন্দুস্তানে এই তাদের প্রথম সাক্ষাত। কিন্তু কায়েস তাশকিনকে চিনতো না। এরা প্রত্যেকেই স্থানীয় হিন্দুদের রীতি-রেওয়াজ ও কৃষ্ণকালচার নিপুণভাবে রঙ করেছিল। হিন্দু ধর্মের খুটিনাটি সম্পর্কেও তারা ছিল জ্ঞাত।

‘তোমার ঠিকানা কোথায়? তাশকিনকে জিজ্ঞেস করল হিশাম। কাজের কাজ কিছু করতে পেরেছো?’

“আমি চলে যাচ্ছি! হিন্দুর বেশ ধারণ করে এখানে এসেছিলাম, এখন কাজ শেষ করে চলে যাচ্ছি।” বললো তাশকিন।

আরে! তুমি আমাদের কাছে নিজেকে আড়াল করছো কেন? হেসে বললো হিশাম। আমি তোমাকে মহারাজা কল্পৌজের সাথে দেখেছি। তুমি হয়তো তার নিরাপত্তারক্ষী হিসেবে নিয়োগ পেয়েছো। তোমাকে দেখে কিন্তু তুমি যে

আমাদের তাশকীন তাতে মোটেও সন্দেহ হয়নি। তোমাকে তো আমি উত্তাদ  
মনে করি।”

“আমাদের তিনজনের একসঙ্গে এক জায়গায় বসে থাকা ঠিক হচ্ছে না।”  
বললো তাশকীন। কায়স! তুমি একটু ঘোরাফেরা করো। রাতে আবার আমরা  
একসঙ্গে মিলিত হবো।”

কায়েসের চলে যাওয়ার পর আমের বিন তাশকীন হিশামের উদ্দেশ্যে  
বললো, হিশাম! তুমি তো আন্ত একটা বোকা দেখছি। তুমি স্থানীয় লোকদের  
উপর এতোটাই আস্থা ও বিশ্বাস রাখো যে, আমার মতো স্পর্শকাতর অবস্থানে  
থাকা ব্যক্তির কথাও তুমি তাকে জানিয়ে দিলে? তাকে কি তুমি শুরুত্বপূর্ণ  
কাজে পরীক্ষা করেছো? সে কি কোন জটিল কাজ সমাধা করেছে?”

“লোকটি নির্ভরযোগ্য। অবশ্য তাকে এখনো স্পর্শকাতর কোন ক্রাজে  
ব্যবহার করিনি।” বললো হিশাম।

“আস্ত্রাহ যেনো তাকে নির্ভরযোগ্য রাখেন। বললো তাশকীন। তবে মনে  
রাখবে হিশাম! আমাদের কাজ খুবই স্পর্শকাতর ও জটিল। তুমি তো জানো এ  
কাজে নিজের আবেগ, উচ্ছাস, অনুভূতিকে কিভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে হয়। আর  
এই আবেগ সে-ই নিয়ন্ত্রণ করতে পারে, যার মধ্যে পরিপূর্ণ ঈমান আছে এবং  
যারা আমাদের মতো জাতির প্রতি দায়বদ্ধ।

হিন্দুস্তানের কোন মুসলমানের উপর এতোটা ভরসা করা যায় না। এসব  
লোক দীর্ঘদিন ধরে হিন্দুদের যাঁতাকলে নিষ্পেষিত। এরা হিন্দুদের প্রভাবে খুব  
অল্প সময়েই প্রভাবিত হয়ে যায়। এরা হিন্দুদের কুসংস্কার ও হিন্দু কালচার খুব  
সহজেই গ্রহণ করে ফেলে। নিজেদের অক্ষমতা ও নানা অসুবিধার শিকার হলে  
এরা হিন্দুদের সন্তুষ্ট করার জন্য উদ্যোব হয়ে যায়।

এখানকার কোন মুসলমানকে নির্ভরযোগ্য মনে হলেও আমার মতো জটিল  
কাজে নিয়োজিত ব্যক্তিদের তথ্য দেয়া ঠিক নয়। কারণ, এখানকার হিন্দু  
শাসকরা সামান্য সন্দেহ হলেই মুসলমানদের ঘরবাড়ী জুলিয়ে দেয়, তাদের  
নির্বিচারে হত্যা করে।”

‘ঠিক আছে, আমি ওকে আরো পাকাপোক করে নেবো।’ বললো হিশাম।

‘হিশাম, এ লোক আমাকে কঠোরের মহারাজার সাথে দেখেছে। এখন সে  
আমার পরিচয়ও জেনে গেছে। সে যদি কোন কারণে হিন্দুদের হাতে ধরা পড়ে

অথবা হিন্দুদের পক্ষ থেকে লোভনীয় কোন উপটোকনের টোপ পায়, তাহলে সে আমাকে ধরিয়ে দিতে পারে। যে কোন অবস্থায় তার জন্য আমি মোটা অংকের শিকার।

‘একটু ভেবে দেখো! আমি কল্লোজের মহারাজার একান্ত নিরাপত্তা রক্ষী। সবাই আমাকে জগন্নাথ বলেই জানে। এমতাবস্থায় আমাকে যদি কেউ স্বরূপে ধরিয়ে দিতে পারে, তাহলে মহারাজা তাকে তার দেহের ওজন পরিমাণ হীরা-জহুরত উপটোকন দিতে বিন্মুমাত্র কৃষ্ণাবোধ করবে না।’

‘তুমি যদি তাকে সন্দেহ করো, তাহলে আজই আমি তাকে হত্যা করে লাশ গায়ের করে ফেলবো।’ বললো হিশাম। আমি এখন আমার ভুল বুঝতে পেরেছি। আমি দুঃখিত।’

‘না, সংশয়ের বশীভূত হয়ে কারো জীবনহানি ঘটানো ঠিক হবে না।’ বললো তাশকীন। এর চেয়ে বরং তার উপর কড়া দৃষ্টি রাখো এবং তাকে ঈমান ও উদ্দেশ্যে সম্পর্কে আরো পাকাপোক করার চেষ্টা করো।’

‘আমরা যা করছি, তা তোমার কাছে কি ভালো লেগেছে?’ তাশকীনের কাছে জানতে চাইলো হিশাম। এখানকার সাধারণ মানুষজনকে মন্দিরের পূরোহিত এবং পশ্চিতরাই আতঙ্কিত করে ফেলেছিল। এর উপর আমরা আতঙ্কের মাত্রাটি আরো বাড়িয়ে দিলাম।

এখানকার লোকেরা হিন্দু সাধু-জ্যোতিষী-সন্ন্যাসী- গণকদের সৰ্ব্যের মিথ্যা কথাগুলো সম্পূর্ণ সত্য বলে বিশ্বাস করে। এই বিশ্বাসকে কেন্দ্র করে আমরা সন্ন্যাসীরূপ ধারণ করে তাদের বোঝাচ্ছি, মাহমুদ গফনবীর কাছে জিন ভূত থাকে। এসব জিন-দানবেরা সামরিক-বেসামরিক সব ধরনের প্রতিপক্ষকে গ্রাস করে আর সামনে দুর্গ-দেয়াল-পাহাড়-পর্বত যাই থাকুক না কেন সবকিছু তচ্ছন্ছ করে ফেলে...।

এর ফলে এখানকার মা-বোন-স্ত্রীরা তাদের স্বামী-পুত্র ভাইদের সেনাবাহিনীতে যেতে দেবে না। তারা কিছুতেই চাইবে না, তাদের ঘর উজাড় করে আপনজনেরা বেঘোরে মুসলমানদের হাতে প্রাণ বিজ্ঞেন দিক...। আচ্ছা তুমি ওখানে কী করছো তাশকীন?’

‘কল্লোজের মহারাজার ভবিষ্যত পরিকল্পনা জানার ও বোঝার চেষ্টা করছি।’ বললো তাশকীন। মহারাজা সুলতানের প্রতি খুবই ক্ষুঢ়। যেসব

রাজা-মহারাজা গয়নী বাহিনীর হাতে পরাজিতি হয়েছে, তাদের খুবই গালমন্দ করে। এখানে ভারতের অধিকাংশ রাজা-মহারাজারা এসেছে। তাদের একটা বৈঠক হবে। সেই বৈঠকে তারা ভবিষ্যত কর্মসূচী ঠিক করবে। তখন বোধা যাবে, তারা কী করতে চায়?”

“সুলতানের পক্ষে এখনই কোন অভিযানে বের হওয়া সম্ভব নয় তুমি কি সেই খবর জানো তাশকীন? বললো হিশাম।

‘হ্যা, খাওয়ারিজমে সুলতানের খুবই রক্তক্ষয়ী একটি যুদ্ধ করতে হয়েছে। হিশামের অসমাঞ্ছ কথা পূর্ণ করে বললো তাশকীন। এসব খবর যথাসময়েই আমি পেয়েছি।

সুলতানও জানেন, লাহোরের মহারাজা ভীমপাল কন্নৌজের মহারাজাকে সুলতানের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত লড়াইয়ের জন্য উৎসাহ দিচ্ছে। আমার এখানে আসতে হয়েছে কন্নৌজের মহারাজার তৎপরতা জানার জন্য।

এরা কি গয়নী আক্রমণ করতে চায়? না ভারতের সব রাজা মহারাজারা ঐক্যবন্ধ সেন্য সমাবেশ ঘটিয়ে সুলতানকে হ্যাকি দিতে চায়? এরা হয়তো সম্প্রিলিতভাবে সেনা সমাবেশ করে সুলতানকে পরাজিতি করার চেষ্টা করবে। আমার কাজ হলো এখনকার রাজা মহারাজাদের সামরিক শক্তির আন্দাজ করা এবং এরা কি সামরিক কৌশল নেয় তা জানা।”

“ও, এজন্যই হয়তো আমাদের বলা হয়েছে, মাথুরার হিন্দু সমাবেশে জনগণের মধ্যে গয়নী বাহিনী সম্পর্কে আতঙ্ক ছড়িয়ে দিতে।”

“এখন তুমি চলে যাও। বললো তাশকীন। মনে রেখো, স্থানীয় গোয়েন্দা মুশরেফদের উপর এতেটা নির্ভরশীলতা ঠিক নয়। এদেরকে কৌশলে ব্যবহার করো।”

\* \* \*

সে দিন সন্ধ্যায় চতুর্দিক অক্ষকার করে কাকের চোখের মতো নীল হয়ে গেল আকাশ। সেদিন মাথুরায় আগত সকল রাজা-মহারাজাদের দাওয়াত ছিল কন্নৌজের মহারাজার আস্তানায়।

মহারাজা কন্নৌজের রাজকীয় তাঁবুতে নানা বর্ণের ফানুস ও বাহারী শামিয়ানা দিয়ে সাজানো হলো। কন্নৌজ মহারাজার তাঁবু ছিলো বিশাল জায়গা

জুড়ে। এর ভেতরে নিরাপত্তারক্ষী, রাণীদের থাকার কক্ষ, রাজাৰ বৈষ্ঠকখানা, মহারাজার আরামের কক্ষ, সেবক সেবিকাদের থাকার কক্ষ, নর্তকী, গাহ্যক বাদকদলের জন্য আলাদা থাকার বৃক্ষ ছিল। তাঁবু তো নয়, যেন বিশাল ময়দান জুড়ে এক রাজমহল।

জিয়াফত অনুষ্ঠানে রাজা মহারাজাদের শরাব পান করানোর জন্য নিয়ে আসা হয়েছিল সুন্দরী যুবতী ও প্রশিক্ষিত তরঙ্গী। এরা অর্ধনগু পোশাকে সজ্জিত হয়ে রাজ-মহারাজাদের আপ্যায়ন করছিল।

অধিকাংশ রাজা-মহারাজাদের সাথে ছিলো দু-তিনজন করে রাণী। অনেক রাজা-মহারাজার একান্ত নিরাপত্তারক্ষীও তাদের সাথেই ছিল। আমীর বিন তাশকীন একান্ত নিরাপত্তারক্ষী হিসেবে কল্লোজের মহারাজার পেছনে সশস্ত্র অবস্থায় দণ্ডায়মান ছিল। খাবার-দাবার চলার সময় চম্পারাণী আড়চোখে বারকয়েক জগন্নাথকুপী আমীর বিন তাশকীনকে দেখে নিল। কিন্তু তাতে তাশকীনের কোন ভাবাবেগ ঘটলো না, সে মন্দিরের পাথুরে মূর্তিৰ মতোই নির্বাক দাঁড়িয়ে রইল।

আহারপর্ব শেষ হলে বাদ্যযন্ত্রের বাজনা শুরু হলো। বাজনার আওয়াজ যখন উচ্চাঙ্গে উঠলো, তখন মঞ্চের এক কোণ থেকে সাদা ওড়না গায়ে জড়িয়ে পায়রার মতো পাখনা মেলে নাচের মুদ্রায় দৃশ্যমান হলো এক নর্তকী।

ঠিক এই সময়ে বজ্রপাতের মতো গর্জে উঠলো এক রাশভারী কষ্ট- “বন্ধ করো এসব পাপাচার!”

সাথে সাথে বন্ধ হয়ে গেলো বাদকদলের উন্ন্যাতাল বাদ্যযন্ত্রের আওয়াজ আর নিমিষেই অদৃশ্য হয়ে গেলো নর্তকী।

সবাই অবাক চোখে দেখলো মঞ্চের মাঝখানে মাথুরার বড় মন্দিরের প্রধান পুরোহিত অগ্নিমূর্তি ধারণ করে দণ্ডায়মান। ক্ষোভে তার ঢোঁট কাঁপছে। দুচোখে যেন আগুন ঠিকরে পড়ছে। প্রধান পুরোহিতের এই অগ্নিমূর্তি দেখে রাজা-মহারাজা ও রাণীদের এই প্রমোদ মহলে নীরবতা নেমে এলো। আবারো ধ্বনিত হলো গঞ্জীৰ কষ্ট “ব্রহ্মোষিত নির্তীক মহারাজা ভীমপাল গযনীৰ সুলতানেৰ কাছে শোচনীয়ভাবে পৰাজতি হয়ে তার সাথে অধীনতামূলক চুক্তি করেছে। তোমো কি এৱ জন্য উৎসব কৰছো?” ক্ষুক্র পুরোহিত কাঁপা কাঁপা ঢোঁটে বললো।

তোমরা কি দেবদেবীদের অপমানের আনন্দ-উৎসব করছো? তোমাদের ধর্মালয় মন্দিরগুলোর উপর দিয়ে মুসলমানরা তাদের জঙ্গী ঘোড়া ছুটিয়েছে এজন্য কি তোমরা নর্তকীদের সাথে নিয়ে এসেছো?

রাজপুতদের তাজা রক্ত বরফের মতো ঠাণ্ডা হয়ে গেছে এজন্য আনন্দ করছো তোমরাঃ! নর্তকী নাচিয়ে কী আনন্দ করবে, তোমরা নিজেরাই পায়ে নূপুর আর হাতে ছুড়ি পরে নাচো...।”

“আমাদের ক্ষমা করে দিন পঞ্জিত মহারাজ।” এক রাজা দাঁড়িয়ে দুঃহাত জোড় করে বললো। আজ আমরা এই ফায়সালা করার জন্যই একত্রিত হয়েছি— গবনী বাহিনীকে কী করে চিরদিনের জন্য স্তুতি করে দেয়া যায়?

“তোমাদের সবার উপর শ্রীকৃষ্ণ ও বাসুদেবের গংজব আসি আসি করছে। তোমাদের কারণেই আবারো ভারতের মাটিতে অগণিত মুহাম্মদ বিন কাসিম জন্ম নিচ্ছে। এ কারণে তোমরা দেবদেবীদের অভিশাপ থেকে বেরাই পাবে না।”

পঞ্জিতের কথা শেষ হতে না হতেই আকাশে তুমুল মেঘের গর্জন শোনা গেল। সন্ধ্যার আগ থেকেই আকাশে মেঘ জমতে শুরু করেছিল এবং চারদিকে নেমে এসেছিল ঘুটঘুটে অঙ্ককার। হালকা বিজলীও চমকাচ্ছিল। কিন্তু মেঘের তর্জন গর্জন বেড়ে দেখতে দেখতে তীব্র হয়ে উঠলো আকাশের গর্জন। এরই মধ্যে পঞ্জিত রাজা-মহারাজাদের তুচ্ছ-তাছিল্য করছিল এবং তাদেরকে সনাতন ধর্ম রক্ষায় অবহেলা ও উদাসীনতার জন্য দোষারোপ করছিল। রাজা মহারাজাদেরকে পঞ্জিত দেবদেবীদের অভিশাপের ভয় দেখাচ্ছিল।

হঠাতে ঝুলস্ত ঝাড়বাতিগুলো খুব জোরে দুলে উঠলো এবং টাঙ্গানো শামিয়ানার সাথে হেঁচট খেলো। শামিয়ানাগুলো উপরে উঠে গেল তীব্র বাতাসের ধাক্কায়। দেখতে দেখতে এমন তীব্র বাতাস বইতে শুরু করলো যে, তাঁবুগুলোকে সামলানো কঠিন হয়ে পড়ল। মুহূর্তের মধ্যে তীব্র বাতাস রূপ নিলো প্রচণ্ড ঝড়ের। ঝড়ের তাঙ্গবে জুলস্ত ফানুসগুলো নিচে আছড়ে পড়ল এবং চতুর্দিকে তেল ছড়িয়ে পড়ল, শামিয়ানাগুলো ছিঁড়তে শুরু করলো। জুলস্ত ফানুস ও জুলস্ত মশালের আগুনে ছিঁড়ে পড়া শামিয়ানা ও তাঁবুতে আগুন ধরে গেল। প্রচণ্ড ঝড়ের সাথে এমন তীব্র বিজলী ও কানফাটা মেঘের গর্জন ও বজ্রপাত শুরু হলো, যেনো আসমান ভেঙে পড়তে শুরু করেছে।

ভেঙ্গেপড়া ফানুস এবং মশালের আগনে ছিঁড়ে যাওয়া তাঁবুর কাপড়ে আগন  
ধরে গেলে বাতাস তা চতুর্দিকে ছড়িয়ে দিল ; আগনের ধোয়া আর তীব্র ঝড় ও  
ঘুটঘুটে অঙ্ককারে কেউ কাউকে দেখার উপায় ছিলো না ।

এরই মধ্যে পঞ্জিতের কষ্টে শেষবাক্য উচ্চারিত হলো, এই দেখো  
বিষ্ণুদেরে অভিশাপ ঝড়ের রূপে এসে গেছে ।

ঘটনার আকস্মিকতায় হতভৱ ও আতঙ্কিত সকল রাজা-মহারাজা নিজেদের  
জীবন বাঁচানোর জন্য যে যেদিকে পারল দৌড়াতে শুরু করল । কিন্তু ততক্ষণে  
বজ্রপাত ও বিজলীর সাথে শুরু হয়েছে ভারি বর্ষণ ।

তীব্র ঝড়ের শনশন আওয়াজ, ভারি বৃষ্টি আর মেঘের গর্জনের সাথে  
বর্জপাতের আওয়াজ মিলে এক ভয়াবহ অবস্থার সৃষ্টি হলো ।

অদূরে বাঁধা রাজা-মহারাজাদের হাতি ও ঘোড়গুলো আতঙ্কিত চিন্কার ও  
হেষার করতে লাগল । অবস্থা আরো শুরুতর হয়ে উঠলো । প্রবল বৃষ্টি যখন  
তাঁবুর জুলন্ত আগন নিভিয়ে দিল এবং তুফানে ছেঁড়া-ফাটা তাঁবুর খুঁটি উড়তে  
শুরু করলো ।

রাজা-মহারাজাদের একান্ত নিরাপত্তারক্ষীরা তাদের মনিবদ্দেরকে নিরাপদ  
জায়গায় নিয়ে যাওয়ার জন্য থাণবাজী রেখে সবাই দৌড়ে অকুস্তলে পৌছালো ।  
এরই মধ্যে শোনা যাচ্ছিল মহারাজা কল্লোজের দরাজ কর্ত, জগন্নাথ ! যেখানেই  
থাকো, চম্পারামীকে মন্দিরে নিয়ে যাও ।'

সেখান থেকে মন্দির ছিল অনেক দূরে । সবাই যে যার মতো করে শহরের  
দিকে নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য ছুটছিল । গোটা তাঁবু এলাকায় দৌড় ঝাপ শুরু  
হয়ে গেল ।

এমতাবস্থায় তুফানের আঘাতে ঘন গাছগাছালীতে আকীর্ণ মাথুরার  
গাছপালগুলো ভেঙ্গে পরতে শুরু করেছে । ভাঙা গাছের ডাল মাটিতে আঁচড়ে  
পড়ে গড়িয়ে যাচ্ছে । তাশকীন রাজার বলার আগেই চম্পাকে তার আয়ত্তে নিয়ে  
এসেছিল এবং কাঁধে তুলে মন্দিরের দিকে ছুটছিল ।

শহরের চতুর্দিকে আগত লাখো হিন্দু তীর্থযাত্রীর অঙ্কায়ী তাঁবু ছিল । অনেক  
লোক তাঁবু ছাড়াই খোলা আসমানের নিচে আসবাবপত্র নিয়ে অবস্থান  
নিয়েছিল । এসব লোক তাদের আসবাবপত্র ঝড়ের দয়ার উপর ছেড়ে দিয়ে

জীবন বাঁচাতে ঝড়ের শুরুতেই শহরের দিকে দৌড়াতে শুরু করে দিল। শহরবাসী তীর্থযাত্রীদেরকে আশ্রয় দেয়ার জন্য বরবাড়ীর দরজা খুলে দিয়েছিল। মাথুরার প্রতিটি মন্দির ছিল খোলা। মানুষজন মন্দিরেও আশ্রয় নেয়ার চেষ্টা করছিল।

ঝড়ের তাওব তখন বেড়েই চলছে। সেই সাথে তীব্র বৃষ্টি, বিজলী আর বজ্রপাতের সাথে আহত-আতঙ্কিত মানুষের আর্তচিত্কার শুরু হয়ে গেল।

আতঙ্কিত শিশু, নারী ও আহতদের চিত্কারে গোটা মাথুরা এলাকা যেনো নরকে পরিণত হলো।

দৃশ্যত এ তুফান যেনো কেয়ামত হয়ে উঠেছিল। এই তুফানের মধ্যে হিশামের সহযোগী মূলতানের অধিবাসী কায়েস নদীর তীর থেকে শহরের দিকে আসছিল। সে ছিল একাকী। তীব্র তুফানের আওয়াজ, বিজলীর বলক আর মেঘের গর্জনের মধ্যে অতি নিকট থেকে তার কানে ভেসে এলো কোন নারী বা শিশুর আর্তচিত্কার।

বিজলীর আলোয় তার সামনের একটি গাছের গোড়ায় একটি নারীর মতো নজরে পড়লো এবং ওখান থেকে আবারো আর্তচিত্কার শোনা গেল। আর্তচিত্কার শুনে তীব্র বাতাসের ধাক্কা সামলে কায়েস সেদিকে দৌড়াল। গিয়ে ডালপালা উড়ে যাওয়া একটি গাছের গোড়ায় এক মহিলাকে আতঙ্কিত অবস্থায় দেখতে পেল। মহিলা ভয়ে তীরবিন্দু পাখির মতো কাঁপছে।

ভয় পেয়েছো? তুমি এখন আর একা নও, আমি তোমার সাথে আছি। আতঙ্কিত নারীকে অভয় দিতে বললো কায়েস।

এই আতঙ্কিত নারী ছিল এক পুণ্যার্থী কিশোরী। সন্ধ্যায় সে গঙ্গামান করতে নদীতে গিয়েছিল। ঠিক সেই সময় ঝাড় শুরু হয়ে যায়। সবাই যখন জীবন বাঁচানোর জন্য দৌড়াতে লাগলো, তখন অন্ধকারের মধ্যে সে সঙ্গীদের হারিয়ে ফেলেছিল। কায়েসকে দেখে আতঙ্কিত কিশোরী তাকে জড়িয়ে ধরলো।

আকাশের তীব্র গর্জন, চোখ ধাঁধানো বিজলী ও ঝড়ের প্রচণ্ডতায় কায়েসের মতো টগবগে যুবকের চলৎশক্তি হারিয়ে ফেলার উপক্রম হলো। এমন সময় তাদের অতি কাছে একটি গাছের উপর ঘটলো তীব্র শব্দে বজ্রপাত। আতঙ্কিত তরুণী বজ্রপাতের আওয়াজে মা বলে চিত্কার করে কায়েসের শরীরে এভাবে লেপ্টে গেলো, যেনো সে কায়েসের শরীরে বিলীন হয়ে নিজেকে রক্ষা করবে।

‘তীব্র ঝড়কে দেবতার ক্রোধ বিশ্বাস করে মাথুরার মন্দিরগুলোতে একটানা ঘন্টা ও শাখা বাজতে শুরু করল। ঝড়ের এই বিপদে মন্দিরের শিঙাগুলোর বেসুরো আওয়াজ যেন আক্রান্ত বাঘের গর্জন।

মন্দিরের পূজারী ও পণ্ডিতেরা কৃষ্ণ ও বাসুদেব মূর্তির পায়ে ছমড়ি খেয়ে পড়ল। মন্দিরগুলোর পণ্ডিতেরা ‘হরি হর মহাদেব’ জয় হরিহর জগদিশ’ ধ্বনি করছিল। সকল হিন্দুই এই ঝড়কে দেবতাদের ক্রোধের বহিঃপ্রকাশ বলে বিশ্বাস করেছিল।

ঘরে ঘরে হিন্দুদের মৈসব মূর্তি ছিলো, অধিবাসীরা সেইসব ক্ষুদ্র মূর্তির সামনে হাতজোড় করে আবেদন নিবেদন করেছিল। বস্তুত এটি দেবতাদের ক্রোধ, না আল্লাহর ক্রোধের বহিঃপ্রকাশ এটা বুঝার ক্ষমতা পৌত্রলিকতায় বিশ্বাসী হিন্দুদের ছিলো না। বেসুরো সিংগার আওয়াজ ঝড়ের ভয়াবহতাকে আরো বাড়িয়ে তুলেছিল।

সকল রাজা-মহারাজা, তাদের সেনাবাহিনীর বীর সেনাপতি ও ক্ষমান্তরাও এই ঝড়ের ভয়াবহতায় থরথর করে কাঁপছিল। তারা এই ঝড়কে মনে করেছিল জিনভূত ও দেও-দানবদের সংহারী যুদ্ধ। মনে হচ্ছিল, এই ঝড় দুনিয়াকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দেবে।

\* \* \*

কায়েস আতঙ্কিত তরুণীকে কাঁধে তুলে নিয়ে ঝড়ের মধ্যেই একটি জরাজীর্ণ মন্দিরের দিকে অগ্রসর হচ্ছিল। তরুণী কায়েসের গলা জড়িয়ে ধরে কায়েসের গালের সাথে তার চেহারা মিশিয়ে রেখেছিল। তরুণী ছিল অনেকটাই অচেতন। বিজলীর চমক আর বজ্রপাতের শব্দে সে খানিকটা হঁশ ফিরে পেতো।

‘তীব্র ঝড়ের মধ্যে কায়েস তরুণীকে কাঁধে নিয়ে এগুতে পারছিলো না, তার পা উপড়ে যাচ্ছিল। ঝড়ের ঝাপটায় গাছের ডালপালা নুয়ে পড়ে কায়েসকে আঘাত করার উপক্রম হল। বারবার সে পা পিছলে পড়ে যাচ্ছিল, তবুও সে তরুণীকে কাঁধ থেকে ফেলে দেয়নি।

এমন সময় প্রচণ্ড এক বজ্রপাত ঘটলো। সেই সাথে কাছে এমন এক ভয়ানক চিঞ্চকার শোনা গেল, যাতে কায়েসেরও জ্ঞান হারানোর উপক্রম হলো।

সম্পূর্ণ বেহঁশ না হলেও কিছুটা অপ্রকৃত অবস্থায় কায়েস বিজলীর আলোকে তার সামনে দেখতে পেলো দু'টি আতঙ্কিত হাতি শূর উঁচিয়ে এদিকে দৌড়ে আসছে। অবস্থা এমন যে, তার অবস্থান থেকে হাতির দূরত্ব ছিল মাত্র বিশ/ত্রিশ গজ।

আতঙ্কিত হাতি দুটো পাশাপাশি আসছিল। এর আগেই প্রচণ্ড ঝড়ের মধ্যে কাঁধে বোৰা নিয়ে কর্দমাঙ্গ পিছিল পথে অগ্রসর হতে গিয়ে কায়েসের চলৎশক্তি ফুরিয়ে আসছিল। আতঙ্কিত হাতি দুটো ভয়াবহ তীব্রতায় চিংকার করে পাশাপাশি দৌড়ে আসছিল।

অবস্থা বেগতিক দেখে হাতির পায়ে পিষ্ট হওয়া থেকে বাঁচতে কায়েস শরীরের অবশিষ্ট সবটুকু শক্তি দিয়ে ডান দিকে দৌড় দিল। কিন্তু কয়েক কদম এগোতেই পা পিছলে পড়ে গেল এবং কাঁধের তরুণীকে দূরে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিল।

নিজে হাতির পায়ে পিষ্ট হওয়ার প্রস্তুতি নিয়েই গড়িয়ে কিছুটা সরে যাওয়ার চেষ্টা করল। এমন সময় হাতি তার উপর দিয়ে চলে গেল। ছুট্টি হাতির একটি পা এসে পড়ল তার পাঁজরে।

বিজলীর বালকানিতে সহায়তাকারী হাতির পদপিষ্ট হয়েছে দেখে তরুণী চিংকার দিয়ে এসে কায়েসের গায়ের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল এবং পরম মমতায় কায়েসের মাথাটা কোলে নিয়ে বললো, ‘তুমি ঠিক আছো? ঠিক আছো কি না বল, কথা বলো। তরুণীর মমতাময়ী স্পর্শে কায়েস চোখ মেলে তাকাল এবং উঠে বসল! কিছুক্ষণ পর কায়েস তরুণীকে বলল, ঠিক আছে, আমার কিছু হয়নি।

\* \* \*

অনেকক্ষণ পর তারা একটি ভগ্নস্তূপের মতো পুরনো মন্দিরে পৌছল। মন্দিরটি ছিল জমিন থেকে অনেক উঁচুতে। কায়েস ও হিশাম, আমীর বিন তাশকীনের সাথে এই ভগ্নমন্দিরেই মিলিত হয়েছিল।

তরুণীকে বগলদাবা করে নিয়ে কায়েস মন্দিরের সিঁড়ি ভেঙে উপরে উঠতে থাকল। এক পর্যায়ে তরুণী কায়েসের পাঞ্জা ছাড়িয়ে বলল, আমাকে ছাড়, আমি নিজেই উঠতে পারব।

তখনো তুফানের তীব্রতা এতটুকু কমেনি। কিন্তু কায়েসকে স্বেচ্ছায় হাতির পদতলে পড়তে দেখে তরঙ্গীর সাহস বেড়ে গিয়েছিল। তারা দু'জন পরম্পর কোমর পেঁচিয়ে ধরে সিঁড়ি ডেঙে উপরে উঠে অঙ্কারের মধ্যেই একটি পরিত্যক্ত কক্ষে প্রবেশ করল।

কক্ষে পৌছে ঘড় তুফানের তীব্রতা থেকে নিরাপদ বোধ করলে তরঙ্গী অঙ্কারের মধ্যেই হাতড়ে কায়েসের পা জড়িয়ে ধরে পায়ে মাথা রেখে কৃতজ্ঞতা জানাল।

‘আরে, একি! আমাকে গোনাহগার বানিও না তুমি! পরম আদরে পা থেকে তরঙ্গীর মাথা তুলতে তুলতে বললো কায়েস। ঘটনার আকস্মিকতা এবং ঘোরতর জীবনহানিকর বিপদসঙ্কল পরিস্থিতিতে কায়েসের আবেগ নিয়ন্ত্রণহীন হয়ে গেল।

সে নিজের পরিচয় গোপন রাখার ব্যাপারটি একদম বিস্মিত হয়ে তরঙ্গীকে এমন ভাষায় কথা বললো যে, তার আত্মপরিচয় এক নিমিষেই উন্মোচিত হয়ে পড়েছে। কায়েস আরো বললো, ‘আমাদের ধর্মে মানুষ মানুষকে সিজদা করা পাপ। মানুষ মানুষের পায়ে সিজদা দিতে পারে না। মানুষ একমাত্র নিরাকার আল্লাহকে সিজদা দিতে পারে।’

‘তুমি কি মুসলমান?’ বিশ্঵াসিত্বত হয়ে বললো তরঙ্গী।

“আমি যদি বলি যে, আমি মুসলমান, তাহলে তুমি আমাকে তেমনই ঘৃণা করবে, যেমন একজন হিন্দু মুসলমানকে ঘৃণা করে?”

‘ঘৃণা? তোমাকে ঘৃণা করবো আমি? তুমি না হলে তো আজ আমি বেঁচেই থাকতাম না...। আচ্ছা, তুমি মুসলমান হলে তো এই তুফান যে দেবতাদের অভিশাপ তা বিশ্বাস করবে না।’

“আমি তোমার ধর্মকে অসমান করতে চাই না।” বললো কায়েস। এটা আসলে আমার প্রভুর ক্ষেত্রে বহিঃপ্রকাশ। সে ক্ষেত্রের বহিঃপ্রকাশ পাথরের তৈরী মূর্তির পূজারীদের উপর বর্ষিত হচ্ছে। এই ঘড় আল্লাহর নির্দেশে হচ্ছে। সেই আল্লাহর পক্ষ থেকেই আমি শক্তি ও সাহস পেয়েছি। যার ফলে এমন কঠিন অবস্থার মধ্যেও আমি তোমাকে কাঁধে তুলে এখানে নিয়ে আসতে পেরেছি।

-

কায়েস সাধু-সন্ন্যাসীর বেশ ধারণ করে গঙ্গাতীরে গিয়েছিল। তার পরনে ছিল একটি লেঙ্গুট মাত্র। তার মুখে ছিল কৃত্রিম দাঢ়ি এবং সারা শরীরে ছাইভৃত মাখানো ছিল। বাড়োবৃষ্টি তার শরীরের কৃত্রিম সব আবরণ ধুয়ে ফেলল এবং লেঙ্গুট কোথাও খুলে পড়ে গেল।

তরুণী তাকে জিজ্ঞেস করল, তুমি বিবৰ্ণ কেন?

সে তরুণীর প্রশ্নের জবাবে জানাল, তুফানের আগমুহূর্তে সে নদীতে গঙ্গাস্নান করতে গিয়েছিল। তীরে কাপড় রেখে সে গঙ্গাস্নানে নেমেছিল। এরপরই তুফান শুরু হয়ে যায় এবং ঝড় তার তীরে রাখা কাপড় উড়িয়ে নিয়ে যায়। অতঃপর জীবন বাঁচাতে সে এদিকে দৌড়াতে শুরু করে।

কায়েস তরুণীকে জানালো, সে মাথুরায় মেলা দেখতে এসেছিল। সে তরুণীকে জিজ্ঞেস করল, তোমার বাড়ী কোথায়?

জবাবে তরুণী বুলন্দ শহরের কোন একটা জায়গার নাম বললো। তরুণী আরো জানালো, তাদের গোটা পরিবারই এই উৎসবে এসেছে। তার বাবাও তাদের সাথে আছে। শহরের বাইরে ছিল তাদের তাঁবু।

কায়েস তরুণীকে জানাল, এখন আর সেখানে কোন তাঁবু পাওয়া যাবে না এবং গোত্রের কোন লোককেও সেখানে খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। আজ রাত এখানেই কাটাতে হবে।

যদি কিছু মনে না করো, তাহলে আমি তোমাকে একটা কথা বলতে চাই। আবেদনের সুরে থেমে থেমে বললো তরুণী।

‘তুমি একজন তরুণ যুবক। আর আমি তরুণী। এখনো আমার বিয়ে হয়নি...। রাতটা আমাদের এখানেই কাটাতে হবে।’

তরুণীর কষ্টে ছিল নিজেকে সমর্পণের আবেদন।

কায়েস বলল, দেখো, আমি নিজের জন্য তোমাকে তুলে আনিনি। তোমার মা-বাবার কাছে তোমাকে ফিরিয়ে দেয়ার জন্যই তোমাকে এনেছি...। আমি তোমার কাছ থেকে একটা প্রতীজ্ঞা নিতে চাই।... আমি যে মুসলমান একথা কাউকে জানাতে পারবে না। আমি মুসলমান জানতে পারলে হিন্দুরা আমার সাথে খুবই দুর্ব্যবহার করবে। আমি জগদিশ নামে পরিচয় দেবো।’

তরুণীর নাম ছিল উষা । ইতোমধ্যে তাদের উভয়েই উভয়ের প্রকৃত নাম জেনে গেছে । উষা কায়েসের প্রতিটি শর্ত এবং প্রতিজ্ঞা পালনের জন্য শপথ করে নিল ।

অতঃপর তারা সেই ভগ্নমন্দিরেই রাত কাটানোর সিদ্ধান্ত নিল । ক্লান্ত-শ্রান্ত যুবতী উষার দুচোখ ভেঙে ঘুম আসলেও বারবার তার ঘুম ভেঙে যাচ্ছিল । তুফানের ভয়ে ভাঙেনি, ভাঙ্গিল পরিচয় পাওয়া এই ভিন্নধর্মী মুসলমান যুবকের সংস্পর্শে রাত্যাপনের ভয়ে ।

আধো ঘুম আধো জাগ্রত অবস্থায় রাতের দ্বিপ্রহর কাটিয়ে শেষ প্রহরে উষার এমন ভারী ঘুম এলো যে, সে যখন ঘুম থেকে চোখ খুললো, তখন তার কক্ষ দিনের আলোয় আলোকিত হয়ে গেছে ।

কায়েস সেই কক্ষের দরজায় বসে ঘুমন্ত উষাকে দেখছিল । রাতের ঝড় রাতেই শেষ হয়ে গিয়েছিল । সকাল বেলায় সূর্য উঠলো বালমলে আকাশে প্রথর রৌদ্র-প্রতাপ নিয়ে । গত রাতের কেয়ামতের আলামত দিনের বেলার আকাশে মোটেও ছিল না ।

ঘুম থেকে উঠে অনেক বিশয়ে উষা কায়েসকে দেখছিল এবং কায়েসও মুক্তনয়নে উষার দিকে তাকিয়ে ছিল । কায়েস অবাক হচ্ছিল উষার ঝপ-সৌন্দর্য দেখে । জীবনে সে এমন সুন্দরী মেয়েলোক দেখেনি ।

আর উষা অবাক হচ্ছিল কায়েসের চারিত্রিক দৃঢ়তা ও তার ঝপ-যৌবন, দৈহিক সৌন্দর্য ও সুঠাম-সবল দেহসৌষ্ঠব দেখে । সবচেয়ে বেশী বিশ্বয়ের কারণ ছিল, এমন একটি টগবগে তরুণ তার মতো তরুণীকে কাছে পেয়েও একটু স্পর্শ পর্যন্ত করেনি । অথচ কেন হিন্দু যুবকের বেলায় এমনটি ভাবা যেতো না ।

বিশ্বয়ের ঘোর দূর হতেই নীরবতা ভেঙে কায়েস উষার উদ্দেশে বললো, এখন তোমার বাবা-মাকে খুঁজে বের করার পালা । উঠো, এখন তাদের খুঁজতে বের হই ।

উষার তখনো বিশ্বয়ের ঘোর কাটেনি । সে শোয়া থেকে উঠার বিন্দুমাত্র চেষ্টা করলো না । উষার চোখে কৃতজ্ঞতাবোধ ছাড়াও অন্য ব্যাপার ছিল । কায়েস তাকে আবারো তাড়া দিল । কিন্তু তবুও সে উঠলো না । কায়েস তার দিকে অগ্রসর হয়ে কাছে গিয়ে বসল । পূর্ববৎ শোয়া অবস্থায়ই উষা বললো,

“তুমি আমাকে জীবন দিয়েছো । তুমি কি এভাবে বাকী জীবনটা আমাকে নিরাপত্তা ও সুখ দিতে পারো না?”

উষার এ কথায় কায়েস কোন জবাব দিলো না ।

“দেখো, তুমি আমাকে রাতের বেলায় আকস্মিক পেয়েছো, এটা আমার কাছে স্বাভাবিক কোনো ঘটনা নয় ।” বললো উষা । এটাও আমার কাছে স্বাভাবিক ঘটনা নয় যে, তুমি এরপরও আমার গায়ে হাত দাওনি ।

তুমি আমাকে মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচিয়ে দিলেও সেই বুড়োটার হাত থেকে বাঁচাতে পারবে না, যার সাথে আমার বিয়ের কথা পাকাপোক্ত হয়ে রয়েছে । দয়া করে তুমি আমাকে সাথে নিয়ে যাও... । হিন্দু নারীদের জীবন পুরুষের পদতলেই থাকে ।

হিন্দু মেয়েদের পিতা-মাতা যার সাথে ইচ্ছা বিয়ে দিয়ে দেয় । স্বামী যদি মারা যায়, তাহলে সহমরণ হিসেবে স্বামীর জ্ঞলস্ত চিতায় আঘাত দিতে হয় । যদি তা না করে, তাহলে আজীবন বিধবার বেশ ধারণ করে এই মাঝুরার মন্দিরে কাটাতে হয় ।

এখানে আসার পর এক বিধবা বান্ধবীর সাথে আমার দেখা হয়েছে । স্বামী মারা যাওয়ার পর দু'বছর যাবত সে এখানে আছে । মুখে সবাই বলে সে সতী-সাধী জীবন যাপন করছে । কিন্তু বান্ধবীটি আমাকে জানিয়েছে, প্রতি রাতেই তাকে কোন না কোন পুরোহিতের সাথে থাকতে হয় । কায়েস...! তুমি আমাকে সাথে নিয়ে চলো । আমি বাকী জীবন তোমার সেবাদাসী হয়ে কাটিয়ে দেবো ।

কায়েস ছিল টগবগে যুবক । একটি যুবককে এক পরমা সুন্দরী নিজেকে সমর্পণ করছে । দীর্ঘ সময় বহু কষ্টে সে নিজেকে নীরব এই মোমের কাছে না গলে ধরে রেখেছিল । কিন্তু সরব আগুনের শিখায় কায়েসের না-গলা ধৈর্যের শিকল গলে গেলো ।

সে তরুণীকে এড়ানোর জন্য বললো, না, আমি আমান্তের খেয়ানত করতে পারি না । তবে তোমার এই আবেদনও প্রত্যাখ্যান করতে পারছি না ।  
আমার হৃদয়টা চিরে যদি দেখো, তাহলে সেখানে একমাত্র তোমারই ছবি আঁকা হয়ে গেছে, এখানে আর কারো ঠাই নেই । তোমাকে আমি আর কারো হাতে তুলে দিতে পারবো না । ঠিক আছে, এখন উঠো, চলো ।”

ওরা চিলাসম মন্দির থেকে বের হয়ে বাইরের অবস্থা দেখে হয়রান হয়ে গেল। গত রাতের ঝড় ভয়ানক অবস্থা ঘটিয়ে গেছে। গত সন্ধিয়াও যেখানে ছিল তাঁবুর সারি, সেখানে আজ আর তাঁবুর কোন চিহ্ন নেই। লোকজন এদিক-সেদিক তাদের আসবাব পত্র তালাশ করছে। সকল তাঁবু লগতও। এলোপাতাড়ি গাছপালার ভাঙ্গা ডালপালা সারা এলাকা জুড়ে ছড়ানো। আর চতুর্দিকে শুধুই খৎসের চিহ্ন, আর তৈ হৈ পানি।

কায়েস উষাকে সাথে নিয়ে সিঁড়ি ভেঙে মন্দিরের উপর থেকে নিচে নেমে এলো। তারা উষার বাবা-মার খৌজে কিছুদূর এগোতেই উচ্চকঞ্চে ভেসে এলো, “উষা, উষা”!!

উষা চিৎকার শুনে ওখানেই দাঁড়িয়ে গেল। সে কায়েসকে বললো, এই তো আমার বাবা! এখন আর আমাদের পক্ষে পালানো সম্ভব নয়।”

দীর্ঘদেহী, চওড়া বুকওয়ালা, বিশাল গেঁফধারী শক্ত সামর্থ্বান এক মধ্যবয়সী লোক দৌড়ে এসে উষাকে জড়িয়ে কোলে তুলে নিলো। উষা ও তার বাবাকে জড়িয়ে ধরে বললো, বাবা এর নাম জগদীশ। সেই গত রাতে আমার জীবন বাঁচিয়েছে। গতরাতে সে আমাকে নদীর তীর থেকে বেহঁশ অবস্থায় তুলে এনে এই মন্দিরে রেখে রাতভর জাগ্রত থেকে পাহারা দিয়েছে। উষা এক নিঃশ্঵াসে গতরাতের পুরো ঘটনা তার বাবাকে জানাল।

উষার কথা শুনে তার বাবা জগদীশকুণ্ঠী কায়েসকে জড়িয়ে ধরে বললো, বলো বাবা, তুমি কী চাও? তোমাকে আমি উপহার দেবো। তুমি স্বর্ণ চাইতে পারো, ইচ্ছা করলে আমার ঘোড়াটিও চাইতে পারো। যাই চাও, আমি তোমাকে দিয়ে দেবো।”

“আমি আমার কর্তব্য পালন করেছি। একাজ আমি কোন পুরক্ষারের লোভে করিনি। পুরক্ষার যদি দিতেই চান, তবে আপনার এই মেয়েটিকেই আমাকে দিয়ে দিন। বললো কায়েস। কারণ, কাউকে না কাউকে তো আপনার এই মেয়ে দিতেই হবে। এটাই হবে আমার জন্য সবচেয়ে দার্শী পুরক্ষার। আমি ক্রেমন মানুষ তা এই সময়ের মধ্যে আপনার মেয়ে ঠিকই জেনে গেছে।

কায়েসের কথা শুনে উষার বাবা নীরব হয়ে গেল। কিছুক্ষণ নীরব থেকে বললো, তোমার মতো বীর বাহাদুর যুবকদের আমি সম্মান করি। তোমার দেহ সৌষ্ঠব খুবই সুন্দর। যথার্থ অর্থেই তুমি সুপুরূষ। আমি সেনা অফিসার।

বংশগতভাবেই আমরা সৈনিক। তোমার মতো সুপুরুষ যুবকের হাতে আমার মেয়েকে তুলে দিয়ে আমি তোমাকে সেনাবাহিনীতে চাকরী দিতে পারি। কিন্তু আমাদের সেনাবাহিনীর এক উচ্চ কর্মকর্তার সাথে আমার মেয়ের বিয়ের ব্যাপারে কথা হচ্ছে, এ প্রস্তাবকে আমি প্রত্যাখ্যান করতে পারি না। এ দাবী ছাড়া তুমি অন্য কিছু বলতে পারো।”

“আপনি কোন সেনাবাহিনীতে আছেন?” জানতে চাইলো কায়েস।

“আমি বুলদশহরের রাজার সেনাবাহিনীতে আছি।” জবাব দিল উষার বাবা।

কায়েস উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবেই উষার বাবার সাথে সেনাবাহিনী সম্পর্কে আলাপ শুরু করে দিল। এক পর্যায়ে উষার বাবা সুলতান মাহমুদ সম্পর্কে কথা বলতে লাগল। সে বললো, তাকে পরাজিত ও বন্দী করার জন্যই ভগবান এখনো আমাকে জীবিত রেখেছেন।

বংশগতভাবে এবং পেশাগতভাবে সৈনিক হওয়ার কারণে যুদ্ধ ও সেনাবাহিনী সম্পর্কে খুবই শুরুত্বপূর্ণ কথাবার্তা বলছিল উষার বাবা। কিন্তু কায়েসের মনে তখন এসব বিষয়ের চেয়ে উষার আগ্রহই প্রবল। উষার বাবা কায়েসের সাথে উষার বিয়ের ব্যাপারে যখন অসম্মতি জানালো, তখন কায়েস একেবারে চুপসে গেল। তার চেহারা মলিন হয়ে গেলো। মনে হচ্ছিল তার দেহ থেকে যেনো আঘাত বের করে নেয়া হয়েছে।

কায়েস ভাবতে লাগলো। কুড়িয়ে পাওয়া রত্ন তার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিচ্ছে উষার বাবা।

উষাকে হারানোর যন্ত্রণা কায়েসের বোধজ্ঞান ও কর্তব্য চিন্তাকে ছাপিয়ে তার মানসিক দুর্বলতাকে তুঙ্গে তুলে আনলো এবং তাকে আবেগতাড়িত করে ফেললো।

উষার বাবা যদি কায়েসকে বিদায় করে দিতো কিংবা উষাকে সেখান থেকে সরিয়ে নিয়ে যেতো, তাহলে কায়েস হয়তো এতোটা প্রভাবিত হতো না। কিন্তু অনিদ্যসন্দরী ও নিবেদিতা কান্তিময় চেহারার অধিকারীনীক উষা তার চোখের সামনেই আবেদনময়ী ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে ছিল। উষার বাবা খুবই সৌজন্য এবং সৌহার্দ্য মনোভাব নিয়ে কায়েসের সাথে কথাবার্তা বলছিল আর কায়েস ভাবছিল উষাকে পাবার ফন্দি কীভাবে করবে।

এক পর্যায়ে উষার বাবা গয়নীর গোয়েন্দা প্রসঙ্গে আলাপ শুরু করে দিল।  
বললো, ‘এরা খুবই ভ্যানক, আমাদের মেলার মধ্যেও এরা ঘুরে বেড়াচ্ছে।  
ওরা আমাদের দুর্বলতাগুলো সময়ের আগেই মাহমুদকে জানিয়ে দেয়। ফলে  
মাহমুদ আমাদের দুর্বল জায়গাগুলোতেই আঘাত করে।

আমাদের সেনাবাহিনীতে গয়নীর গোয়েন্দা পাকড়াও করার জন্য মোটা  
অংকের পুরক্ষার ঘোষণা করা হয়েছে। আমি যদি কোন মুসলিম গোয়েন্দাকে  
ধরতে পারি, তাহলে তাকে আমি জীবিতাবস্থায় আমার রাজার কাছে পেশ  
করবো না। তার মাথাটা কেটে নিয়ে যাবো।

একথা শুনে চিন্তিত কায়েসের চিন্তার অবসান হয়ে গেল। সে এবার  
উষাকে পাবার একটা সোজা পথ পেয়ে গেল। এদিকে উষা একথা শুনে তার  
বাবার আড়ালে দাঁড়িয়ে কায়েসের দিকে তাকিয়ে ইঙ্গিতপূর্ণ মুচকি হাসল।

এই মুচকী হাসি উষাকে পাবার কায়েসের আকাঙ্ক্ষাকে আরো তীব্র করে  
তুললো। কায়েস বলে বসলো, “আমি যদি আপনাকে দু’-তিনজন মুসলিম  
গোয়েন্দা ধরিয়ে দিই, তাহলে কি আমি আপনার কাছে যা দাবী করেছি তা  
দেবেন?”

আরে তুমি গয়নীর গোয়েন্দা পাকড়াও করবে কিভাবে?”

“এ ব্যাপারে আপনি আমাকে আর কিছু জিজ্ঞেস করবেন না।” বললো  
কায়েস। আপনি তাদের ধরবেন এবং তাদের জীবিত রাখবেন। তাদের জীবিত  
রাখলে এদের দেয়া তথ্য দিয়ে আপনি গয়নীর আরো গোয়েন্দাদেরকে ধরতে  
পারবেন।”

“কবে ধরিয়ে দেবে তুমি?” জানতে চাইলো উষার বাবা। ওরা কোথায়  
আছে?”

“এখনই ধরিয়ে দেবো...। আজকের মধ্যেই।” জবাব দিল কায়েস।

“ওরা এই মেলাতেই আছে। যদি আমি তাদের ধরিয়ে দিতে না পারি,  
তাহলে আপনি আমার মাথা উড়িয়ে দেবেন।”

“সত্যিই যদি তুমি তাদের ধরিয়ে দিতে পারো এবং ধরা পরার পর ওরা  
গয়নীর গোয়েন্দা প্রমাণিত হয়, তাহলে মাথুরার বড় মন্দিরে অনুষ্ঠান করে  
আমার মেয়েকে আমি তোমার হাতে তুলে দেবো। কিন্তু রাজার কাছ থেকে

পুরস্কার কিন্তু আমি নেবো। তাতে আমার প্রমোশন হবে। আমি আরো বেশী সৈন্যের কর্মান্বাদ হয়ে যাবো।”

“ঠিক আছে, আমি রাজি। আমার সাথে চলুন।”

\* \* \*

গত একটি রাত কায়েসের সাথে হিশাম ও তাশকীনের কোন দেখা-সাক্ষাত হয়নি। হিশাম ও তার আরো দুই সহকর্মী দিনের বেলায় হন্তে হয়ে কায়েসকে খুঁজছিল। তারা সাধুর বেশ ধারণ করেই তুফানের মধ্যে এক মন্দিরে রাত্যাপন করেছে।

সন্ধ্যায় কায়েস তাদের আস্তানায় ফেরেনি। তাই দিনের বেলায় তার সহকর্মীরা তাকে তালাশ করতে লাগল। গত রাতের তুফান সবকিছু লওভগু করে দেয়ার ফলে সেখানে কাউকে খুঁজে পাওয়া সহজ ছিলো না। সারা শহরের গলি ঘূপছিতে হাজার হাজার মানুষ ঠাঁই নিয়ে ছিলো। শহর ও শহরতলী কাদা পানিতে একাকার হয়ে পড়েছিল।

দুপুরের দিকে এক সঙ্গীর সাথে হিশামের দেখা হলো। সে হিশামকে জানালো কায়েসকে সে দেখেছে। সে সাধুর বেশে নেই। সে এমন পোশাক গায়ে জড়িয়েছে যে, দেখে এটিকে তার নিজের পোশাক মনে হয়নি। তার সাথে আরেকজন লোক আছে। লোকটির অবয়ব ও শারীরিক গঠন থেকে বোৰা গেছে সে সেনাবাহিনীর কোন কর্মকর্তা। তার কোমরে তরবারী ঝুলানো। পোশাকে কয়েকটি পদবীর চিহ্ন। লোকটিকে দেখে আমার কাছে সন্দেহজনক মনে হয়েছে। একথা শুনে হিশাম তার সঙ্গীকে বললো, “তুমি আমাদের সাথীদেরকে লুকিয়ে যেতে বলো।”

কায়েসের এক সঙ্গী কায়েসকে দূর থেকে দেখেই সতর্ক হয়ে গিয়েছিল। কারণ, কায়েসের পোশাক-পরিচ্ছদ ছিল সন্দেহজনক। তার সঙ্গে থাকা লোকটির ভাবভঙ্গিতে সন্দেহ আরো প্রকট হয়ে উঠেছিল। এসব গোয়েন্দাদের ব্রতাব হলো এরা সবকিছুকেই সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখে। কায়েসের অবস্থা সংশয়পূর্ণ হওয়ায় সে কায়েসের দৃষ্টির আড়ালে থেকে সেখান থেকে সটকে পড়েছিল।

উষার বাবা কায়েসকে সাথে করে তাদের স্বজনদের কাছে নিয়ে গিয়েছিল। তারা ঝড়ের মধ্যে যেখানে রাত্যাপন করেছিল। সেখানে সে কায়েসকে তাদের কাপড়-চোপড় পরিয়ে তার সঙ্গীদের ধরার জন্য বেরিয়ে পড়ল।

সঙ্গীর কাছে কায়েসের সন্দেহজনক অবস্থার কথা শুনে তাশকীনের সতর্কবাণী মনে পড়ল হিশামের। তাশকীন তাকে স্বপক্ষের স্থানীয় গোয়েন্দাদের উপর বেশী আস্তা ও নির্ভরতা না রাখার পরামর্শ দিয়েছিল। কারণ, এখানকার মুসলমানরা দীর্ঘদিন ধরে হিন্দুদের শাসনাধীনে থাকার ফলে হিন্দুদের খাতির তোয়াজ করার অভ্যাসের কারণে সহজেই হিন্দুদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে যায়।

হিশাম তার গোপন আস্তানায় গিয়ে শরীর থেকে সন্ন্যাসীর বাহ্যিক রূপ খুলে ফেলল। শরীরে লাগানো ছাই-ভৃমের প্রলেপ ধূয়ে ফেলল এবং হাজার দানার মালা, ত্রিশূল, লাঠি এবং জটবাঁধা কৃত্রিম দাঢ়ি খুলে কাপড় বদল করে হিন্দু সৈনিকের পোশাক গায়ে জড়াল। সে একটি খঙ্গর কোমরে শুঁজে কায়েসের খৌজে বেরিয়ে পড়ল।

অনেকক্ষণ খৌজাখুঁজির পর হিশাম কায়েসকে দেখতে পেল। উষার বাবার সাথে একটি পুরনো দালানের বাইরে আঙিনার একটি খুঁটির সাথে হেলান দিয়ে সে বসে আছে। হিশাম ভিন্নপথে পুরনো দালানের ডেতরে প্রবেশ করে এদিকে এস্তো যে কক্ষের বাইরে কায়েস বসে আছে।

কক্ষের একটি জানালার দিকে পিঠ দিয়ে কায়েস ও উষার বাবা বসা ছিল। তারা বাইরের দৃশ্য এবং গমনাগমনরত লোকজনকে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করছিল। হিশাম নিঃশব্দে সেই জানালার কাছে গিয়ে বসে পড়ল। হিশামের বসার জায়গা থেকে কায়েস ও উষার বাবার দূরত্ব তিন-চার হাত মাত্র।

“আপনি হতাশ হবেন না। আমরা ওদেরকে অবশ্যই পেয়ে যাবো। ওরা তিনজন। তিনজনকেই ধরে ফেলা যাবে।” উষার বাবার উদ্দেশ্যে বললো কায়েস।

এ তিনজনের কথা আমি বিশ্বাস করি, কিন্তু চতুর্থজনের কথা আমি বিশ্বাস করতে পারছি না।” বললো উষার বাবা। তুমি দাবী করছো, কল্পোজের মহারাজার একান্ত নিরাপত্তা রক্ষী দলের সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য ব্যক্তিটিই গয়নীর চর। তাছাড়া তুমি তার সামনে না যাওয়ার কথা বলছো।

আমি ভাবছি, মহারাজার একান্ত লোকের বিরুদ্ধে কিভাবে অভিযোগ করবো যে, সে গঘনীর চৰ! কারণ, কল্পোজের মহারাজা খুবই দূরদর্শী ও পরাক্রমশালী মহারাজা।”

“তাকে পাকড়াও করার ব্যাপারেও আমি আপনাকে কৌশল বলে দেবো।”  
বললো কায়েস।

“জানালার আড়ালে বসে হিশাম তার জামার নিচ থেকে ধীরে-ধীরে খৰটি বের করল। খঞ্জরের আগা বিষে ডোবানো ছিল। এমন বিষ যে কারো শরীরে এর একটু আঁচড় লাগলেই মৃহূর্তের মধ্যে মারা যাবে সে।

হিশাম খঞ্জরটি হাতের আড়াল করে দাঁড়াল এবং পূর্ণশক্তি দিয়ে খঞ্জরটি ছুঁড়ে মারল। খঞ্জরটি সোজা গিয়ে কায়েসের পাঁজরে বিন্দু হলো। খঞ্জরবিন্দু কায়েস উহু বলে দাঁড়াল বটে; কিন্তু মৃহূর্তের মধ্যেই মাথা ঘুরে পড়ে গেল। হিশাম এক মৃহূর্ত দেরী না করে জানালার পাশ থেকে সটকে পড়ল এবং অন্য কক্ষে চলে গেল।

উষার বাবা ছিল প্রশিক্ষিত সেনাকর্মকর্তা। সে বুরো ফেলল খঞ্জর কোন দিক থেকে আসতে পারে। সে পুরনো দালানের ভেতরের দিকে দৌড়াল। কিন্তু ততক্ষণে হিশাম অন্য দরজা দিয়ে বাইরে বেরিয়ে কায়েসের পাঁজর থেকে খৰটি তুলে নিয়ে রাস্তার মানুষের মধ্যে মিশে গেল।

উষার বাবা পুরনো দালানের মধ্যে হত্যাকারীকে তালাশ করতে লাগল। আর এদিকে হিশাম যেদিক থেকে এসেছিল ওদিকে চলে গেল। উষার বাবা হয়রান হয়ে পুরনো দালানের ভেতরে-বাইরে হত্যাকারীকে তালাশে ব্যস্ত রইল। ততক্ষণে কায়েস মরে গেছে।

\* \* \*

সেই রাতে প্রধান মন্দিরের পুরোহিত সকল রাজা-মহারাজাদের মন্দিরে ডেকে পাঠালো। রাজা-মহারাজাদের ডেকে এনে প্রধান পুরোহিত বললো, ‘আমি আপনাদেরকে এই সোনা-কৃপার স্তুপ দেখাতে এনেছি।’

সোনা-কৃপা ও নগদ টাকার বিশাল স্তুপ রাজাদের দেখিয়ে পুরোহিত বললো, গত রাতে তুফানের সময় আমি আপনাদের মাহফিলে ছিলাম। সেই সময় সম্পর্কে মন্দিরে পূজারত পুরোহিতরা আমাকে জানিয়েছে, কৃষ্ণ দেবতার

চোখ প্রথমে নীল বর্ণ ধারণ করে, পরে সাদা এবং রক্তবর্ণ ধারণ করে। এরপরই তার চোখ থেকে এই ভয়াবহ তাওব ছড়িয়ে পড়ে। মন্দিরের সকল শাখা-ঘন্টা নিজে থেকেই বাজতে শুরু করে। এর পরপরই শুরু হয়ে যায় ভয়াবহ তুফানের তাওব।...

“আপনারা কি দেবতাদের ইঙ্গিত বোঝেন না? গত রাতের তুফান ছিল দেবতাদের ক্ষেত্রের বহিঃপ্রকাশ। রাতেই মন্দিরে লোকজন জড়ো হয়ে গিয়েছিল। হাজারো পূজারী দেবীর পদতলে মাথা রেখে কান্নাকাটি করেছে। আমি পরিষ্কার ইঙ্গিত পেয়েছি, যে পর্যন্ত মাহমুদের মাথা কেটে কৃষ্ণদেব ও বাসুদেবের পদতলে রাখা না হবে, ততোদিন পর্যন্ত দেবতাদের ক্ষেত্র প্রশংসিত হবে না।

গত রাতে এখানে বহু লোক হতাহত হয়েছে। আপনাদেরও হয়তো এমন পরিণতি বরণ করতে হবে। আমি সকল পূজারীকে বলে আসছি, যে পর্যন্ত হিন্দুস্তানে ইসলামের ক্রমসম্প্রসারণের পথ ঝুঁক করা না হবে, ততোদিন দেবতাদের অভিশাপ আসতেই থাকবে।

আমি পূজারীদের বলেছি, মুসলমানদেরকে চিরদিনের জন্য পরাজিতি করার জন্য বিশাল সেনাবাহিনী গড়ে তুলতে হবে। এতে বিপুল অর্থের প্রয়োজন। মন্দিরে আসা সকল নারী তাদের পরনের অলংকার এবং পুরুষেরা তাদের নগদ অর্থের স্তুপ করে ফেলেছে।

এ অর্থ এখনই আমি আপনাদের হাতে তুলে দেবো না। আপনাদের সেনারা যখন গয়নীর সৈন্যদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করবে, তখন সেনাবাহিনীর ব্যয়ভার বহন করার বোৰা থেকে আমি আপনাদের নিঃস্তুতি দেবো।

যুদ্ধের পুরো ব্যয়ভার বহন করবে মাথুরার প্রধান মন্দির। কারণ, আপনাদের জয় আমার জয়, আপনাদের পরাজয় আমার পরাজয়। ভগবান আমাকে জিজ্ঞেস করবেন, আমি কি আপনাদের অন্তরে সন্তান ধর্মের মর্যাদা, ভালোবাসা এবং ইসলামের প্রতি ঘৃণা সৃষ্টি করার চেষ্টা করেছি কি না!”

মনে রাখবেন, সেই দলই বিজয় লাভ করে, যাদের হন্দয়ে শক্তি ও শক্রবাহিনীর ধর্মের প্রতি ঘৃণা আছে। ঘৃণা একটি বিরাট শক্তি। এতো দূরে এসেও মুসলমানরা আপনাদের পরাজিত করে যায় এর মূল কারণ হলো তাদের অন্তর আপনাদের প্রতি ঘৃণায় ভরা থাকে।

মুসলমানরা আমাদের ধর্মকে মিথ্যা মনে করে। এখন আপনাদেরই প্রমাণ করতে হবে আমাদের ধর্ম সত্য। আপনাদেরকে গয়নী সেনাদের উপর আসমানী গযব হয়ে উঠতে হবে।”

দীর্ঘ জুলায়ী বক্তৃতায় পথান পুরোহিত রাজা মহারাজাদের অন্তরে ইসলাম ও মুসলমানদের প্রতি ঘৃণা এবং ইসলাম বিষেষে উক্ষে দেয়ার পর আশ্বাসবাণী শোনালো, “ভগবান আমাকে ইশারা দিয়েছে মুসলমানরা শোচনীয়ভাবে পরাজিত হবে।”

দীর্ঘ ভাষণের পর পণ্ডিত বসে পড়লে লাহোরের মহারাজা জয়পাল, কল্লোজের মহারাজা রাজ্যপাল, মহাবনের রাজা কুয়াল চন্দ্ৰ ছাড়াও বুলন্দশহরসহ ছোট বড় সকল রাজা-মহারাজাদের সেই ঐতিহাসিক বৈঠক হলো, যে বৈঠকের কারণে মুসলমান মাহমুদকে ভারতের ইতিহাসের সবচেয়ে বড় অভিযান পরিচালনা করতে হয়েছিল। সুলতান মাহমুদ রাজাদের এক্যবন্ধ সিদ্ধান্তের বিপরীতে এমন ঐতিহাসিক অভিযান পরিচালনা করেছিলেন, সমরবিশারদগণ সেই অভিযানকে অভাবনীয় বলে অভিহিত করেন।

ইউরোপীয় ঐতিহাসিক স্যার আর্ল্টেন লিখেছেন, “সুলতান মাহমুদ গয়নী থেকে মাথুরা পর্যন্ত প্রাবনের যতো একটির পর একটি দুর্গ জয় করে এগিয়ে এলেন এবং শেষ পর্যন্ত কল্লোজের মাথুরাকে ধ্বংসস্তূতে পরিণত করলেন।”

তৎকালীন ঐতিহাসিকদের বর্ণনা থেকে জানা যায়, তার এই অবিস্মরণীয় সাফল্য ও বিজয়ে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদান ছিল তার গোয়েন্দা বাহিনীর। তিনি ভারতের রাজা মহারাজাদের সমর প্রস্তুতির পূর্ণ খবর জায়গায় বসেই পেয়ে যেতেন। যার ফলে তিনি বিদ্যুৎসেগে অগ্রাভিযান চালাতেন এবং প্রতিপক্ষকে অপ্রস্তুত অবস্থায় এসে চেপে ধরতেন।

\* \* \*

লাহোরের মহারাজা ভীমপাল এবং কালাঞ্জর (কোটলী কাশীীর) এর রাজা জানকি বাহ্মী সুলতান মাহমুদের বশ্যতা স্বীকার করে নিয়েছিল। তাদের মধ্যে চুক্তি হয়েছিল যে, ভীমপাল গয়নীর বিরুদ্ধে কোন প্রকার সামরিক তৎপরতা চালাবে না। হিন্দুস্তানে গয়নী সৈন্যদের যতো ধরনের সহযোগিতার প্রয়োজন

হবে সেই সহযোগিতা দিতে বাধ্য থাকবে। কোটলী কাশ্মীরের রাজারও সুলতানের সাথে একই ধরনের চুক্তি হয়েছিল।

১০১৭ সালের বর্ষা মণ্ডসুমের পূজা উৎসবে হিন্দুস্তানের অন্যান্য রাজাদের মতো এই দুই রাজাও মাথুরার প্রধান মন্দিরে বসে গয়নী বাহিনীকে পরাজিত করে গয়নীকে ধৰ্মস করার নীলনঞ্জা প্রণয়নে শামিল ছিল।

রাজা ভীমপাল সেই রাজাদের বৈঠকে পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছিলেন, তিনি প্রকাশ্য থাকবেন না, কিন্তু অন্তরালে সবধরনের সহযোগিতা করবেন। কারণ হিসেবে তিনি বলেন, তিনি ও তার খান্দান এ পর্যন্ত সুলতান মাহমুদের বিরুদ্ধে তিনবার লড়াই করেছে, আর কেউ তা করেনি।

এসব ঘুন্দের ক্ষয়ক্ষতির সবই তার নিজস্ব তহবিল থেকে নির্বাহ করতে হয়েছে। ফলে বাধ্য হয়েই তাকে সুলতান মাহমুদের সাথে অধীনতামূলক চুক্তি করতে হয়েছে।

এই মহাপরিকল্পনার শীর্ষ দায়িত্ব দেয়া হলো কল্লোজের মহারাজার উপর। ঐতিহাসিকগণ লিখেছেন, এই মহাপরিকল্পনার দায়িত্ব পালনের সবচেয়ে উপযুক্ত ছিলেন কল্লোজের মহারাজা রাজ্যপাল।

তিনি ছিলেন দক্ষ সমরবিশারদ। তার সামরিক শক্তিও ছিলো অন্যদের চেয়ে বেশী। উত্তর ভারতে কল্লোজের মহারাজাকে সম্মানের চোখে দেখা হতো। বৃত্তত তাই সম্মিলিত বাহিনীর কমান্ডারের দায়িত্ব অর্পণ করা হলো কল্লোজের মহারাজার উপর।

মহাপরিকল্পনার অংশ হিসেবে প্রত্যেক রাজা-মহারাজা তাদের অর্ধেক সৈন্য সম্মিলিত বাহিনীতে দেবে আর বাকী অর্ধেক সৈন্য নিজেদের হাতে বিভিন্ন দুর্গের সুরক্ষা এবং সুলতান মাহমুদের জবাবী আক্রমণ প্রতিহত করার কাজে নিয়োজিত থাকবে।

সম্মিলিত বাহিনী পেশোয়ারের দিকে অগ্রাভিয়ান চালাবে এবং সুলতান মাহমুদকে খায়বর দুর্গের পার্শ্ববর্তী ময়দানে মুখোমুখি হতে বাধ্য করা হবে। এর আগে সৈন্যদের কিছু অংশ বিভিন্ন পাহাড়ি গিরিপথে নিয়োগ করা হবে। যাতে সুলতান মাহমুদের বাহিনীকে আগমন পথেই চোরাগুণ্ডা আক্রমণ করে দুর্বল করে দেয়া হবে।

এই পরিকল্পনায় সবাই এক্যমত্য পোষণ করে। সব রাজা-মহারাজা কৃষ্ণ ও বাসুদেব মূর্তির সামনে দাঁড়িয়ে অঙ্গীকার করে পরিকল্পনা বাস্তবায়নে প্রত্যেকেই নিজেদের জীবনও সম্পদ অকাতরে ব্যয় করবে।

আমীর বিন তাশকীন কল্লোজের মহারাজার একান্ত নিরাপত্তা রক্ষী হিসেবে বৈঠকে হাজির ছিল। শুধু কল্লোজের মহারাজা নয়, আরো কয়েকজন রাজা মহারাজার ব্যক্তিগত নিরাপত্তা রক্ষীও নির্বিকার মূর্তির মতো নিজ নিজ রাজাদের পেছনে দণ্ডয়মান ছিল।

মাথুরা থেকে প্রায় একশ মাইল দূরে পূর্ব-উত্তরে রামগঙ্গা নদীর তীরে অবস্থিত বুলন্দশহর। তখন এটি ছিল একটি রাজ্যের রাজধানী। বলন্দ শহরের রাজা হরিদত্ত এই মহাবৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। বৈঠকের এক পর্যায়ে রাজা হরিদত্ত বললেন, মুসলমানরা কেন প্রতিবারই সাফল্য পায়, প্রতিক্ষেত্রেই তাদেরই কেন জয় হয়।

আমাদেরকে ভাবতে হবে কোন জাদু বলে মুসলমানরা জয়লাভ করে, আর আমাদের মধ্যে কী ঘটাতি রয়েছে....। আজ আমি আপনাদেরকে তাদের একটি শুণ সম্পর্কে অবস্থিত করতে চাই। গয়নীর গোয়েন্দাব্যবস্থা খুবই জোরদার। গোয়েন্দারাই গয়নী বাহিনীর সবচেয়ে বড় শক্তি।

আমি আপনাদের একথাও বলে দিতে পারি, এখানেও গয়নীর গোয়েন্দা রয়েছে এবং আমাদের সব কথাই সে শুনছে। গতরাতের ঝড়ে বেশ কিছু মানুষের প্রাণহনি ঘটেছে, জানা গেছে, আজ একজন গয়নী গোয়েন্দাকে তার সহকর্মীরাই হত্যা করেছে।

আমার এক সেনাকর্মকর্তা ঘটনাক্রমে এক গয়নীর গোয়েন্দার আসল রূপ জানতে পেরেছিল। সেই গোয়েন্দা তার তিন সহকর্মীকে ধরিয়ে দিতে চেয়েছিল। কিন্তু হঠাৎ করে এক খঙ্গরের আঘাতে সে মারা যায়। হত্যাকারীকে ধরা কারো পক্ষে সম্ভব হয়নি।

তা থেকেই আপনারা বুঝতে পারেন মুসলমানদের গোয়েন্দাব্যবস্থা এবং তাদের শক্তি কত। রাজা হরিদত্ত উষার বাবার কাছে শোনা কায়েসের ঘটনা সবিস্তারে ব্যক্ত করলেন এবং উষা ও কায়েসের মধ্যে ঘটে যাওয়া আকস্মিক আকর্ষণ, উদ্ধার ও একজন অপরজনকে পাওয়ার জন্য ব্যাকুলতার কথাও সবিস্তারে বর্ণনা করলেন। অবশেষে রাজা হরিদত্ত বললেন, 'মৃত গোয়েন্দা এমন

এক গয়নী গোয়েন্দার কথা জানিয়েছে, যার নাম উল্লেখ করা এই মুহূর্তে সম্ভব নয়। কারণ, সেই গোয়েন্দা এমন মর্যাদায় অধিষ্ঠিত, যদি অভিযোগ সত্য না হয়, তাহলে আমাদের মধ্যে শক্রতা, ভুল বোবাবুঝি ও অনেক্য সৃষ্টির আশঙ্কা রয়েছে।

রাজা হরিদত্ত আড়চোখে একবার আমীর বিন তাশকীনের দিকে তাকালেন। আমীর বিন তাশকীন নির্মোহ নির্বিকার চিত্তে মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে রইল। হরিদত্তের কথায় সে ভেতরে ভেতরে কেঁপে উঠল বটে; কিন্তু দৃশ্যত ভাবলেশহীন নির্বিকার চিত্তে দাঁড়িয়ে রইল।

কয়েকজন রাজা-মহারাজা হরিদত্তকে আলোচিত গোয়েন্দার নাম উল্লেখ করার তাকীদ দিলেন। কিন্তু রাজা হরিদত্ত বললেন, বিষয়টি তিনি আগে ব্যক্তিগতভাবে নিরীক্ষা করবেন। বিষয়টি সম্পর্কে নিশ্চিত হলে সেই গোয়েন্দাকে সবার সামনে হাজির করবেন।'

রাজা-মহারাজাদের সেই ঐতিহাসিক বৈঠক শেষে কন্নৌজের মহারাজা রাজা হরিদত্তকে বললেন, যেহেতু তাকে সম্মিলিত সামরিক বাহিনীর চীফ কমান্ডার এর দায়িত্ব দেয়া হয়েছে, এজন্য এতো উচু পর্যায়ে কোথায় গয়নীর গোয়েন্দা রয়েছে বিষয়টি তার জানা খুবই দরকার।

রাজা হরিদত্ত বিষয়টি এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। কারণ, আমীর বিন তাশকীন তাদের সাথেই আসছিল। বাড় মহারাজাদের তাঁবুগুলো উড়িয়ে নেয়ার পর শহরে তাদের জন্য বাড়ি খালি করানো হলো।

মহারাজা কন্নৌজের জন্য যে বাড়ি বরাদ্দ করা হয়েছিল, তিনি সেই বাড়িতে রাজা হরিদত্তকে নিয়ে গেলেন এবং জগন্নাথরূপী আমীর বিন তাশকীনকে ছুটি দিয়ে দিলেন।

চম্পা ছিলো কন্নৌজ মহারাজার সবচেয়ে প্রিয় রাণী। সে মহারাজার আগমন অপেক্ষায় প্রহর শুণছিল। রাজা হরিদত্তকে সাথে নিয়ে মহারাজা তার কক্ষে প্রবেশ করলে চম্পারাণী আপ্যায়নের শুরুতেই তাদের শরাব ঢেলে দিল এবং মহারাজার সান্নিধ্যে বসে গেল। রাজা হরিদত্ত সকিঞ্চিৎ দৃষ্টিতে চম্পার দিকে তাকালে মহারাজা রাজ্যপাল হরিদত্তের সংশয়পূর্ণ দৃষ্টি বুঝে ফেললেন। কারণ, চম্পার উপস্থিতিতে রাজা হরিদত্ত আসল কথা না বলে প্রসঙ্গ ঘোরানোর চেষ্টা করছিলেন।

মহারাজা চম্পার উদ্দেশে বললেন, ‘আমরা দুজন একটা জরুরী বিষয়ে কথা বলবো, তুমি কিছুক্ষণের জন্য অন্য ঘরে থাকো।

চম্পা মহারাজার নির্দেশে কক্ষ থেকে বেরিয়ে এলো বটে; কিন্তু কী কথা হবে তাদের মধ্যে? এই কৌতুহলে সে দরজার আড়ালে তাদের কথাবার্তা শোনার জন্য উৎকর্ষ হয়ে রইল।

‘আমি আপনাকে এই কথাই বলতে চাই যে, মন্দিরে আমি যে প্রসঙ্গটি উত্থাপন করেছিলাম’ বলে কথা শুরু করলো রাজা হরিদত্ত। আমার এক সামরিক কর্মকর্তা আমাকে জানিয়েছে, জগন্নাথ নামের আপনার একান্ত নিরাপত্তারক্ষী আসলে জগন্নাথ নয়, আমীর বিন তাশকীন। সে গফনীর উচ্চ পর্যায়ের একজন দক্ষ গোয়েন্দা। যে গোয়েন্দা ওদেরই কারো হাতে নিহত হয়েছে, সেই আমার কর্মকর্তাকে একথা বলেছিলো। হয়তো আমার একথা আপনার পছন্দ নাও হতে পারে। তবে...।

‘আপনার কথা আমার কাছে মোটেও মন্দ মনে হয়নি’ হরিদত্তের অসম্পূর্ণ কথা কেড়ে নিয়ে জবাব দিলেন মহারাজা। কিন্তু ব্যাপারটি আমার কাছে বিশ্বয়কর লাগছে যে, কোন ভিন্নদেশের গোয়েন্দা আমাকে এভাবে ধোকা দিতে পারে। আমি আপনার এই অভিযোগকে মোটেও অঙ্গীকার করবো না, বিষয়টি আমি এখনই যাচাই করবো।’

রাজা হরিদত্ত আরো বললেন, সুন্দরী নারী আপনার জন্য অভাব হওয়ার কথা নয়। আমি এ কথাও জানতে পেরেছি, আপনার প্রিয় চম্পারানী ও আপনার এই ব্যক্তিগত নিরাপত্তারক্ষীর মধ্যে গোপন সম্পর্ক রয়েছে। সেদিন আপনার ছেট রাণীর যে সেবিকা রাণীর সাথে গঙ্গাননে গিয়েছিল, তাকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেই আপনি এর সত্যতা যাচাই করতে পারবেন। আমার সন্দেহ হয়, চম্পা ও এই নিরাপত্তারক্ষী দুজনে আপনার জন্য একটা মায়াবীনি প্রতারণা হয়ে বিবাজ করছে।’

‘হরিদত্ত! আমাকে বিষয়টি একটু খোলাসা করে বলুন। আমি এখনই সেবিকাকে আপনার সামনে ডেকে আনছি। আর সকালেই আপনি নিরাপত্তারক্ষী ও চম্পার লাশ দেখতে পাবেন।’

বিষয়টি সম্পর্কে বিস্তারিত জানানোর জন্য আমি আমার সেই সামরিক কর্মকর্তাকে সাথেই নিয়ে এসেছি। সে বাইরে দাঁড়ানো আছে। আপনি গোয়েন্দা

সম্পর্কে তার মুখেই শুনতে পারেন, বলে রাজা হরিদত্ত চম্পা ও তাশকীনের গোপন সম্পর্কের বিস্তারিত বলতে শুরু করলো।

— দুই রাজার একান্ত কথোপকথন দরজার আড়াল থেকে শুনে চম্পা পা টিপে টিপে দ্রুত সেখান থেকে বেরিয়ে এলো এবং বিদ্যুদ্বেগে তাশকীনের কক্ষে প্রবেশ করলো।

“এখনই বের হও এবং ঘোড়া বের করো”। উদ্বিগ্ন কষ্টে তাশকীনকে বললো চম্পা। আমাদের দু’জনের গোপন রহস্য ফাঁস হয়ে গেছে।”

“কী রহস্য ফাঁস হয়ে গেছে? কী বলছো তুমি?” চম্পাকে উৎসুক্য কষ্টে জিজ্ঞেস করলো তাশকীন।

“আরে এতোকিছু জানতে চেয়ো না, আগে পালানোর ব্যবস্থা করো। আবারো উদ্বিগ্ন কষ্টে বললো চম্পা। বুলন্দশহরের রাজা হরিদত্ত মহারাজাকে বলেছে, তুমি জগন্নাথ নও গয়নীর মুসলমান আমীর বিন তাশকীন।... সে মহারাজাকে আমাদের দু’জনের গোপন সম্পর্কের কথাও জানিয়ে দিয়েছে। মহারাজা এখনই আমার একান্ত সেবিকাকে ডেকে পাঠিয়েছেন।”

“তুমি কি আমাকে ধরিয়ে দিতে এসেছো, না আমাকে এখান থেকে বের করে দেয়ার জন্য এসেছো?” চম্পাকে জিজ্ঞেস করল তাশকীন।

“বেশী কিছু জিজ্ঞেস করে সময় নষ্ট করো না। জলদি করো। আমি তোমাকে নিয়ে পালিয়ে যেতে এসেছি। তাড়াতাড়ি করো। আমাকে একটা চাদর দাও। আমি আমার শরীর ঢেকে ফেলবো। জলদি করো, ওরা হয়তো তোমাকে খুঁজতে এখানে এসে যাবে।”

“ওরা যা বলছে, তা ঠিকই আছে চম্পা।” এতোদিন আমি তোমার কাছেও আমার প্রকৃত পরিচয় গোপন করেছিলাম। আমি মুসলমান। আমার নাম আমীর বিন তাশকীন। এ কথা শোনার পরও কি তুমি আমার সাথে যাবে? ইসলাম গ্রহণ করে মুসলমান হয়ে যাবে?”

“আমি তোমাকে নিয়ে পালিয়ে যেতে এবং তোমার সাথেই মরতে এসেছি। ধর্ম আমার কাছে বড় বিবেচ্য বিষয় নয়। এখন তুমিই আমার সব। তুমি যা বিশ্বাস কর আমিও তাই করি। আর দেরী নয়, জলদি কর, আমাকে চাদরটা দাও।”

তাশকীন একটি চাদর চম্পার দিকে ঝুঁড়ে দিয়ে কোমরে তরবারী ঝুলিয়ে নিল এবং তার বিশেষ খঞ্জরটিও কোমরে গুজে নিল। এরপর চম্পাকে নিয়ে আস্তাবলের দিকে অগ্রসর হলো।

এদিকে মহারাজা স্ফুর্দ্ধকষ্টে তার দারবারক্ষীদের নির্দেশ দিলেন, এক্ষুনি চম্পা ও তার একান্ত নিরাপত্তারক্ষী জগন্নাথকে হাজির করা হোক।

তাশকীন একটি অঙ্ককার জায়গায় চম্পাকে দাঁড় করিয়ে রেখে যেখানে সামরিক ঘোড়া বাঁধা থাকে, সেদিকে অগ্রসর হলো। সেনাদের মধ্যে জগন্নাথরূপী তাশকীনের মর্যাদা এমন ছিল যে, তার নির্দেশ কোন প্রকার জিজ্ঞাসাবাদ ছাড়াই সবাই মানতে বাধ্য ছিল। এই অবস্থান সে অনেকটা নিজের আচরণ, বুদ্ধিমত্তা এবং পদবী দিয়ে তৈরী করে নিয়েছিল।

সে ঘোড়ার সহিসকে বললো, খুব তাড়াতাড়ি তুমি ঘোড়াটিকে জীন বেধে দাও।

এদিকে রাজমহল তল্লাশি করে মহারাজাকে জানানো হলো, চম্পা রাণীকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। কেউ বলতে পারছে না তিনি কোথায় আছেন।

মহারাজা নির্দেশ দিলেন, জগন্নাথ ও চম্পারাণীকে দ্রুত খুঁজে বের করো। ওরা যদি পালাতে চেষ্টা করে, তবে যেখানেই পাবে সেখানেই ওদের ব্যতম করে দেবে।

মহারাজার নির্দেশ পেয়ে তার নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা দশবারজন সৈনিক দৌড়াল। তখন রাত অঙ্ককার হয়ে গেছে। একটি ভুলভুল মশাল থেকে তারা আরো তিন-চারটি মশাল ঝুলিয়ে নিল।

এদিকে তাশকীনের ঘোড়ায় তখন জীন বাঁধা হয়ে গেছে। সে দ্রুত ঘোড়াটিকে নিয়ে চম্পাকে যেখানে দাঁড় করিয়ে রেখেছিল, ওখানে পৌছল। সে চম্পাকে তার পেছনে আরোহণ করিয়ে যেই পালানোর জন্য ঘোড়াকে ঘুরালো, তখন দেখতে পেল চার-পাঁচটি মশাল ঝুলিয়ে একদল অশ্বারোহী দৌড়ে এদিকে আসছে।

শহরের প্রধান গেট খোলা ছিল বটে; কিন্তু এ মুহূর্তে প্রধান গেট দিয়ে তাদের বেরিয়ে যাওয়া সম্ভব ছিলো না। তাশকীন আবার ঘোড়া ঘুরিয়ে ছুটতে শুরু করলেই রাজার নিরাপত্তা রক্ষীরা তাকে ছমকি দিল।

দাঁড়িয়ে থাও, নয়তো এস্কুনি তীর ছোড়া হবে। কিন্তু তাশকীন দাঁড়াবার পাত্র নয়। সে থামল না, ঘোড়া ছুটিয়ে দিল। একটু এগুতেই চম্পা আর্টিচিংকার দিয়ে উঠলো। চিংকার দিয়ে চম্পা বললো, আমার পিঠে দুটি তীর বিন্দ হয়েছে। বলেই সে ঘোড়া থেকে গড়িয়ে পড়ে গেল।

আরো একটু এগুতেই তাশকীনের ঘোড়া ঝেঝাব করে উঠলো এবং তার গতি শুরু হয়ে গেল। তাশকীন বুঝতে পারল ঘোড়াও তীরবিন্দ হয়েছে। ঘোড়া যখন নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলল তখন ছুটন্ত ঘোড়া থেকে লাফিয়ে পড়ল তাশকীন। তার দু'পাশ দিয়ে শৌ শৌ করে দুটি তীর ছুটে গেল। ভাগ্যগুণে তার মাথা অক্ষত রয়ে গেল।

এরপর একটি সংকীর্ণ গলিতে চুকে পড়ল তাশকীন এবং পশ্চাদ্বাবনকারীদের আগেই গলির দু'-তিনটি মোড় পেরিয়ে গেল। এ সময়ে চম্পার কথা তার ভাবার অবকাশ ছিল না। কারণ, বিষাঙ্গ তীরের আঘাতে ততোক্ষণে বেচারী হয়তো মরে গেছে। চম্পার খুনের বদলা নেয়ারও তার পক্ষে সম্ভব হচ্ছিল না। কারণ, সে এসেছিল আরো শুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালনে, এজন্য নিজেকে রক্ষা করে যে করেই হোক গয়নী পৌছাই ছিল তার প্রধান লক্ষ্য।

তাশকীন জানতো, শহরের সীমানা প্রাচীরের একটি অংশ একেবারে নদীর তীর ঘেঁষে রয়েছে। তখন বর্ষাকাল, এমনিতেই নদীতে পানি ছিল বেশী। তদুপরি পূর্বরাতের প্রবল বর্ষণে নদীর পানি সীমানা ছুঁই ছুঁই করছিল। তাশকীনকে পশ্চাদ্বাবনকারীরা ধর ধর, গেল গেল, ওই দিকে, এ দিকে, ইত্যাকার চিংকার ও চেঁচামেচি করে আসছিল।

তাশকীন ইতোমধ্যে একটি দালানের উপরে উঠে গেল, যে দালানের ছাদ সীমানা প্রাচীরের বরাবর যুক্ত ছিল। নীচে নিরাপত্তা রক্ষীদের হৈ চৈ শুনে সীমানা প্রাচীরের উপরে অবস্থানরত দুই প্রহরী তাশকীনের পথ আগলে দাঁড়াল। তাশকীন এক প্রহরীর কাছে গিয়ে তরবারী ওর পেটে চুকিয়ে দিলে অপর প্রহরী দৌড়ে পালাল।

এদিকে মশালধারী সৈন্যরা সীমানা প্রাচীরের কাছে চলে এলো। তাশকীন দেয়ালে উঠে নদীর দিকে অগ্রসর হলো এবং যেখানে দেয়াল একেবারে নদীর তীর ঘেঁষে সেখানে পৌছে, সে সীমানা প্রাচীরের উপর থেকে নদীতে ঝাপিয়ে পড়ল। পশ্চাদ্বাবনকারীরা আর তার নাগাল পেল না।

\* \* \*

মাথুরা থেকে গফনীর দূরত্ব প্রায় সাতশ মাইল। পথিমধ্যে অস্তত সাতটি বড় নদী রয়েছে। তাছাড়া বেশীর ভাগ পথই ছিল পাহাড়ী। তৎকালীন ঐতিহাসিকদের মতে একজন সক্ষম মানুষের পক্ষে এ পথ পাড়ি দিতে অস্তত তিনমাস সময়ের প্রয়োজন ছিল।

\* \* \*

সুলতান মাহমুদ গফনী এর আগেই খাওয়ারিজমকে গফনী সালতানাতের অন্তর্ভুক্ত করে নেন। খাওয়ারিজমের অনুগত সৈন্যদেরকে তিনি গফনী সৈন্যদের অন্তর্ভুক্ত করেন। তাছাড়া খাওয়ারিজম যুক্তে শোকবলের ঘাটতি পূরণে তিনি সেনাবাহিনীতে ভর্তির বিষয়টিতে জোর দেন।

তিনি মসজিদে মসজিদে এই ঘোষণা জারি করেন যে, মুহাম্মদ বিন কাসিমের সময় হিন্দুস্তান একটি ইসলামী রাষ্ট্রে পরিণত হতে চলেছিল। কিন্তু সেখানকার মুসলিম অধ্যুষিত এলাকাগুলোর মুসলমানরাও এখন পৌত্রলিকতার পদতলে পিষ্ট হচ্ছে।

শুধু তাই নয়, মুসলমানদের আয়ের উৎসগুলোকে ধ্রংস করে দেয়ার জন্য সেখানে প্রতিনিয়ত সামরিক শক্তি সঞ্চয় করছে।

ইসলামের পয়গামকে দুনিয়ার কোণে কোণে পৌছে দেয়ার দায়িত্ব আমাদের উপর ন্যস্ত।

সেই সাথে হিন্দুস্তানের বৃত্থানাগুলো থেকে বুত অপসারণ করে অগণিত বনী আদমকে পৌত্রলিকতার নাগপাশ থেকে মুক্ত করাও আমাদের ঈমানী কর্তব্য। পৌত্রলিকতা এমন এক ভয়ানক চক্র, এদেরকে যদি ধ্রংস করে দেয়া না যায়, তবে এরা ইসলাম ও মুসলমানদের জন্য কঠিন মুসীবত হয়ে দেখা দেবে।'

মসজিদগুলোতে ইমাম ও খতীবগণ সুলতানের এই ঘোষণার আলোকে নে মানুষকে সেনাবাহিনীতে ভর্তি হতে উৎসাহিত করতেন। কুরআন ও হাদীসের প্রেরিত উদ্ধৃতি দিয়ে আবেগময়ী ভাষায় প্রদত্ত খতীব ও ইমামদের এসব উজ্জীবনীমূলক প্রেরিত বক্তব্য শুনে সাধারণ মুসলমানরা উজ্জীবিত হলেন এবং দেশের প্রতিটি জনপদে তে তার এই ঘোষণা আলোচনার প্রধান বিষয়ে পরিণত হলো।

সুলতান আরো ঘোষণা করলেন, রাষ্ট্র পরিচালনা খুবই স্পর্শকাতর এবং কঠিন কাজ। এই কঠিন দায়িত্ব আল্লাহ তাআলা-আমার উপর অর্পণ করেছেন। শুধু শাসন করা সুলতানের কাজ নয়। জাতি ও গণমানুষের জীবন-জীবিকা সূচারূপে চালানোর জন্য সহায়তা করা, তাদের সঠিক নিরাপত্তা দেয়া এবং জাতির মান-মর্যাদা স্মৃতির রাখা সুলতানের অন্যতম কর্তব্য। তবে সবচেয়ে বড় দায়িত্ব হলো, এই পরিমাণ সামরিক শক্তি সম্পত্তি করা দরকার ইসলামের শক্রে যতো শক্তিশালী হোক না কেন যাতে মাথা তুলে দাঁড়াতে না পারে। কোন মুসলিম প্রতিবেশী রাষ্ট্রের উপর যদি জুলুম-অভ্যাচার হতে থাকে, তবে যে কোন মুসলিম প্রতিবেশী রাষ্ট্রের উচিত মজলুমদের সাহায্যে এগিয়ে যাওয়া এবং দেশ ও জাতিকে নিয়ে মজলুমদের নিরাপত্তা বিধানে জিহাদ করা।

এই মুহূর্তে আমার খুব দরকার জাতির সিংহ-শার্দূলদের সহযোগিতা। হে গয়নীর সিংহ শার্দূলেরা! তোমরা এসো! আমি তোমাদের নিয়ে মৃত্যুর আগে এই কর্তব্য পালন করতে চাই।”

সুলতান মাহমুদ যেমন ছিলেন একজন বিচক্ষণ ক্ষণজন্মা সমরনায়ক, তেমনই ছিলেন একজন দক্ষ শাসক। হিন্দুস্তানের বিভিন্ন যুদ্ধে তিনি যে সহায়-সম্পদ কজা করতেন, এগুলোর একটি অংশ তিনি সেনাদের মধ্যে বট্টন করে দিতেন এবং একটি বড় অংশ খরচ করতেন শিক্ষা ও জনগণের সেবায়, গণমানুষের জীবন-মান উন্নয়নে। তার শাসিত সালতানাতে যেহেতু গণমানুষ সুখ-সাক্ষন্দে জীবন-যাপন করতো। এজন্য সুলতানের প্রতিটি নির্দেশেই ব্যাপক জনসমর্থন লাভ করত।

১০১৭ সালের শেষ দিকে তিনি সেনাবাহিনীতে নতুন লোক ভর্তির জন্য দেশব্যাপী মহড়া শুরু করে দিলেন। তিনি তার সেনা কমান্ডারদের বলতেন, ‘আমাকে আমার পিতার উপদেশ পালন করতে হবে।

তিনি বলতেন, তোমাকে হিন্দুস্তানের বৃত্তান্তগুলো ধ্বংস করে ইসলামের আলো ছড়িয়ে দিতে হবে। আমি স্বপ্নেও বারবার এ কাজের জন্য তাগিদ পেয়েছি। আমার পীর ও মুর্শিদ শায়খ আবুল হাসান খিরকানীও এই নির্দেশ দিয়েছিলেন। মনে হয় আমার জীবন আর বেশী দিন নেই। মৃত্যুর আগে আমি এই কাজটি শেষ করে যেতে চাই।

\* \* \*

বেশ কিছু দিন থেকে সুলতান হিন্দুস্তান থেকে নতুন খবরের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। তিনি একথা জানার জন্য উদ্ধীব ছিলেন যে, হিন্দুস্তানের রাজা মহারাজারা তার বিরুদ্ধে জঙ্গী তৎপরতা চালাচ্ছে। ১০১৭ খ্রিস্টাব্দ শেষ হলো। ১০১৮ সাল শুরু হয়ে গেলো। কিন্তু তখনও তিনি নতুন কোন সংবাদ পাচ্ছিলেন না।

একদিন তাকে খরব দেয়া হলো, হিন্দুস্তান থেকে আমীর বিন তাশকীন নামের একজন লোক এসেছে।

‘তাশকীন এসেছে!’ উচ্ছ্বসিত কষ্টে বললেন সুলতান। তাকে জলদি এখানে নিয়ে এসো।

তাশকীন যখন সুলতানের কক্ষে প্রবেশ করল, তখন তাকে দেখে বিশ্বয়ে সুলতান পেছনে সরে গেলেন। তার চেহারা নীল হয়ে গিয়েছিল এবং তাকে মনে হচ্ছিল একটি জীবন্ত কংকাল।

তার শরীরে ধূলোর আন্তরণ। চেহারা দেখে মোটেই চেনা যাচ্ছিল না, এটিই তুখোড় গোয়েন্দা আমীর বিন তাশকীন। তার কোমর ডেঙে গিয়েছিল। সে পায়ের উপর ভর করে দাঁড়াতে পারছিলো না। সুলতান তাকে একটি তাকিয়ায় হেলান দিয়ে বসালেন এবং শীঘ্ৰই তার জন্য খাদ্য পানীয় আনার জন্য নির্দেশ দিলেন।

‘আমি তিন মাসের পথ দেড় মাসে অতিক্রম করেছি সুলতান। কাঁপা কাঁপা ক্ষীণকষ্টে বললো তাশকীন। মাথুরাতে আমার ধৰা পড়ার উপক্রম হয়েছিল। আল্লাহর বিশেষ রহমতে আমি বেরিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছি।

আমি এক পর্যায়ে একটি ঘোড়া চুরি করে মরতে মরতে বেঁচে গেছি এবং পালিয়ে এসেছি। ঘোড়ার প্রয়োজনে একটি নিরপরাধ লোককে হত্যা করতে হয়েছে। সাঁতরে প্রমত্তা নদী পার হতে হয়েছে। দেড় মাস পর্যন্ত আমি ঘোড়ার উপরই খেয়েছি এবং ঘোড়ার উপর বসেই ঘুমিয়েছি...। আপনি একটি হিন্দুস্তানের মানচিত্র আনান।’

কিছুক্ষণের মধ্যেই তাশকীনের জন্য খাদ্য-পানীয় হাজির করা হলো। সুলতানের নির্দেশে তাশকীন কিছুটা খাদ্য এবং পানীয় পান করে শরীরটাকে একটু তাজা করে স্বত্ত্বার নিঃশ্঵াস নিয়ে বসলো।

ହିନ୍ଦୁଷ୍ଟାନେର ସକଳ ରାଜ୍ଞୀ-ମହାରାଜାରାଦେର ନାମ ଧରେ ତାଶକୀନ ବଲତେ ଲାଗଲ, ଯାରା ମୁଖ୍ୟରାର ମନ୍ଦିରର ବିଶେଷ ବୈଠକେ ଶରୀକ ହେଁଛିଲ । ତାଶକୀନ ସୁଲତାନକେ ତାଦେର ସିନ୍ଧାନ୍ତ ଓ ପରିକଳ୍ପନା ଜାନିଯେ ମାନଚିତ୍ରେ ହାତ ଦିଯେ ଦେଖାତେ ଲାଗଲ, କୋଥାଯ କଲ୍ଲୋଜ ମାଥୁରା, ବୁଲନ୍ଦଶ୍ଵର ଏବଂ ମହାବନ ।

ତାଶକୀନ ସୁଲତାନକେ ଜାନାଲ, ଏଲାକାଟି ଘନ ଜଙ୍ଗଲକିର୍ଣ୍ଣ ହେଁଯା ଛାଡ଼ାଓ ଅମଭା ଗଞ୍ଜା ଓ ସମୁନା ନାମେର ଦୁଟି ନଦୀ ଖୁବଇ ଭୟାନକ । ଅତଃପର ମାଥୁରା ଓ ମହାବନ । ବୁଲନ୍ଦଶ୍ଵରର ଆଶେ ପାଶେର ଛୋଟ ଛୋଟ ଦୁର୍ଗଶ୍ରଳୋର ଅବସ୍ଥାନ ଦେଖିଯେ ବଲଲୋ, ଏତୁଲୋତେ ସମ୍ମିଳିତ ବାହିନୀର ବାଇରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜ୍ଞୀ-ମହାରାଜାରା ତାଦେର ଅର୍ଧେକ ସୈନ୍ୟକେ ପ୍ରହରାୟ ନିଯୋଗ କରିବେ ।

ଆପନି ଭୀମପାଲେର ପିତା ଜୟପାଲକେ ପେଶୋଯାରେର ଯେ ମଯଦାନେ ପରାଭିତ କରେଛିଲେନ, ସମ୍ମିଳିତ ବାହିନୀ ଏଥାନେ ଏସେ ଆପନାର ମୋକାବେଳା କରତେ ଚାଯ । ତାରା ଲୁଘମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତିଟି ଗିରିପଥେ ଓଦେର ସୈନ୍ୟ ବସିଯେ ରାଖିବେ, ଆମାଦେର ସେନାଦେର ଘାୟେଲ କରତେ ଏବଂ ଚୋରାଗୁଡ଼ା ହାମଲା କରେ ଆମାଦେର ଜନବଳ ଧଂସ କରେ ଦିତେ । ତାରପରା ଯଦି ଆମାଦେର ସୈନ୍ୟରା ବୀଧା ପେରିଯେ ଏଗିଯେ ଯାଯ, ତବେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଦୁର୍ଗଶ୍ରଳୋର ରିଜାର୍ଡ ସୈନ୍ୟରା ଆମାଦେର ସେନାଦେର ପଥରୋଧ କରିବେ ।’

‘ଲାହୋରେ ଭୀମପାଲେର ଇଚ୍ଛା କି? ’ ତାଶକୀନକେ ଜିଜ୍ଞେସ କରିଲେନ ସୁଲତାନ ।

“ଭୀମପାଲ ଆପନାକେ ଖୁବ ଭୟ କରେ । ତବେ ନେପଥ୍ୟେ ସେ ଓଦେର ସାଥେ ପୁରୋପୁରି ସହ୍ୟୋଗିତାଯ ଆଛେ । ” ବଲଲୋ ତାଶକୀନ ।

“ଏମନ୍ତି ତୋ ତାର କରା ଉଚିତ । ” ବଲଲେନ ସୁଲତାନ । କାରଣ, ପରାଜ୍ୟକେ ବିଜୟେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରତେ କେ ନା ଚାଇବେ? ହିନ୍ଦୁଷ୍ଟାନେର ରାଜପୁତରା ଖୁବଇ ସାହସୀ ଓ ଆତ୍ମମର୍ଯ୍ୟାଦାବୋଧସମ୍ପନ୍ନ । ତାଶକୀନ! ତୁମି କି ବଲତେ ପାରୋ କବେ ନାଗାଦ ସମ୍ମିଳିତ ବାହିନୀ ଏକତ୍ରିତ ହବେ ଏବଂ ଅଭିଯାନ ଉର୍ଫ କରିବେ?

‘ଓଦେର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହତେ କମପକ୍ଷେ ଏକ ବହର ଲାଗବେ ସୁଲତାନ । ଅବଶ୍ୟ ମାଥୁରାର ପ୍ରଥାନ ପୁରୋହିତ ଦ୍ରୁତ ଅଭିଯାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମ୍ପନ୍ନ କରତେ ତାକୀଦ ଦିଲେ ।

‘ଓରା ଲୁଘମାନ ଆର ପେଶୋଯାରେ ପୌଛାର ଜନ୍ୟ ଆମରା ଅପେକ୍ଷା କରିବୋ ନା । ’ ବଲଲେନ ସୁଲତାନ । ଆମରା ମାଥୁରା ଓ କଲ୍ଲୋଜେଇ ଓଦେର ମୁଖୋମୁଖୀ ହବୋ... । ତାଶକୀନ । ତୁମି ପୁରୋ ଏକମାସ ବିଶ୍ରାମ କରୋ । ତୋମାର ଶରୀରେର ଉପର ଦିଯେ ମାରାଉକ ଧକଳ ଗେଛେ । ଏ କାଜେର ଜନ୍ୟ ତୋମାକେ ମୋଟା ଅଂକେର ପୁରକ୍ଷାର ଦେଯା ହବେ । ଅଚିରେଇ ପୁରକ୍ଷାର ତୋମାର ବାଡ଼ୀତେ ପୌଛେ ଦେଯା ହବେ । ବଲଲେନ ସୁଲତାନ ।

তুমি চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে শরীরটাকে ঠিক করে নাও। এরই মধ্যে আমরা প্রস্তুতি নিছি।

সুলতান মাহমুদ সব সময় তার সেনাপতি ও সেনা কমান্ডারদের বলতেন, শক্রদেরকে তাদের প্রস্তুতিরত অবস্থাতেই গিয়ে আক্রমণ করবে। এবারও তিনি সেনাপতি এবং কমান্ডারদের ডেকে বললেন, শক্রদেরকে প্রস্তুতরত অবস্থায় গিয়ে পাকড়াও করতে হবে।

শক্রদের কখনো আক্রমণের সুযোগ দেয়া যাবে না। আমি আপনাদের আগেই বলেছি, হিন্দুস্তানের সকল রাজা-মহারাজা আমাদের বিরুদ্ধে মহা আক্রমণের প্রস্তুতি নিছে। আমরা তাদেরকে এমন অবস্থায় গিয়ে পাকড়াও করতে চাই, যখন তারা সম্মিলিত বাহিনী তৈরীর জন্য সফরে থাকবে। আমাদের প্রধান লক্ষ্য হবে মাথুরা।

আমীর বিন তাশকীন আমাকে জানিয়েছে, মাথুরার বুতকে নাকি খুবই পবিত্র মনে করা হয় এবং মাথুরাই হলো তাদের প্রধান দেবতা শ্রীকৃষ্ণের জন্মভূমি। শ্রীকৃষ্ণকে হিন্দুরাই পয়গম্বর মনে করে।

তাশকীন আমাকে বলেছে, মাথুরায় শ্রীকৃষ্ণের মূর্তি বানানো হয়েছে মর্মর পাথর দিয়ে এবং কৃষ্ণমূর্তির দুটো চোখ নাকি খুবই দায়ি হীরের তৈরী। গোটা হিন্দুস্তানের হিন্দুরাই নাকি কৃষ্ণমূর্তির পূজার জন্য মাথুরা গমন করে।'

আমাদেরকে দ্রুত অভিযানে নামতে হবে। এবার আমরা পাঞ্জাব হয়ে যাবো না। পাঞ্জাবের মহারাজা আমাদের অধীনতা স্বীকার করে নিয়েছিল। কিন্তু বর্তমানে সে পূর্বের অবস্থানে নেই। রাজা ভীমপালও নাকি এই আক্রমণ প্রস্তুতিতে পুরোপুরি সহযোগিতা দিচ্ছে।

এবার আমাদের সফর হবে কাশ্মীর হয়ে। পাঞ্জাবের পাশ দিয়ে অবস্থিত কাশ্মীরের পাহাড়ী অঞ্চল দিয়ে আমরা অগ্রসর হবো।

তোমাদের মনে রাখতে হবে, পথে আমাদের অন্তত সাতটি নদী পার হতে হবে। ছোট বড় অনেক পাহাড় ও জঙ্গল দিয়ে অতিক্রম করতে হবে। আরো মনে রাখতে হবে, আমরা নিজের দেশ থেকে অনেক দূরে গিয়ে লড়াই করবো। সেখানে আমাদের কোন রসদ সাহায্য যিলবে না এবং কোন আসবাবপত্রের চালানও আমরা পাবো না। রাস্তা থেকেই আমাদের রসদ সংগ্রহ করতে হবে।

সুলতান মাহমুদ হিন্দুস্তানের মানচিত্র সামরিক কর্মকর্তাদের দেখিয়ে বললেন, ‘আমরা এই পথ দিয়ে অগ্রণ হবো। মাথুরা আমাদের লক্ষ্যবস্তু হলেও শুরুতে আমরা মাথুরাকে এড়িয়ে যাবো। মাথুরা আক্রমণের আগে আশপাশের ছোট ছোট রাজ্য ও দুর্গগুলোকে দখল করে নেবো।

আমাদের এ অভিযান কিন্তু সহজ হবে না। বললেন সুলতান। আমাদেরকে জীবন বাজি রাখতে হবে। কর্ণোজের মহারাজা, ভীমপালের চেয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন। শনেছি, সে নিজে যেমন লড়তে পারে, তেমনি সৈন্যদেরকেও লড়তে জানে।

আমাদের যেসব গোয়েন্দা মাথুরার উৎসবে উপস্থিত হয়েছিল, তারা গণমানুষের মধ্যে গয়নী সৈন্যদের সম্পর্কে আতঙ্ক ছড়িয়ে দিয়েছে। সেখানে লাখো মানুষের জমায়েত হয়েছিল। সাধারণ লোকেরা এতোটাই আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়েছে যে, গয়নী সৈন্যদের আগমন খবর শুনলে ওরাই মানুষজনকে ভীত-সন্ত্রন্ত করে তুলবে।

তবে আমাদের মনে রাখতে হবে, কারো ধর্মীয় পবিত্র স্থানে আক্রমণ হলে অনুসারীরা জীবন বাজি রাখতে মোটেও কৃষ্টাবোধ করে না।”

সুলতান মাহমুদ সেনাপতি ও কমান্ডারদের জরুরী দিক-নির্দেশনা দিয়ে মাত্র তিনি দিন প্রস্তুতির সময় দিয়ে চতুর্থ দিন রাতেনা হওয়ার নির্দেশ দেন।

১০১৮ সালের ২৭ সেপ্টেম্বর শনিবার মোতাবেক ৪০৯ হিজরী সনের ১৩ জুমাদিউল আউয়াল গয়নী থেকে তাঁর সৈন্যরা রওনা হয়। এই অভিযানে তার সৈন্যসংখ্যা নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতানৈক্য পাওয়া যায়। উত্তীর্ণ লিখেছেন, এই অভিযানে সুলতান মাহমুদের নিয়মিত সৈন্য ছিল এগারো হাজার আর ষ্টেচাসেবীর সংখ্যা কুড়ি হাজার। কিন্তু বাস্তবতার বিচারে তা যৌক্তিক মনে হয় না।

ঐতিহাসিক ফারিশ্তা লিখেছেন, মাথুরা অভিযানে সুলতান মাহমুদের সৈন্যসংখ্যা ছিল একলাখ অশ্বারোহী এবং বিশ হাজার পদাতিক। এই বিশাল বাহিনী তিনি তুর্কিস্তান, খাওয়ারিজম, খুরাসান এবং প্রতিবেশী মুসলিম রাজ্যগুলো থেকে সংগ্রহ করেছিলেন। গবেষক প্রফেসর মুহাম্মদ হাবীব বলেছেন, মাথুরা অভিযানে সুলতান মাহমুদের সৈন্যসংখ্যা ছিল একলাখ সওয়ারী ও পদাতিক এবং বিশহাজার ছিল ষ্টেচাসেবী।

বিশাল এই সেনাবহর প্রায় কয়েক মাইল দীর্ঘ ছিল। বিশাল এই বাহিনী সিন্ধু ও ঝিলম নদী ভৱা বর্ষায় পার হয়েছিল। গুরুগাড়ী ও ঘোড়গাড়ী এবং মালবাহী গাড়ীগুলোকে নদী পারাপারের জন্য নৌকার সেতু বানানো হয়েছিল।

এই অভিযানে সুলতান একজন দক্ষ ও নির্ভরযোগ্য পথপ্রদর্শকের প্রয়োজন অনুভব করলেন। তিনি বর্তমান কোটলী কাশীর (কালাঞ্জর) এর রাজার কাছে এই পয়গাম দিয়ে দৃত পাঠালেন যে, কল্লোজ পর্যন্ত পৌছাতে তার একজন দক্ষ রাহবার (পথ প্রদর্শক) এর প্রয়োজন। কয়েকজন নিরাপত্তারক্ষীও দৃতের সাথে পাঠালেন সুলতান।

‘গফনীর সুলতান আপনাকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন।’ কোটলী কাশীরের (কালাঞ্জর) রাজার দরবারে হাজির হয়ে রাজার উদ্দেশ্যে বললো সুলতানের প্রেরিত দৃত। সুলতান আপনাকে সেই দ্বিপাক্ষিক চুক্তির কথা শ্রবণ করিয়ে দিয়েছেন, যে চুক্তিতে আপনি গফনীবাহিনীর যে কোন প্রয়োজন পূরণে সহযোগিতা করতে অঙ্গীকারাবদ্ধ।

সুলতান আরো বলেছেন, আমার গন্তব্য অন্যদিকে, আপনি আমার এই বিশাল সেনাবাহিনী নিয়ে আপনার রাজ্যে আসতে বাধ্য করবেন না। আপনি যদি স্বাধীনতা ও স্বাধিকার বজায় রাখতে চান, তবে দ্রুত আমার প্রয়োজন পূরণ করে দিন।

আমাকে এমন একজন রাহবার দিন, যে কোন অবস্থাতেই আমাকে ধোকা দেবে না। তার যে কোন ধরনের ধোকাবাজী বা চালাকীকে আমি আমার বিরুদ্ধে যুদ্ধের ঘোষণা মনে করবো।’

সুলতানের পয়গাম শুনে রাজা চিন্তায় পড়ে গেলেন। দৃত আবারো বললো, সুলতানের সাথে যে পরিমাণ সেনা রয়েছে, আপনার রাজ্যে হয়তো এ পরিমাণ মানুষও নেই।

কোটলী কাশীরের রাজা চিন্তা দীর্ঘায়িত না করে তখনই তার ছেলে শাহীকে কারো মতে মালীকে দৃতের সাথে পাঠিয়ে দিলেন। রাজার ছেলে সুলতানের কাছে পৌছালে তিনি শাহীকে বললেন, ভূমি সবচেয়ে কম সময়ে যাওয়া যায় এমন পথ দিয়ে আমাদের নিয়ে চল।

পথিমধ্যে অনেকগুলো ছোট ছোট দুর্গ পড়লো। সুলতান এগুলোকে অবরোধ করে দুর্গপতিদের বললেন, তোমরা দুর্গ আমাদের কাছে হস্তান্তর করে দাও। অধিকাংশ দুর্গপতি অবরোধের আগেই সাদা পতাকা উড়িয়ে আস্ত্রসমর্পণ করেছিল।

সুলতান মাহমুদ প্রত্যেক দুর্গ থেকে প্রয়োজন মতো মালসাত্রগী নিয়ে অতিটি দুর্গে কিছুসংখ্যক নিয়ন্ত্রণকারী রেখে সামনে অসমর হলেন এবং এসব দুর্গের হিন্দু সৈন্যদেরকে ঠেলাগাড়ি ও রসদ পরিবহনের কাজে লাগালেন।

ইবনুল জাওয়ী লিখেছেন, মাথুরা অভিযানে সুলতানের সামনে যতো ছোট এবং মাঝারী দুর্গ পড়েছিল, সবই জয় করে তিনি সামনে অসমর হচ্ছিলেন। ঐতিহাসিক স্যার আর্লিংটন লিখেছেন, যেসব বনভূমিতে বাতাসও পথ হারিয়ে ফেলতো, সেইসব বনভূমি দিয়ে অন্যায়ে সুলতান তাঁর বিশাল সেনাবাহিনীকে নিয়ে গিয়েছিলেন। পাঞ্চাব এলাকার পাঁচটি নদী যেনো তিনি উড়াল দিয়ে পেরিয়ে গিয়েছিলেন এবং প্রাবন্ধের মতোই বুলন্দ শহরে উপনীত হন।

পূর্বপরিকল্পনা মতো মাথুরাকে এড়িয়ে গেলেন সুলতান। ১০১৮ সালের ২ ডিসেম্বর তিনি যমুনা নদী পার হলেন। যমুনা পার হওয়ার পর তার সামনে এলো সারসভা দুর্গ। তিনি দুর্গ অবরোধের নির্দেশ দিলেন। কিন্তু দুর্গ অবরোধ সম্পন্ন হওয়ার আগেই দুর্গপতি তার পরিবার-পরিজন নিয়ে পালিয়ে গেল। দুর্গপতি পালিয়ে গেলে দুর্গের সৈন্যরা কোনরূপ বাধাবিপত্তি না দিয়ে সবাই হাতিয়ার ফেলে দিয়ে আত্মসমর্পণ করলো। এতে সুলতান ত্রিশটি জঙ্গীহাতি পেলেন।

এ পর্যন্ত এসে তার একটি ক্যাম্প দরকার ছিল। সুলতান বিনাযুক্তেই কাঞ্চিত ক্যাম্প পেয়ে গেলেন। এই দুর্গকে সুলতান তার রসদাগার বানিয়ে নিলেন এবং দুর্গের ধনাগার থেকে তিনি খাজনা হিসেবে পেলেন দশ লাখ দিরহাম।

সারসভাকে রসদাগার করে সুলতান বুলন্দশহরের দিকে রওনা হলেন। তাদের অবস্থান থেকে বুলন্দশহর অন্তত একশো মাইল দূরে ছিল। সেখানে পৌছাতে তাদের দুটি নদী পেরিয়ে যেতে হবে। একটি গঙ্গা, অপরটি গঙ্গা নদীর শাখা রামগঙ্গা। সুলতান রসদপত্র রাখার জন্য সুরক্ষিত দুর্গ হাতে পাওয়ার কারণে তিনি রসদপত্রকে আর টেনে নেয়া সমীচীন মনে করলেন না। তিনি শুধু অস্ত্র ও সেনাদের সাথে নিলেন। কয়েদীদের দিয়ে নৌকার সেতু তৈরী করিয়ে সৈন্যসামন্ত পার করে বুলন্দশহর অবরোধ করলেন।

বুলন্দ শহরের শাসক ছিল হরিদত। এই হরিদত কন্নৌজের মহারাজাকে বলেছিলেন, তার একজন ব্যক্তিগত নিরাপত্তা কর্মকর্তা জানিয়েছে, কন্নৌজের মহারাজার একান্ত কর্মকর্তা জগন্নাথ আসলে মুসলমান এবং গয়নী সুলতানের

দক্ষ গোয়েন্দা। চম্পারাণীর সাথে তার গোপন সম্পর্ক রয়েছে। হরিদত্ত হিন্দুজনের অন্যান্য রাজা-মহারাজাদের মতোই মন্দিরের বৈঠকের পর অঙ্গীকার করেছিল হিন্দুধর্ম ও মহাভারতের পৌত্রলিকতা বজায় রাখতে সে জীবন-সম্পদ উৎসর্গ করবে। কিন্তু বুলন্দশহরের অধিবাসীরা যখন জানতে পারলো, গফনীর সৈন্যরা অবরোধ করেছে, তখন সাধারণ লোকজনের মধ্যে দৌড়-ঝাঁপ শুরু হয়ে গেল। শহর জুড়ে ছড়িয়ে পড়ল আতঙ্ক। চারদিকে দেখা দিল হৈ চৈ। এই আতঙ্ক ছড়িয়েছিল গফনীর কৌশলী গোয়েন্দারা।

সুলতান মাহমুদ দুর্গের প্রধান ফটকে তার লোকজন পাঠিয়ে ঘোষণা করালেন, শহরের সকল সশস্ত্র লোকেরা যদি হাতিয়ার ফেলে দিয়ে আঞ্চলিক পর্যবেক্ষণ না করে, তাহলে শহরকে ধ্বংসাত্মক পরিণত করা হবে।

জঙ্গীহাতিগুলোকে প্রধান ফটকে ধাক্কা মেরে ফটক ভাঙার জন্য সারি বেঁধে দাঁড় করিয়ে দিলেন সুলতান। রাজা হরিদত্ত এই অবস্থা দেখে দুর্গের প্রধান ফটক খুলে দিয়ে বাইরে বেরিয়ে এলো। তার পেছনে দশ হাজার সেনাও হাতিয়ার ফেলে দিয়ে হাত উঁচু করে এসে রাজার পেছনে দাঁড়াল। হরি দত্তকে সুলতানের কাছে নিয়ে যাওয়া হলে সুলতানের উদ্দেশ্যে সে বললো—

“আমি নিজের, আমার জাতিগোষ্ঠী ও জনগণের নিরাপত্তা চাই। আমি এবং আমার এই দশ হাজার সৈন্য ইসলাম ধর্ম গ্রহণে আগ্রহী। দয়া করে আপনি আমাদেরকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করুন।”

ঐতিহাসিকগণ লিখেছেন, আসলে এই দশ হাজার সৈন্য ছিল না। এদের অধিকাংশই ছিল সাধারণ নাগরিক। তারাই হরিদত্তকে বাধ্য করেছিল শহরকে ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচানোর জন্য যেনে তিনি শাস্তিচূড়ি করেন। যদি রাজা তা না করেন, তাহলে নাগরিকরা তাদের অনুগত সৈন্যদের দিয়ে প্রধান ফটক খুলে দেয়ার ব্যবস্থা নেবে। কোন কোন ঐতিহাসিক লিখেছেন, রাজা হরিদত্ত ধোকা দিয়ে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছিল।

\* \* \*

সুলতান মাহমুদ দশ হাজার লোকের এই বাহিনীর আঞ্চলিক পর্যবেক্ষণ করলেন এবং রাতের বেলায় গঙ্গা নদী পারাপারে তাদের ব্যবহার করলেন। নদী পেরিয়ে তিনি মাথুরাকে পাশ কাটিয়ে মহাবনের দিকে অগ্রসর হলেন। তিনি

আগেই খবর পেয়েছিলেন মহাবনের রাজা কুয়ালচন্দ্র যুদ্ধের জন্য তার সৈন্যদেরকে প্রস্তুত করে রেখেছেন। ঘন জঙ্গল ছিল স্থানীয় শাসক কুয়াল চন্দ্রের বিরাট সহায়ক। তার সেনারা জঙ্গী হাতিগুলোকে লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত করে রেখেছিল।

সুলতান মাহমুদ জঙ্গলকে এড়িয়ে তার সেনাদের একটি বড় অংশকে জঙ্গলের দুই পাত্তে পাঠিয়ে দিলেন। তিনি শুধু অগ্রবর্তী দলকে জঙ্গলের ভেতরে এমনভাবে প্রবেশ করালেন দেখে মনে হবে তারা মহাবনের সেনাদের প্রস্তুতি সম্পর্কে একেবারেই বেখবর।

সুলতানের অগ্রবর্তী সেনারা যখন জঙ্গলের মাঝামাঝি স্থানে পৌছল তখন কুয়ালচন্দ্র তার সৈন্যদেরকে আক্রমণের নির্দেশ দিয়ে দিল। সুলতানের অগ্রবর্তী দলের সকল সৈন্য ছিল অশ্঵ারোহী। আক্রমণ শুরু হতেই তারা সবাই জঙ্গলে ছড়িয়ে পড়ল। জঙ্গল ছিল খুব ঘন। এখানে তীরন্দাজদের তীর তেমন কার্যকর কোন ভূমিকা রাখার সুযোগ ছিল না। ওরা যখনই তীর ছুঁড়তো সুলতানের যোদ্ধারা খুব সহজেই তাদের লক্ষ্যচ্যুত করে ফেলতো।

এমতাবস্থায় হঠাৎ করে কুয়াল চন্দ্রের সৈন্যদের উপর ডানবাম এবং পেছন দিক থেকে অতর্কিত আক্রমণ শুরু হলো। শক্রদের উপর স্বগোত্রীয়দের ত্রিমুখী আক্রমণ শুরু হতেই সুলতানের অগ্রবর্তী সৈন্যরা এদিক ওদিক সটকে পড়ল। হিন্দু সৈন্যদের তখন সুলতানের সৈন্যদের হাতে কাটা পড়া নয়তো পালিয়ে থাণ বাঁচানো ছাড়া বিকল্প কোন পথ ছিল না।

ঐতিহাসিক স্যার আর্লিংটন এই যুদ্ধের অবস্থা সম্পর্কে লিখেন, এতো বিশাল জঙ্গল হওয়ার পরও গয়নীর হাজার হাজার সৈন্য কুয়ালচন্দ্রের সৈন্যদের খোঁজে জঙ্গলে চিরুণী অভিযান চালাল। জঙ্গলের পিছনে ছিল গঙ্গানদী। যে গঙ্গানদী পেরিয়েই পথ ঘুরে সুলতানের বাহিনী কুয়ালচন্দ্রের বাহিনীকে পেছন দিক থেকে ঘিরে ফেলে। উপায়ান্তর না দেখে অবশেষে কুয়াল চন্দ্রের সৈন্যরা নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ল; কিন্তু তাদের মধ্যে মুষ্টিমেয় ছাড়া অধিকাংশই সুলতানের সৈন্যদের হাতেই প্রাণত্যাগ করল।

রাজা কুয়ালচন্দ্রকে কোথাও খুঁজে পাওয়া গেল না। মুসলিম সৈন্যরা যখন বিজয়ী বেশে তার প্রাসাদে প্রবেশ করল, তখন রাজপ্রাসাদের পাহারাদার তাদের জানাল, রাজার ছিল একজনই মাত্র স্ত্রী ও একটি মাত্র সন্তান। তিনি তরবারী দিয়ে উভয়কে হত্যা করে নিজেই নিজের তরবারী বুকে বিন্দ করে আত্মহত্যা করেন।

ରାଜମହଲେ ପାହାରାଦାର ମୁସଲିମ ସୈନ୍ୟଦେରକେ ଥାସାଦେର ଭେତରେ ନିଯେ ତାଦେର ମୃତ୍ୟୁଦେହ ଦେଖାଲ । ମହାବନ ଥିକେ ଏକଶ ପଂଚାଶିଟି ହାତି ଏବଂ ବିପୁଲ ପରିମାଣ ସୋନାଦାନା ସୁଲତାନେର ହଞ୍ଚଗତ ହଲୋ ।

ମାଥୁରା ସମ୍ପର୍କେ ସୁଲତାନେର ଦୁର୍ଧର୍ଷ ଗୋଯେନ୍ଦା ଆୟିଲ ବିନ ତାଶକୀନ ତାକେ ଜାନିଯେ ଦିଯେଛିଲ, ମାଥୁରା ଶହରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷାଦେୟାଳ ଖୁବଇ ମଜ୍ବୁତ । କଲ୍ପୋଜ ମହାରାଜାର ଦୁ'ଟି ସେନାଦଲଇ ମୂଲତ ମାଥୁରାର ନିରାପତ୍ତା ଦିଯେ ଥାକେ । ମହାବନେର ରାଜାଓ ତାଦେର ସହଯୋଗିତା କରେନ । ସାରସଭା ଓ ବୁଲନ୍ଦଶହରେ ଶାସକରା ଏମନ ଆସ୍ତରାଘା ଅନୁଭବ କରତୋ ଯେ, କେଉ ତାଦେର ଉପର ବହିରାକ୍ରମଣ କରେ ମାଥୁରା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୌଛାତେ ପାରବେ ନା । କାରଣ, ପ୍ରକୃତିଗତଭାବେ ଯମୁନା ଓ ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ମାଥୁରାର ସୁରକ୍ଷାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିରାଟ ସହାୟକ ଛିଲ ।

ଇତିହାସ ବଲେ, ସୁଲତାନ ମାହମୂଦ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିଜ୍ଞତା ଓ ଦୂରଦର୍ଶିତାର ପରିଚୟ ଦିଯେ ଆଗେ ଚାରପାଶେର ଛୋଟ ଛୋଟ ରାଜ୍ୟଗୁଲୋକେ ପରାଜିତ କରେ ପଥେର ସବ ବାଧା-ବିପତ୍ତି ଦୂର କରେନ । ଏରପର ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ମହାବନେର ସାମରିକ ଶକ୍ତିକେ ନିଶ୍ଚିହ୍ନ କରେ ଦିଯେ ମାଥୁରାର ଦିକେ ଅଗସର ହନ ।

ତିନି ଦୂର ଥିକେ ମାଥୁରା ଶହରକେ ଦେଖେ ବିଶ୍ଵିତ ହେୟ ଦାରୁଳଣ! ଦାରୁଳଣ!! ବଲେ ଚିତ୍କାର କରେନ । ଏରପର ଏକଦିନ ତିନି ଗ୍ୟାନୀର ଗଭର୍ନରକେ ମାଥୁରା ଶହରେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ହିନ୍ଦୁଦେର ନିର୍ମାଣନୈପୁଣ୍ୟ ସମ୍ପର୍କେ ଲିଖେନ, ମାଥୁରା ନଗରୀର ସ୍ଥାପନା ଓ ନିର୍ମାଣଶୈଳୀ ଏକାନକାର ଅଧିବାସୀଦେର ବିଶ୍ଵାସେର ମତୋଇ ମଜ୍ବୁତ ଓ ବାହାରୀ । ଏକାନକାର ଅଧିକାଂଶ ଧର୍ମୀୟ ସ୍ଥାପନା ମର୍ମର ପାଥରେ ତୈରୀ । ଗଠନଶୈଳୀ ଦେଖେଇ ବୋବା ଯାଯ, ଏସବ ମନ୍ଦିର ଓ ଇମାରତ ଯେନତେନ ଭାବେ ତୈରୀ ହେଁନି । ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରେ ବହରେର ପର ବହର ସମୟ ଓ ବହ ଶ୍ରମେର ବିନିମୟେ ଏସବ ସ୍ଥାପନା ଗଡ଼େ ତୋଳା ହେୟଛେ । ଏସବ ସ୍ଥାପନା ତୈରୀତେ ହିନ୍ଦୁରା କୋଟି କୋଟି ଦିନାର ଖରଚ କରେଛେ । ମନ୍ଦିରଗାତ୍ରେ ନିପୁଣ କର୍ମକୌଶଳେ ଫୁଟିଯେ ତୁଳେଛେ ହିନ୍ଦୁଦେର ଧର୍ମୀୟ ବିଶ୍ଵାସ । କୋନ କୋନ ସ୍ଥାପନା ତୈରୀତେ ହେୟତୋ ଶତ ବହରଓ ବ୍ୟୟ କରା ହେୟଛେ । ବନ୍ଧୁତ ଏହି ଶହରେର ରୂପ-ସୌନ୍ଦର୍ୟ ଆମାର ପକ୍ଷେ କୋନ ଭାଷାଯାଇ ବର୍ଣନା କରା ସଂକ୍ଷବ ନନ୍ଦ ।

ମାଥୁରା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୌଛାତେ ସୁଲତାନେର ତେମନ କୋନ ଜନବଳ ବ୍ୟୟ କରତେ ହେଁନି, ଯାର ଫଳେ ଅନେକଟା ନିଶ୍ଚିତ ଓ ଦୃଢ଼ଚିତ୍ରେ ତିନି ମାଥୁରାର ଦିକେ ଅଗସର ହଞ୍ଚିଲେନ । ମହାବନେର ପାଲିଯେ ଆସା ସୈନ୍ୟଦେର ଅନେକେଇ ମାଥୁରା ଶହରେ ପୌଛେ ମୁସଲିମ ସୈନ୍ୟଦେର ସମ୍ପର୍କେ ତ୍ରାସ ଓ ଆତକ ଛଡ଼ିଯେ ଦିଯେଛିଲ । ଅପରଦିକେ ଗୋଯେନ୍ଦା ହିଶାମ ଓ ତାର ସଙ୍ଗୀରାଓ ଲୋକଜନେର ମଧ୍ୟେ ଆତକ ଛଡ଼ିଯେ ଦିଯେଛିଲ ।

মহাবন থেকে পালিয়ে আসা সৈন্যরা মাথুরায় এসে লোকজনের মধ্যে এমনই ভীতি ছড়িয়ে দিলো, ‘গয়নী বাহিনীর সামনে বিশাল বটবৃক্ষও টিকে থাকতে পারবে না’।

এসব আতঙ্ক ছড়ানোর ফলে শহরের অধিবাসীরা প্রতিরক্ষা ব্যুৎ রচনা না করে জীবন বাঁচাতে এবং বিপদ অপসারণের জন্য মন্দিরগুলোতে গিয়ে জমায়েত হয়ে বিপদঘন্টা বাঁজাতে শুরু করলো।

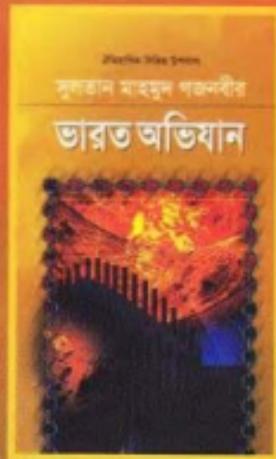
গয়নীর সৈন্যরা মাথুরা শহর অবরোধ করলে সামান্য প্রতিরোধ হলো বটে; কিন্তু তা গয়নী বাহিনীর তীব্র আক্রমণের মুখে বানের খড়কুটোর মতোই ভেসে গেল। অলঞ্চণের মধ্যেই খুলে গেল শহরের প্রধান গেট। সুলতান মাহমুদ বিজয়ীবেশে শহরে প্রবেশ করে প্রথমেই গেলেন মাথুরার প্রধান মন্দিরে। সেখানে শ্রীকৃষ্ণ ও বাসুদেবের অতি মূল্যবান মূর্তি প্রতিষ্ঠাপিত ছিল। এই মূর্তিগুলো ছিল খুবই মূল্যবান উপাদানে তৈরী। এ দুটি মূর্তির গঠন ছিল অস্বাভাবিক সুন্দর। খুবই দামী ও উজ্জ্বল হীরে দিয়ে বানানো হয়েছিল শ্রীকৃষ্ণ ও বাসুদেবের মূর্তি। কৃষ্ণমূর্তির দুটি চোখ ছিল দীপ্তিময় হীরের দ্বারা গঠিত। পাঁচটি বিশাল মূর্তি ছিল সম্পূর্ণ সোনার তৈরী এবং এগুলোর চোখে ছিল দামী হীরে। এই হীরের তৎকালীন বাজার মূল্য ছিল পঞ্চাশ হাজার দিনার।

সবচেয়ে ছোট মূর্তিটিতে পাঁচশ কেজি সোনা ছিল। একটি মূর্তিকে গলিয়ে পাওয়া গিয়েছিল ৯৮০০০ (আটানবই হাজার) গ্রাম সোনা। এ ছাড়া একশ মূর্তি ছিল সম্পূর্ণ ঝুঁপার তৈরী।

বিজয়ী সুলতান মাহমুদ পাথরের মূর্তিগুলোকে ভেঙে ফেললেন এবং সোনার মূর্তিগুলোকে আগনে পুড়িয়ে গলিয়ে ফেললেন। হিন্দুদের এই পবিত্র শহর থেকে পৌত্রলিকতার বিষময় উপাদান দূর করতে তিনি কুড়ি দিন মাথুরা শহরে অবস্থান করলেন। এই কুড়ি দিন পর্যন্তই শহরের বিভিন্ন স্থাপনা জ্বলছিল এবং মাথুরা শহর একটি ধ্বন্তৃপে পরিণত হয়েছিল।

এদিকে মহারাজা কন্নোজ সুলতানের আগমন খবর শুনে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণে জোর চেষ্টা চালাতে লাগলেন। কারণ, সুলতানের পরবর্তী লক্ষ্য কন্নোজ। এবার কন্নোজের মহারাজা রাজপালের পালা।

## তৃতীয় খণ্ড সমাপ্ত



আকিক পাবলিকেশন

১১/১ ইসলামী টাঙ্গার, বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

design : shoj \* 01911031184

[www.pathagar.com](http://www.pathagar.com)